প্রসঙ্গ

হাজার বছরের বাংলা কবিতা

যুগ্ম সম্পাদনা

ড. ছন্দা রায়

(রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়

(রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক :
অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল :
২৩. ০৮. ২০০১

প্রচ্ছদ :
তপন কর

অক্ষর বিন্যাস :
প্রিন্ট লাইন
পূর্বাচল, সল্টলেক সিটি,
কলকাতা-৭০০০৯৭

অলঙ্করণ ও চিত্রাবলী :
বাসুদেব মোশেল-এর সৌজন্যে

মুখবন্ধ

কবিতা। হাজার বছরের বাংলা কবিতা। বড় দীর্ঘ পথ। তবু দুঃসাহসিক পরিক্রমায় প্রাণিত হওয়া গেল কবিতার হাত ধরে — কবিতার প্রেমে। কবিতার জন্য একজন সৎ কবি অমরাবতীও তুচ্ছ করতে পারেন। একজন সহৃদয় পাঠক বলতে পারেন, কবিতার জন্যই বেঁচে থাকা এবং বাঁচতে পারা।

উজ্জীবনী পাঠমালার অঙ্গ হিসেবেই আমাদের বাবতীয় পরিকল্পনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের সহায়তায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুমোদন ও অনুদানে তিন সপ্তাহব্যাপী (১-২৩ আগস্ট, ২০০১) এক কর্মযজ্ঞের আয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা সর্বভারতীয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। পাঠমালা গ্রন্থনার উদ্দেশ্য তাঁদের পেশাগত যান্ত্রিকতার মধ্যে মনের খানিকটা হাওয়া বদল।

বাংলা বিভাগে নবাগত আমরা ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালার দায়িত্ব পেয়ে অবশ্যই শঙ্কিত ছিলাম এবং দ্বিধাগ্রস্ত। ভার গ্রহণ সহজ। ভার বহন করা কঠিন। কাঠিন্যকে সহজ করতে সহযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হলেন আমাদের অগ্রজ ও অনুজ সহকর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় নেপোলিয়নের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, অসম্ভব শব্দটাই অবাস্তব। উপদেশ ও উদ্দীপনায় আমাদের প্রতি মুহূর্তে সঞ্জীবিত রাখলেন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ এবং অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদার। বিভাগীয় প্রধানের আসন থেকে আমাদের অনুক্ষণ আনুকূল্য করলেন অধ্যাপক ডঃ মণিলাল খান। বারবার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ সনৎ নস্কর। পূর্ববর্তী পাঠমালা সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে উজাড় করে দিলেন ডঃ বিশ্বনাথ রায়। নির্দেশকের ভূমিকায় রইলেন অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ বিনয়কান্তি দত্ত, যাঁকে ছাড়া কর্মযজ্ঞটি অসম্পন্ন থাকত। প্রসারিত দাক্ষিণ্য আমরা পেলাম আমাদের বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক এবং অতিথি-অধ্যাপকদের কাছেও। তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

উজ্জীবনী পাঠমালার মূল হোতা যাঁরা, অর্থাৎ বক্তারা, তাঁদের মধ্যে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকেরাই শুধু নেই, আছেন প্রতিষ্ঠিত নবীন এবং প্রবীণ কবিরা। তাঁরা সকলেই আমাদের ডাকে সানন্দে সাড়া দিয়ে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তাঁদের দিয়ে কথা বলানোরই কথা— যে রীতি এতকাল চলে এসেছে। কথা থেকে লেখা এবং লেখা থেকে মুদ্রণের ভাবনায় আমাদের ভাবিত করেছেন আমাদের সহকর্মী বন্ধু ডঃ বিশ্বনাথ রায়। "প্রসঙ্গ : হাজার বছরের বাংলা কবিতা" যে রূপমূর্তি পেল, সেজন্য তাঁর কথা মনে রাখতেই হবে। সহস্রাব্দকে একটি কাঠামোয় ধরার সাধ্যাতীত পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক, অনেক অপূর্ণতা আছে আমরা জানি। অঙ্গীকার করেও কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়েছেন নিজেদের অন্যতর কর্মের দায়বদ্ধতায়। সেখানে ফাঁক ভরাট করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন থেকে মধ্য, মধ্য থেকে আধুনিক এবং আধুনিক থেকে

উত্তর-আধুনিকতায় পা ফেলেছে বাংলা কবিতা। পাঠমালার নিয়ন্ত্রিত সময়-শাসনে তার প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর ভেদ করা যায়নি। তবু যাঁদের নির্মাণ-দক্ষতায় বাংলা কবিতার আদি থেকে ইদানীন্তন রূপ ভাবনার একটি সজ্জিত অবয়ব পেয়েছে সেই কবি-সমালোচকদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য রইল। যাঁরা নিজেদের কথাকে লেখায় রূপ দেবার অবকাশ পাননি, বক্তার ভূমিকায় তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আমাদের পাঠমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপাচার্য যে শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতার্থ বোধ করছি। আমাদের গ্রন্থ-প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের সহ-উপাচার্যের (শিক্ষা) শুভকামনাও আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

যাঁরা এখানে উজ্জীবিত হতে এসেছেন, তাঁদের নিজেদের ভিতরকার সঞ্চয়ও সামান্য নয়। আলোচনাচক্রে তাঁদের যোগদান এবং সচেতন প্রশ্নমনস্কতা আমাদেরও নতুন করে ভাবিয়েছে। চিন্তার আদান-প্রদান উজ্জীবনী পাঠমালার একটি বড় প্রাপ্তি। এই সুযোগে তাই অংশগ্রহণকারীদেরও আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। কয়েকদিনের একটানা কার্যক্রমে আমাদের অক্লান্তভাবে সহায়তা করেছে আমাদের বিভাগের ছাত্রছাত্রী এবং অশিক্ষক কর্মীরা। তাঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতা লাভের অংশীদার।

বিষয় যেহেতু কবিতা, তাই উজ্জীবনী পাঠমালার অঙ্গ হিসেবে আমরা একটি কবিসম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। সেখানে যাঁরা কবিতা পাঠ করেছিলেন তাঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী হয়ে রইলাম। বাংলার কবি মহাদেব সাহার কবিতা পাঠ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের স্মারক বলেই আমরা মনে করি।

আলোচনাকে লিখিত আকার দেওয়া, পাণ্ডুলিপির তাগাদায় সেগুলি সংগ্রহ ও ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদনা করা — সব কাজেরই সফলতা শেষ শর্ত মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ। আমাদের গবেষণা পরিষদের গবেষক বাসুদেব মোশেল দ্রুততম গতিতে এই সংকলন ছাপা ও প্রকাশের কাজ যে সাহসিক চ্যালেঞ্জে সমাপ্ত করেছেন, তার জন্য কোন ধন্যবাদই বোধহয় যথেষ্ট নয়। তবু সময়সীমা পার হওয়ার পর অনেক দেরীতে যাঁদের লেখা পৌঁছেছে, তাঁদের শ্রদ্ধেয় অবস্থানের কথা মনে রেখেও যদি লেখা ছাপা সম্ভব না হয়, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা অগ্রিম মার্জনা চেয়ে রাখছি।

সংকলনটির ত্রুটি, অসংগতি ও অপূর্ণতার দায় একান্ত ভাবেই আমাদের। সমাদরের কোন যোগ্যতা যদি অর্জন করা সম্ভব হয়, তার কৃতিত্ব আমরা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

ঋদ্ধা রায়
তরুণ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সঞ্চালক
ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালা

২৩ আগস্ট, ২০০১।
বঙ্গভাষা সাহিত্য বিভাগ।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অংশগ্রহণকারীদের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	আলোচনাচক্রে আলোচিত বিষয়
অভীক লাহিড়ী	শহীদ অনুকূলচন্দ্র মহাবিদ্যালয় (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)	প্রযুক্তি, বিচ্ছিন্নতা, কবিতা
অরুণ কুমার মণ্ডল	রাণাঘাট কলেজ, নদীয়া	কবি সুনির্মল বসু : শতবর্ষ স্মরণে
অসীম কুমার অধিকারী	শান্তিহাটি মহাবিদ্যালয়, সেলপুর	স্বভাবকবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত
অর্পিতা রায়চৌধুরী	রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ উত্তর দিনাজপুর	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আধুনিকতা : ভাবে ও আঙ্গিকে
ইন্দ্রাণী মজুমদার	বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ	জীবনানন্দ : তমসা থেকে আলোকতীর্থে
উমা ভাদুড়ী	নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া	রবীন্দ্র-কবিতা : বিদেশী কবির দৃষ্টিতে
উমা ভট্টাচার্য	নিবেদিতা কলেজ, পুরুলিয়া	আধুনিকতার নান্দীকার : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
ঊর্মি রায়চৌধুরী	মৌলানা আজাদ কলেজ, কোলকাতা	কাব্যে নারীবাদ
কল্পনা বসু	মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ, কোলকাতা	অমিয় চক্রবর্তীর প্রকৃতি চেতনা
কবিতা চন্দ	গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোলকাতা	২২শে শ্রাবণ
কার্তিক চন্দ্র প্রামাণিক	কে. টি. কলেজ অব কমার্স মেদিনীপুর	রবীন্দ্র-কাব্যে লোকসংস্কৃতি
কুন্তল কুমার রুদ্র	কোলপুর কলেজ, বীরভূম	কলকা : রবীন্দ্র-সৃষ্টির নতুন উপকূল
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য	কুলটি কলেজ, বর্ধমান	মধ্যযুগের বাঙালি সমাজ ও মঙ্গলকাব্য
কেশবচন্দ্র খাঁড়া	ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ হাওড়া	বাংলা ছন্দের বিবর্তন
গৌড়চাঁদ মণ্ডল	কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, নদীয়া	পদ্যে উপেক্ষিতা : লিমেরিক
চন্দনা মজুমদার	উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ, কোলকাতা	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : স্বতন্ত্র ধারার কবি
জগবন্ধন পাল	সেবায়তন শিক্ষা মহাবিদ্যালয় মেদিনীপুর	রবীন্দ্রনাথের খেয়া
জবা চট্টোপাধ্যায়	কবি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি	আধুনিক কবিতা : অনুষঙ্গ রূপকল্প
জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়	শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি	ব্যক্তি অনুভবে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত	প্রাগজ্যোতিষ কলেজ, গৌহাটি	দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
ঝর্ণা মিত্র	ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ, কোলকাতা	মানসী কাব্যে প্রেমচেতনা
তপন গোস্বামী	কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, বীরভূম	কবিতা ও পাঠক : সম্পর্ক ও স্তরবিন্যাস
তপতী দাসঠাকুর	নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, নদীয়া	রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনা (পুনশ্চ থেকে শেষলেখা)
তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়	ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, কোলকাতা	বাংলা কবিতার ধারা : একটি ঐতিহাসিক পুনর্মূল্যায়ন
দীপান্বিতা ঘোষ	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	গৌড়ীয় ভক্তিসাহিত্য : একটি প্রস্তাব

দিলীপ কুমার মণ্ডল	বড়জোড়া কলেজ, বাঁকুড়া	দুই কবি—পরস্পরের চোখে (রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ)
নন্দিনী মুখোপাধ্যায়	হুগলি ইউমেন্স কলেজ	'ভাষা খুঁজে নিতে হবে আমাদের'
প্রবীর সরকার	নিবেদিতা কলেজ, পুরুলিয়া	বাংলা কবিতায় ভ্রমণ উপাদান
প্রভাস রায় চৌধুরী	বারাসাত সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিমনন
বসুমিত্রা তরফদার	সি. এম. দাশ কলেজ, ২৪ পরগণা	উত্তর কালের কাব্যে প্রাচীন পুরাণের অনুবর্তন
বিজিত ঘোষ	শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি	'বীরাঙ্গনা'র দু'চার কথা
মহা সামসুল হক	রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স, মুর্শিদাবাদ	বাংলা ভাষা সমস্যা ও বাঙালি মুসলমান কবি
মাধবী বিশ্বাস	বাগনান কলেজ, হাওড়া	বিদ্রোহ-বর্জিত নজরুল
মানসী সেনগুপ্ত	ডিরোজিও কলেজ, কোলকাতা	সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'
মালবিকা মণ্ডল	কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর	রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্য : আজকের যুগে প্রাসঙ্গিকতা।
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	চমৎকার চন্দ্রিকার চমৎকারিত্ব
রবীন্দ্রনাথ মৈশাল	হুগলিবাড়ি মহাবিদ্যালয়	রবীন্দ্রকবিতায় বাস্তব অনুষঙ্গ
রাখী মুখোপাধ্যায়	নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, হুগলি	সন্তোষ সন্নিপর্ব : আধুনিক বাংলা কবিতা
রীনা সেন	বেথুন কলেজ, কোলকাতা	আনন্দময়ীকাহিনীর পূর্বকথা
শাম্পা ঘোষ	ড. গৌরমোহন রায় কলেজ, বর্ধমান	বাংলা মঙ্গলকাব্যে উপন্যাসের উপাদান
শঙ্কর কুমার নন্দী	সীতানন্দ কলেজ, মেদিনীপুর	ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় লোকভাষার ব্যবহার
শাশ্বতী সাহা চক্রবর্তী	শঙ্করামপুর কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর	বাংলা গীতিকাব্যের সূচনা পর্যায়
শেলী ভট্টাচার্য	বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রকৃতিচিত্র
শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ, বীরভূম	'যে রবির পাখি মেলা'
শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য	শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কোলকাতা	কবিতার ভাষা : ধ্বনির নন্দনতত্ত্ব
শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়	সরোজিনী কলেজ, কোলকাতা	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্র
স্বপন কুমার দে	বাগনান কলেজ, হাওড়া	১৯ শতকের বাংলা কাব্যে গার্হস্থ্য জীবন
স্বপন কুমার পাত্র	গুরুদাস কলেজ, কোলকাতা	বিপনন, বিজ্ঞাপন ও বাংলা কবিতা
সাধন কুমার দাস	ডি. এন. সি. কলেজ, ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ	জগন্নাথ চক্রবর্তীর কবিতায় অন্তর্জগৎ
স্বাতী দত্ত	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কোলকাতা	বৈষ্ণব পদাবলীতে নিসর্গ চেতনা
সীমা ঘোষ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কোলকাতা	প্রেম ও সর্বার অন্তরঙ্গতা (প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যে)
সুস্মিতা ঠাকুর	কান্দী রাজ কলেজ, মুর্শিদাবাদ	'আপন আমার কোনখানে' : একটি অন্বেষণ

লেখক-লেখিকা পরিচিতি

১। অরুণ কুমার বসু	প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। অলোক রায়	প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
৩। অভিজিৎ মজুমদার	লেকচারার তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। কানাইবিহারী গোস্বামী	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়	রীডার, ইংরেজি বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।
৭। গণেশ বসু	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।
৮। গৌরিকা ঘোষ	রীডার, বাংলা বিভাগ, হাওড়া গার্লস কলেজ।
৯। জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। জ্যোতির্ময় ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১১। ঝুণা স্যান্যাল	অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২। তপোধীর ভট্টাচার্য	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩। তরুণ স্যান্যাল	প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ।
১৪। তরুণ মুখোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের অধিকর্তা।
১৬। দীপেন্দু চক্রবর্তী	অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭। নির্মল দাশ	অধ্যাপক, বাংলা ভাষাতত্ত্ববিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮। নির্মলেন্দু ভৌমিক	প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গভাষা, সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯। পবিত্র সরকার	ভাষাতত্ত্ববিদ, ভাইস-চেয়ারম্যান, উচ্চশিক্ষা সংসদ
২০। প্রশান্তকুমার পাল	প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, রবিজীবনীকার, রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
২১। বরুণ চক্রবর্তী	অধ্যাপক, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
২২। বিমল মুখোপাধ্যায়	রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জীন (ক.বি.)
২৩। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪। বিপ্লব চক্রবর্তী	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫। বিশ্বনাথ রায়	রীডার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬। মঞ্জুভাষ মিত্র	রীডার, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সী কলেজ।
২৭। মীনাক্ষী সিংহ	অধ্যাপিকা, মঞ্চ থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।
২৮। সত্যবতী গিরি	অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯। সনৎ নস্কর	লেকচারার। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩০। সুমঙ্গল রাণা	বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী।
৩১। সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩২। সুমিতা চক্রবর্তী	অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৩। সন্দীপ দত্ত	লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক।
৩৪। সুতপা ভট্টাচার্য	রীডার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী।
৩৫। সৌমিত্র বসু	রীডার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৬। শক্তিনাথ ঝা	প্রাক্তন বাংলা বিভাগের প্রধান, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।
৩৭। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	রীডার, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

Prof. Asis Kumar Banerjee
Vice-Chancellor

Telephone No. : [illegible]
Fax No. : [illegible]
Senate House
Calcutta-700 073

তারিখ — [illegible]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণমালা ও সাহিত্য বিভাগ - আয়োজিত ' [illegible] চৈতন্যদেব - [illegible] ' শীর্ষক [illegible] সাফল্য [illegible] হোক । [illegible] বিষয় — [illegible] ।

অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনীতি পড়িয়ে থাকি । কিন্তু সাহিত্যের প্রতি আমার অফুরন্ত আকর্ষণ । [illegible] কাজ আমাকে কিছুক্ষণ [illegible] থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে । এটা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক । তাই একটু দূরে থেকেই আপনাদের আজকের আনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি ।

আন্তরিকতার সঙ্গে —
[illegible]
(আশিস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)
উপাচার্য

UNIVERSITY OF CALCUTTA

Dr. Hiron Kumar Banerjee
Pro-Vice-Chancellor
for Business Affairs and Finance
Calcutta, Calcutta

Senate House
87/1 College Street
Calcutta-700073
Phone : [illegible]
Fax : [illegible]
Cable : [illegible]
E-Mail : [illegible]

No. _____ Dated _____ 200

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের' অর্থানুকূল্যে এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের সহযোগিতায় ত্রয়োদশ উজ্জীবনী পাঠমালার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই উপলক্ষে বিভাগের দুই নবাগত শিক্ষক তাঁদের সামর্থ্যের ও উৎকর্ষের বিশেষ পরিচয় দিলেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিন। তাঁরা প্রায় চারশ' পৃষ্ঠার একখানি বই-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন সম্মিলিত প্রয়াসে। প্রকাশিত বইখানির শিরোনাম, 'প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাংলা কবিতা'।

আশা করি মনীষী-অধ্যাপকদের চিন্তাঋদ্ধ এই প্রবন্ধ-সংকলন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী-সম্পদরূপে গণ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ থেকেও এই ধরনের আয়োজন হলে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের আগ্রহী ব্যক্তিগণ গবেষণার জগতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

হিরণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩.৮.২০০১

সহ-উপাচার্য
(অর্থ ও বাণিজ্য)

UNIVERSITY OF CALCUTTA

Professor Sandhi Banerjee
Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs
Calcutta University

SENATE HOUSE
Calcutta-700073

No. .....

Dated 20 জানুয়ারি 2010

অভিনন্দন পত্র

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আজ আমার বিশেষ অভিনন্দন জানাই। আশা করি তিনি দীর্ঘ সুস্থ ও সুখী থাকবেন এবং ভবিষ্যতেও এই একটি বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষকদের বিশেষ গর্বের কারণ থাকবে। অধ্যাপনার ও গবেষণার ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল অবদানের জন্য তাঁকে সর্বপ্রকার সম্মান দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায় আমি আনন্দিত। এইসকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তাঁর বিভাগীয় সহকর্মীরা এবং বিশেষজ্ঞগণ আমাদের সকলের জন্য লিপিবদ্ধ করবেন।

সুরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের

অবৈতনিক অধিকর্তার

শুভেচ্ছা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুকূল্যে আয়োজিত উজ্জীবনী পাঠমালার ধারাবাহিকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে একটা বিষয় অনুভব করেছি, পাঠমালায় আমন্ত্রিত বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্যগুলি গ্রন্থাকারে সংকলন ও প্রকাশ করাটা নিতান্তই জরুরি। শুধু অংশগ্রহণকারীদের কাছে নয়, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছেও তা মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সঞ্চালকদ্বয় এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় আমি আনন্দিত। তাঁদের সঙ্গে সহযোগী ভূমিকায় থেকে আমি সংকলনটির সাফল্য ও সমাদর কামনা করি।

শুভেচ্ছাসহ,

ডঃ বিনয়কান্তি দত্ত

অবৈতনিক অধিকর্তা,

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮ আগস্ট ২০০১

চর্যাপদের পুঁথির একটি পৃষ্ঠা

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এর একটি পাণ্ডু

রামায়ণ

[illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় খণ্ড।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ধ্রুপদী

কবিতার মাসিক পত্র

সম্পাদক [illegible]

[illegible] ১৩৮৭ বর্ষ ১ সংখ্যা ৫

সূচীপত্র

বাংলা কাব্যের আদিপর্ব
নির্মল দাশ ১
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অভিনয় সঙ্কেত
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৬
আধুনিক পাঠক ও বৈষ্ণব পদাবলী : আধুনিক কবি ও বৈষ্ণব পদাবলী
সত্যবতী গিরি : ২৩
মধ্যযুগের বাংলা কাব্য : মধ্যযুগের কবিদের চোখে
সনৎ কুমার নস্কর : ৩০
শতাব্দক্রমে বাংলা মঙ্গলকাব্যের গতি প্রকৃতি (উন্মেষ, বিকাশ, নবীনতা)
সুমঙ্গল রাণা ৩৬
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যের ধারা
কাননবিহারী গোস্বামী ৪৩
শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্য
সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ৫৬
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'ধুয়া' গান
নির্মলেন্দু ভৌমিক ৬২
ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : ফিরে দেখা
শক্তিনাথ ঝা ৭৭
বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা
মানস মজুমদার ৮৬
শোষণ পীড়নের প্রেক্ষিতে গীতিকা সাহিত্য
বরুণ কুমার চক্রবর্তী ৯৫
উনিশ শতকের বাংলা কাব্যবিচার এক দিক
জ্যোতির্ময় ঘোষ ১০৪
রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কাব্য
সৌমিত্র বসু · ১১৪
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মিথের প্রয়োগ
মীনাক্ষী সিংহ ১১৮
রবীন্দ্র কাব্য — প্রাক্ গীতাঞ্জলি পর্ব
প্রশান্ত কুমার পাল ১২৩
ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান : রবীন্দ্রকাব্যের কপিবুক পর্যায়
বিশ্বনাথ রায় ১২৭
নজরুলের কবিতা 'বিদ্রোহী' : শৈলীগত বিশ্লেষণ
অভিজিৎ মজুমদার ১৪১
'কল্লোলযুগ' ও বাংলা কবিতা
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ১৫১
ইতিহাসের মুখোমুখি : যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯

স্বাধীনতার পরবর্তী কবিতা : উৎস ও বিবর্তন
গৈরিকা ঘোষ : ১৬৪
পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি
সুতপা ভট্টাচার্য . ১৭৪
প্রসঙ্গ ও প্রকরণ : বাংলা কবিতা : উনিশ ও বিশ শতক
সুমিতা চক্রবর্তী : ১৮৪
কবিতার ভাষা, বাংলা কবিতা
পবিত্র সরকার ১৮৮
কবিতার ভাষাবিশ্ব : নৈঃশব্দের গ্রন্থনা
তপোধীর ভট্টাচার্য ২০০
আধুনিক বাংলা কবিতা : ভারতীয় প্রেক্ষিতে
বিপ্লব চক্রবর্তী ২০৯
আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব
(জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কবিতা)
মঞ্জুভাষ মিত্র : ২২১
সন্ধিক্ষণের কবিতা
অলোক রায় : ২২৮
অনুধাবনীয় আলো অনুধাবনীয় অন্ধকারে : প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা
কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : ২৪০
বাংলা কবিতায় রাজনৈতিক উপাদান (১৯৭০-২০০০)
হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : ২৫৬
বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিনের ইতিবৃত্ত
সন্দীপ দত্ত : ২৬৮
উপনিবেশবাদ, বিশ্বকবিতা ও বাংলার কবিতার ধারা
তরুণ সান্যাল : ২৭৭
'চিলেকোঠার উন্মাদিনী' : নব্য নারীর কলমে
স্বর্ণা সান্যাল ২৯৬
অস্তিত্বের সংকট : কবিতার সংকট
রাম বসু ৩০৩
উত্তর উপনিবেশিক জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে ষাটের বাংলা কবিতা
গণেশ বসু ৩০৭
বাংলাদেশের কবিতা : প্রতিবাদে, প্রেমে
তরুণ মুখোপাধ্যায় ৩২১
সুকান্ত ভট্টাচার্য : পুনর্পঠন
দীপেন্দু চক্রবর্তী ৩২৯
কবিতার উত্তরণ : শিল্পিত পাঠ
অরুণ কুমার বসু : ৩৩৫
তিন দশকের রাজনৈতিক চেতনা : বাংলা কবিতা (ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক)
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : ৩৪৯
"কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে"
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : ৩৫৯

কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

৫

কবি সমর সেন

কবি বিষ্ণু দে

(১৯০৯-১৯৮২)

প্রথম উপাচার্য

(১৯১২-১৯৫৯)

কবি মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১-১৯৪২)

কবি জীবনানন্দ দাশ

(১৮৯৯-১৯৫৪)

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

(১৯৩৩-১৯৯৫)

বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ

(১৯৩২)

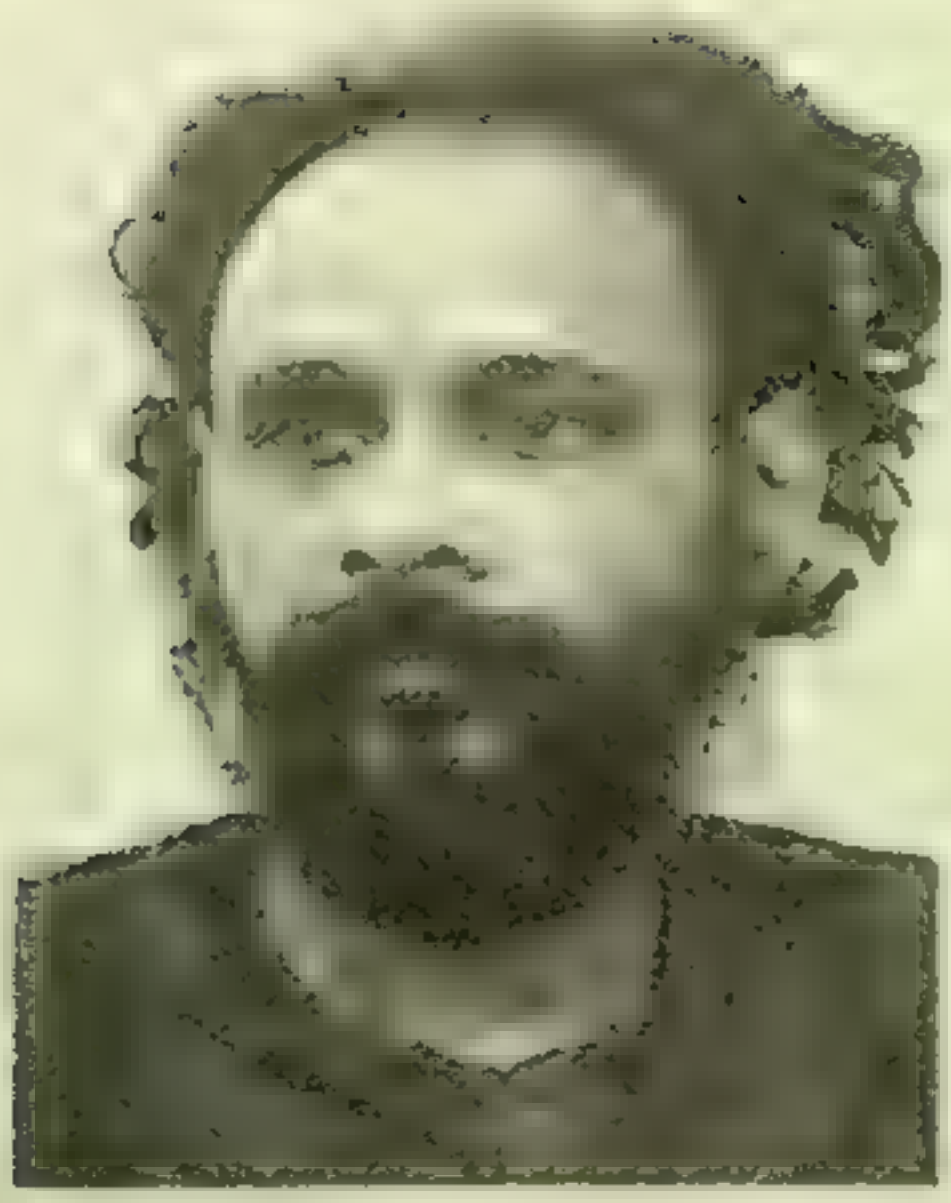

কবি জয় গোস্বামী

(১৯৫৩)

কবি নজরুল ইসলাম

(১৮৯৮-১৯৭৬)

কবি বুদ্ধদেব বসু

(১৯০৮-১৯৭৪)

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(১৯২৪)

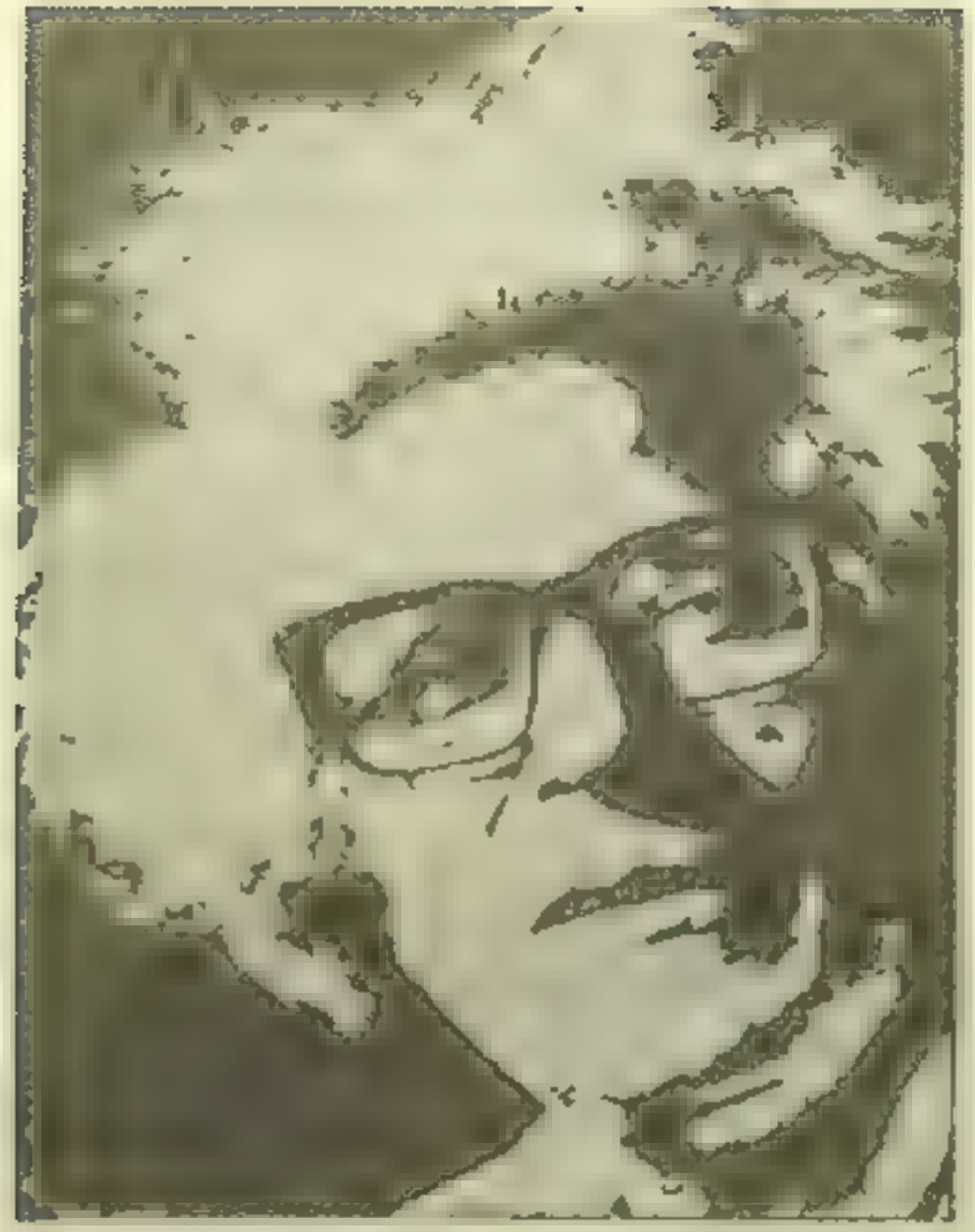

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

(১৯১৯)

বাংলা কাব্যের আদিপর্ব

নির্মল দাশ

১

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] নষ্ট করে ফেলেছে সংস্কৃত বা অপভ্রংশ [illegible] লেখা পুঁথিগুলিকে [illegible] হাত দেয়। [illegible] তা যদি না হবে তবে ঐ যুগের সংস্কৃত ও অপভ্রংশের বইগুলি রক্ষা পেল কীভাবে? কিন্তু [illegible] থাকে তো এই সম্ভাবনাও একেবারে অবান্তর ও হাস্যকর। সুতরাং অন্ধকার যুগের থিওরি বাতিল না করে উপায় নেই। অন্যদিকে একই কারণে বঙ্গীয় যুগের থিওরিও মেনে নেওয়া যায় না। ঐ যুগে যদি সাহিত্যচর্চা বা লেখাপড়া চর্চা করার ফুরসত না থেকে থাকে তবে ঐ যুগের সংস্কৃত বা অপভ্রংশ রচনাগুলি পাওয়া গেল কীভাবে? এমন তো নয় যে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলা লিখতে বেশি সময় লাগত। আসলে দেখতে হবে, ঐ সময়ের সমাজে বাংলায় লিখিত চর্চার কতটা গুরুত্ব ছিল। এ ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সাহিত্য সৃষ্টি [illegible] ও পড়ার বিষয়টা মূলত সমাজের উচ্চ বর্ণ বা উচ্চ বর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই উচ্চবর্ণীয়দের মাতৃভাষা বাংলাই ছিল কিন্তু নিতান্ত ঘরোয়া প্রসঙ্গ ছাড়া বইয়ের লেখাপড়ার কাজে তারা সংস্কৃত অথবা কৌলীন্যী বা অপভ্রংশ ভাষা ব্যবহার করতেন। লেখাপড়ার কাজে বাংলার তখন মূল্য সামাজিক মর্যাদা তখন বাংলা ভাষার ছিল না। এই অবস্থা [illegible] অব্যাহত ছিল। [illegible] আবির্ভাবের পর বাংলা ভাষা সম্পর্কে উচ্চবর্ণের এই সংকোচ ও অনীহা দূর হয়। এই কারণেই পঞ্চদশ শতকে [illegible] বড়ু চণ্ডীদাস বা [illegible] লিখেছেন তাঁরা সকলেই বাংলায় [illegible] লিখেছেন। [illegible] কবি কৌলিন্যের [illegible] ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যের [illegible] প্রসঙ্গের কথা বলা হয়েছে তার পেছনেও একই ইতিহাস [illegible] সমাজের মাথায় যাঁরা আছেন তাঁরা বাংলায় লেখা কাব্যকে [illegible] এই প্রসঙ্গের কথা শুনলে তাঁদের এ ব্যাপারে উৎসাহ [illegible] বলে [illegible] এই [illegible] না [illegible] কবিতা বিষয়ে [illegible] আর সেই কারণেই ঐ যুগের বাংলা রচনার এত দুষ্প্রাপ্যতা।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। সমাজের অন্য কোনও যখন বাংলা লিখতে বাধা নেই তখন চর্যার কবিরা বাংলায় লিখলেন কেন? সেকালের উচ্চবর্ণের প্রতি বিদ্রোহবশত না মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত? আসল কারণ এ দুটোর কোনোটাই নয়। সে কথায় পরে আসছি। আসলে [illegible] সময় সমাজে ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে বাংলা লেখার চল না থাকলেও প্রয়োজন মতো মুখের ভাষা লিখে রাখা বা লিখে দেখানোর চল ছিল। এ প্রয়াসগুলো অবশ্যই [illegible] এবং সেইজন্য এগুলি নিয়ে কোনো ধারাবাহিক সাহিত্যচর্চার প্রশ্ন ওঠে নি। এই সব বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের বিস্তৃত পরিচয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার [illegible] গ্রন্থে (পরিপূরক ৩য় খণ্ড, ১৯৭২ সং) এবং সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে তার দু একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। সুনীতিবাবু

দেখিয়েছেন যে, ১১২৯ খ্রিষ্টাব্দে [illegible] বা আবুলফিরাওয়ি [illegible] নামক বিশ্বকোষ জাতীয় মহাগ্রন্থের [illegible] সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ ও কন্নড় ভাষার ছোট্ট কবিতার সঙ্গে [illegible] নমুনা [illegible] রচনাও সংকলিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তার মধ্যে একটি অবশ্যই বাংলা ভাষার নমুনা

'ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো পেখিন্দ সহ খেলন [illegible] নাবাহণু ভুবতরেক [illegible] ভাতো (আমাকে) ছাড়ো (আমাকে)। আমি ভুবতের স্ত্রী পেখিন্দ [illegible] নাবাহণের সঙ্গে খেলতে যাব

মানসোল্লাসের পূর্বাংশে [illegible] বন্দনা আছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তার মধ্যে মাত্র একটি অবশ্যই বাংলা [illegible]

[illegible] ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নির্গুণিয়া [illegible] পরশরাম দেউ সে মাহব মঙ্গল করউ'

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ [illegible] সেই দেবতা পরশুরাম আমার মঙ্গল করুন।

মানসোল্লাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে [illegible] বিবরণ ও উদাহরণ দেওয়া আছে। তার [illegible] একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে সুকুমারবাবুর সাহিত্যের ইতিহাসে এই পঙ্‌ক্তিটি [illegible]

সংসার সাগর উত্তরে চড়িবা।
কোহ কোহ মোহ বহকেন ভবিবা।।
ইন্দিয় পবণ খর বেগ বহন্তে।
নুক্কিয় লহরী হুণিয় ন পাবন্তে।
[illegible]
[illegible]
ইন্দ্রিয় পবন খরবেগে বহিতেছে,
[illegible]

(সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

এই চর্যা শ্রী সাধুইত চর্যাসংকলনের বহির্ভূত কিন্তু এই চারটি পঙ্‌ক্তিরই দু বার উল্লেখ করে মানসোল্লাসের রচয়িতা বলেছেন

ঈদৃক্ লক্ষণি চতুর্ণি দর্শিতানি মহাদ্ভুত
অধ্যাত্মকাব্যযুক্তানি চর্যানাম্নি প্রবন্ধকে

এই যে চারি পদ আমি এখন দেখাইলাম, (তাহা)
অধ্যাত্মকাব্যযুক্ত হয় চর্যানামক প্রবন্ধে।

(সুকুমার সেন কৃত-অর্থ)

[illegible] উদাহরণ [illegible] সংস্কৃতির ইতিহাসে এই [illegible] অপরূপ প্রকীর্ণ রচনার উদাহরণ দিয়েছেন। [illegible] ব্রিটিশ প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে রক্ষিত [illegible] প্রাপ্ত অবস্থাটি প্রভাবিক বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক [illegible] একটি রচনা [illegible] বেষ্টিত [illegible] সম্পূর্ণ রচনা [illegible] হয় নি। [illegible] শিল্পিত [illegible] (এই রচনায়) [illegible] রচনাটি একটি [illegible] রচনাটির [illegible] নিদর্শন [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] beauty competition। হইয়াছে। [illegible] সুন্দরীর [illegible] (যেমন কবির [illegible] শিল্পনির্দেশিত [illegible] তুলনামূলক [illegible] রচনায় [illegible] শুধু [illegible] তা সত্ত্বেও এর মধ্যে [illegible] এই শুধু [illegible] যা [illegible]

তই কী কত হু কেল রে দীঠে
তেহর তেহর বানসি ধেঠে।। ....

[illegible]

তুই কত (কেন। তুমা) দেখিয়াছিস যে যাহার [illegible] বর্ণনা করিতেছিস [illegible]।

তেড়ি করিয়া যে সুন্দরভাবে কেশ বন্ধন হইয়াছে
খোঁপার উপরে কেমন আমলা (অলঙ্কার) যেন বন্ধন দ্বারা বাঁধা গাঁথা হইয়াছে
অঙ্গে যে বর্বর দুই চাহিয়া দেখ তাহার ললাটের মত কাহার আছে?
কানে পরিয়াছে কাড়িপাত
সুতার হার যোমাবলীকে লর্ণিয়া আছে যেন গঙ্গা হইতে জল (ধারা) যমুনায় মিলিয়াছে
তাহার রূপ দেখিয়া সকলে খেদ করে
শাদা কাপড় কেমন পরিয়াছে যেন মুকুলী ছড়াইয়া বিস্তার করিয়াছে
এমন গৌড়দেশী কন্যা যে বাড়কুলে প্রবেশ করে
সে (বাড়কুল) যেন লক্ষ্মীর দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে (সুকুমার সেন কৃত অর্থ)

তার আগেই বলা হয়েছে এই সব রচনা ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে সাজে যুক্ত এই এদের কোনো ধারাবাহিক অনুগামিতা নেই এইখানেই এই সব রচনার সঙ্গে চর্যাগানের প্রধান পার্থক্য চর্যাগানগুলি ধারাবাহিকভাবে কয়েকশো বছর ধরে রচিত হয়েছে সংগঠিত অনুশীলনের অঙ্গ হিসাবে এই সংগঠিত অনুশীলনের পেছনে আছে ধর্মীয় সংগঠনের সুপরিকল্পিত প্রভাব ও প্রবণতা এই সাংগঠনিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যদল সাপেক্ষতা বস্তুত চর্যাগান যে ধর্মীয় সংগঠনের রচনা সেই সংগঠনের নেতারা ছিলেন অত্যন্ত লক্ষ্যসচেতন বা target-sensitive তাঁরা জানতেন ধর্মীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে তার জনসমর্থনের ভিত্তিটিকে বিস্তৃত করা দরকার সেজন্য তাঁদের অনেকেই তাঁদের রচনার লক্ষ্যদলের (target group) প্রকৃতি অনুসারে রচনার ভাষারও পরিবর্তন করেছেন এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ কাহ্নপাদ কাহ্নপাদের রচনা সংস্কৃত বৌদ্ধসেনী অপভ্রংশ ও কথ্য ভাষা এই তিন ভাষাতেই পাওয়া যায় যেখানে রচনার লক্ষ্য দল দার্শনিক ও সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতজন সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন যেমন পঞ্জিকাযোগরত্নমালা যেখানে তাঁর লক্ষ্যদল পণ্ডিত নয় অথচ সাধারণভাবে শিক্ষিত সেখানে তাদের জন্য তিনি সেকালের শিক্ষিত লোকের সাধারণ ভাষা বৌদ্ধসেনী অপভ্রংশে লিখেছেন দোহা, আর যেখানে তাঁর লক্ষ্য ছিল সমাজের নিম্নস্তরের লেখাপড়া না জানা অগণিত নিরক্ষর মানুষ সেখানে তাদের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত গানের রীতিতে কথ্য ভাষায় চর্যাগান লিখেছেন এই কৌশল একা শুধু কাহ্নপাদেই অবলম্বন করেন নি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের এটা ছিল একটা সাধারণ সাংগঠনিক কৌশল। আর এই কৌশলের অঙ্গ হিসাবেই তাঁরা গানের মাধ্যে পরিকল্পিতভাবে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা থেকে উপমান সংগ্রহ করেছেন, যাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা গানের মধ্যে তাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে তার সম্পর্কে কৌতূহল ও একাত্মতাবোধ করেন চর্যার টীকাকার আচার্য সুমতিশ্রী, অনুমানিক জীবৎকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী)-ও বলেছেন চর্যাগানগুলি 'প্রাকৃতভাষয়া' অর্থাৎ পূর্বাহ্ন বা জনগণের

কথ্য ভাষায় রচিত। তবে এখানে আমার আর একটা শুধু উঠে আসে। তখন তো দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও অন্যান্য আরও ধর্মীয় সংগঠন ছিল। বিশেষত পালযুগে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে নাথ ধর্মও বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিল। নাথ ধর্মের সংগঠকরা কি এই প্রচার কৌশল অবলম্বন করেন নি? তারা কি নাথ ধর্ম প্রচারে কথ্য ভাষায় কিছু লেখেন নি? এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের একান্ত অভাব আছে, তবে শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর লোকসাহিত্যের ধারায় গোপীচন্দ্রের গান ও ময়নামতী বিষয়ক যা একাল পর্যন্ত মুখে মুখে চলে এসেছে তাতে বোঝা যায় তিব্বতীয় সহজযানের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি নাথ ধর্মও জনজীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এ বিষয়ে কিছু রচনাও প্রচারিত ছিল। এই সব রচনার অধিকাংশই অলিখিত হলেও লিখিত রচনাও যে তখন প্রচলিত ছিল তার আভাস সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের আলোচনায় নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। সুনীতিবাবু তাঁর ()[3]()[এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দী ভাষায় গোরক্ষবোধ নামে যে নাথপন্থী গ্রন্থ রচিত হয়েছে বাঙলাদেশে তার পুঁথি রক্ষিত আছে। এই পুঁথিতে যে অন্তর্মূলীন প্রমাণ আছে তা থেকে বোঝা যায় যে 'গোরখবোধে'র উৎস হচ্ছে প্রাচীন বা প্রত্ন বাংলার কোনো প্রাচীন নাথপন্থী রচনা। এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গোরক্ষবোধের পুঁথিতে প্রাপ্ত নিদর্শক কিছু বিচ্ছিন্ন রচনা, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে যা নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বা প্রত্নবাংলার নিদর্শন।

ইহাঁ হীঁ আছই ইহাঁ হীঁ আলোপা
ইহাঁ হীঁ রচিলই তীনি ত্রিলোক
আছই সঙ্গই রহই জুয়া
তা কারণি অনন্ত সিধা জোগেশ্বর হুয়া।।
দৃষ্টি অগ্রে দৃষ্টি লুকাইবা সুরতি লুকাইবা কানম
নাসিকা অগ্রে পবন লুকাইবা তব বহি গয়া পদ নিরবাণম
আয়ো জোগী পইসো দ্বাদস আঁগুল পইসা
পৈসতা পৈসতা হোই সুখ তব জনম মরন কা দুখ।।
আপা ভাঙ্গিবা সত গুরু খোজিবা তাই জোগপন্থ ন কবিবা হেলা
ফিরি ফিরি মনিখা জনম ন পাইবা হরি লই সিধ পুরি ' সু মেলা

এখানেই আছে, এখানেই আলোপ (= প্রকাশ)
এখানেই তিন ত্রিলোক রচিত হল।
সঙ্গেই আছে যুক্ত থেকে,
তার কারণে অনন্ত সিদ্ধ যোগেশ্বর হয়েছে।
দৃষ্টির অগ্রে দৃষ্টি লুকাবে সুরতি (?) কান লুকাবে
নাসিকার অগ্রে পবন লুকাবে তবেই নির্বাণ পদ থেকে যায় (পাওয়া যায়?)

এসো দেবী, প্রবেশ করো, হৃদয় অঙ্গুলিতে প্রবেশ করো
প্রবেশ করতে করতে, প্রবেশ করতে করতে সুখ হয়, তবে জন্ম মরণের যে দুঃখ,
নিজেকে ভঞ্জন (বিশ্লেষণ) করতে হবে, সংযুক্ত খুঁজতে হবে, যোগপন্থাকে ভুলে করবে না,
মনুষ্য-জন্ম ফিরে ফিরে পাবে না,
সিদ্ধ পুরুষের কাছ থেকে মুক্তি (আ)হরণ করে নিতে হবে।

এই রচনায় কাব্যরস নেই বটে, তবে বাংলা কাব্যের প্রাগাধুনিক পর্বের একটা অভ্রান্ত কাঠামো এখানে পাওয়া যায় যার সঙ্গে বৌদ্ধ চর্যাপদ ও অবৈত পরবর্তী কালের সহজিয়া ও বাউল গানের গভীর সাদৃশ্য। চর্যাগানগুলি যখন রচিত হচ্ছিল, তখন নাথপন্থী ধর্মগুরুরাও যে লিখিতভাবে পদরচনা করতেন তারও নিশ্চিত প্রমাণ আছে, এবং সে প্রমাণ পাওয়া যায় শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপুথিতেই। ঐ পুথিতে ২১ নং চর্যার টীকায় মুনিদত্ত নাথধর্মগুরু মীননাথের একটি ছোট রচনা উদ্ধৃত করেছেন। মীননাথ যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মন মুনিদত্ত সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই টীকায় মীননাথের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'তথা চ পরমার্থদর্শনে মীননাথ'; অর্থাৎ মীননাথ বৌদ্ধ ভিন্ন অপর দর্শনের অনুগামী। মুনিদত্তের টীকায় উদ্ধৃত মীননাথের রচনাটি নিম্নরূপ :

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ সমাধিকপাট।
কমল বিকশিল কহিহ ন জমরা
কমলমধু পিবিবি দোহে ন ভমরা।

গুরু কহেন পরমার্থের বর্ত্ম, কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি কপাট। কমল ফুটিলে ভ্রমর কহিবে না, কমলমধু পান করিতে ভ্রমর ভুলে না। (সুকুমার সেন কৃত অর্থ)

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এটি প্রত্ন বা প্রাচীন বাংলাতেই রচিত। তবে সুকুমার সেন একে বলেছেন দোহা। হয়ত এর আকার-হ্রস্বতার জন্যই এই নামকরণ। কিন্তু চর্যার প্রাচীন সংজ্ঞা অনুসারে তো চর্যা চার লাইনেরও হতে পারে। মানসোল্লাসে উদ্ধৃত চর্যাটি চার লাইনের এবং তাতে ভণিতাও নেই। সুতরাং মীননাথের এই রচনাটিকে 'চর্যা' বলে ধরতে অসুবিধা কোথায়? এই অনুমান যথার্থ হলে বলতে হয় চর্যা শুধু তান্ত্রিক বৌদ্ধরাই লেখেন নি, নাথযোগীরাও বাংলায় চর্যা লিখেছিলেন। তবে নাথযোগীদের এই শ্রেণীর লিখিত রচনার আরও নিদর্শন আমাদের জ্ঞানের বাইরে। অতীতের কোনো তালিবানি হামলায় বা অন্য কোনো কারণে তা যদি ইতিমধ্যেই নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আগামী দিনের কোনো আবিষ্কারকের অপেক্ষায় তা হয়ত কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

যাই হোক, এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তাতে বোঝা গেল, বাংলা কবিতার আদি পর্বে বা গোড়ার দিকে বাংলা কাব্যভাষার তথা সাধারণভাবে বাংলা ভাষার কোনো মান্য

[illegible] ছিল [illegible] প্রভাব অন্য দিকে [illegible] ছিল [illegible] অপভ্রংশ [illegible] আঞ্চলিক ভিত্তি। এই পর্বের ভূমিকা কাব্যরূপের কোনো সুনির্দিষ্ট [illegible] ওঠে কি, তার বদলে দেখা দিয়েছে ভাষাগত প্রত্ন লক্ষণ। এই প্রত্ন লক্ষণগুলির মধ্যে পরবর্তী কালে সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে ওঠা বাংলা ভাষার উপাদানগুলি প্রধান, থাকায় অনিবার্যভাবে বচনগুলিকে প্রত্ন বাংলায় রচিত বলে চিহ্নিত করা [illegible]। কিন্তু যে আলোচনা হল তাতে দেখা গেল এই সুনির্দিষ্ট সমস্যাকে বাদ দিলেও কাব্যনির্মাণ [illegible] চর্যাপদগুলি। তাই বাংলা কবিতার আদি পর্বের আলোচনায় চর্যাপদগুলিই অবশ্যই প্রধান অবলম্বন।

২

চর্যাপদগুলির কবিত্ব সম্পর্কে মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে দু একটি প্রাসঙ্গিক কথা [illegible] বলে নেওয়া দরকার। এই প্রাসঙ্গিক কথা চর্যার যথাযথ পাঠোদ্ধার ও অর্থবোধ নিয়ে। কারণ ১৯১৬ সালে চর্যাপদগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চর্যার উপর [illegible] হস্তক্ষেপ ঘটেছে। পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পাঠকেরা [illegible] অসুবিধা অনুভব করেছেন। সবারই নিজস্ব অর্থবোধের পক্ষে সুবিধাজনক পাঠ নির্ণয় দিয়ে পুঁথির পাঠ সংশোধন করেছেন। যেমন ৩ নং চর্যার প্রথম পঙ্‌ক্তি হিসাবে পাওয়া গেছে 'লুয়া আজ পহিলেঁ গবাহকা নাহি নিসাণা', কিন্তু ডঃ প্রসাদ শাস্ত্রী পাঠ সংশোধন করে পাঠ করেছেন 'গবাহকের পর একটি দুই দাঁড়ি আছে অর্থাৎ [illegible] শুরু পাঠ 'পইঠেল গবাহক নাহি নিসাণা' অর্থাৎ এটি দুটি সরল বাক্য। 'পইঠেল গবাহক' গ্রাহক প্রবেশ করল। 'নাহি নিসাণা' নাই নিদর্শন বা চিহ্ন। যেখানে পাঠটি একটি দীর্ঘ বাক্য কিন্তু চর্যাপদের সাধুনিক ব্যাকরণ মাথায় [illegible] 'গবাহক' এর সঙ্গে যুক্ত 'আ' কারকে কি বুঝা বলা যায়। চর্যাভাষার অনাদ্যন্ত সম্বন্ধ বিভক্তি 'আ'। অন্যান্য চর্যাতেও দেখা যায় সম্বন্ধে 'আ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে, যেমন ৩ নং চর্যায় 'মুঢ়া তিঅহি' মূঢ়ের জন্যে, ১৫ নং চর্যায় 'মাআমোহাসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি' = তবে, মায়ামোহসমুদ্রের অন্ত বুঝিস না। অন্যদিকে 'পইঠেল' ক্রিয়াপদ নয়। ইল অন্ত কৃদন্ত বিশেষণ যার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত চর্যাভাষায় পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত পঙ্‌ক্তির আক্ষরিক অর্থ প্রবিষ্ট গ্রাহকের নিদর্শন নেই। কাজেই এটি একটি গ্র কর্তৃপদ ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য, একে কাঠামোর দিক থেকে যৌগিক বাক্য বলে ধরার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পাঠের পর আর যাঁরা পাঠবিচার করেছেন, তাঁরা সকলেই পাঠের পাঠসংশোধনকে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে চর্যার অর্থভেদ বা অর্থবিশ্লেষণ ক্ষেত্রেও একই রকম বিশৃঙ্খলা। যিনি যেমনভাবে পেরেছেন পুঁথির পাঠের যৌক্তিকতা গভীরভাবে বিবেচনা না করেই অর্থ নির্দেশ করেছেন। এই অর্থগত বিশৃঙ্খলার একটি ভালো উদাহরণ ৩৩ নং চর্যা ও তার প্রচলিত নানা পাঠান্তর ও অর্থভেদ। এই

বিশ্বভারতীর শুরু একেবারে সমকালীন কাল থেকেই। আধুনিক কালনির্ণয় পাঠোদ্ধার করেছিলেন ঢেণ্ঢণপাদ তাঁর অনুসরণে আরোও পাঠ নিয়েছেন ঢেণ্ঢণপাদ কিন্তু এখানে ভাবা দরকার 'ঢেণ্ঢণ' শব্দের অর্থ কী? কারণ চর্যায় গ্রন্থ আর ২২জন কবির নামেরই অর্থ আছে। 'ঢেণ্ঢণ' শব্দের তেমন কোনো আপাতগ্রাহ্য অর্থ নেই। এখানে দেখা দরকার 'ঢেণ্ঢণ' এই পাঠ গ্রহণ ঠিক আছে কিনা। কারণ চর্যার পুথিতে 'ট' ও 'ঢ' বর্ণ একই হরফ বা ছাঁদে লেখা হয়েছে (মধ্যযুগের নানা পুথিতে তেমন ন হরফ দিয়ে ন ও 'ল' দুটি হরফকেই বোঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গ ধরে ঠিক করতে হবে বর্ণটি দন্ত্য ন না ল)। প্রসঙ্গ ধরে বর্ণটির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে আধুনিক পাঠোদ্ধার পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায় তিনি এই পাঠোদ্ধারের প্রতিক্ষেত্রেই যেখানে চরণটি 'ট' পড়া উচিত সেখানে তাকে 'ঢ' বলে ধরেছেন আর যেখানে 'ঢ' পড়া উচিত সেখানে তাকে 'ট' ধরেছেন। তাই ঢেণ্ঢণ শব্দের অর্থ পাওয়া না গেলে 'ঢ' এর বদলে ঐ ভাষায় 'ট' ধরে 'টেণ্টণ' পাঠ নিলে কোনো অর্থ হয় কিনা দেখা দরকার। পাঠ 'টেণ্টণ' নিলে দেখা যাচ্ছে হাজার বছর ধরে প্রাকৃত মৈথিলী ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন বচনে 'টেণ্টণ' শব্দটি কোথাও জুয়াড়ি অর্থে, কোথাও 'মূর্খ' অর্থে কোথাও বা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে। এমন কি আধুনিক বাংলাতেও গ্রামাঞ্চলে এই স্বভাবের মানুষকে 'টেণ্টা' বা 'টেণ্টিয়া' বলা হয়। এ গানের বাগভঙ্গির মধ্যে এই ধরনের মূর্খতা বা চরিত্রের ছাপ আছে বলে মনে হয়। কবি এই ধরনের পদ লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই ছদ্মনাম হিসাবে নির্বাচন করেছেন। বিভ্রান্তি অর্থবোধ নিয়েও। 'টেণ্টণ' মোর ঘর নাহি পড়োসী — কেউ কেউ 'টেণ্টণ' শব্দের অর্থ করেছেন পাহাড়ের টিলা। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। এই কারণে যে এই অর্থে গানের মূল বচনভঙ্গি paradox বা বিরোধাভাসটি ফুটে ওঠে না। পাহাড়ের উঁচু টিলায় বাস সেখানে তো প্রতিবেশী না থাকারই কথা। এতে বিরোধাভাস কোথায়? আমার টেণ্টণ টাড = ডাঙা জায়গা। ডাঙা জায়গায় দুর্গম পাড়া বা লোকালয় শূন্য। এই পঙ্‌ক্তির প্রকৃত অর্থ 'পাড়ায় আমার বাড়ি (কিন্তু) প্রতিবেশী নেই। অনুরূপ বিভ্রান্তি বেণা, বেণা। সংসার বড়হিল দুন্দ্র পঙ্‌ক্তিটিকে নিয়েও। কেউ কেউ বেণা পাঠ ধরে অর্থ করেছেন 'বেণা সংসার বেড়ে যায়'। কেউ বা 'বেঙ্গ' পাঠ ধরে অর্থ করেছেন 'ব্যাঙের সংসার বেড়ে যায়'। কেউ কেউ এই পাঠের উপর ভিত্তি করেই আরো অনেক দূরে এগিয়ে বলেছেন সংসারে ব্যাঙাচির মতো প্রচুর সন্তান থাকায় ঘরে নিরন্তর অন্নাভাব (হাউঁড় ভাত নাহি)। কিন্তু 'বেণা' বা 'বেঙ্গ' যে পাঠই নেওয়া হোক না কেন তাতে মূল বাগভঙ্গি বিরোধাভাস কোথায়? এক্ষেত্রে টীকা ও টিকাটি অনুবাদের সাহায্য নিয়ে দেখা হয় প্রকৃত পাঠ 'বেণা' নয়, 'বেঙ্গ'। তবে তার সঙ্গে 'সংসার' এর 'স' (চর্যার পুথিতে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুর হরফ একই — সংশ্লিষ্ট বর্ণের উপর গোল (০) চিহ্ন) জুড়তে হবে। সঁ < সম বাংলা বিভক্তি নয় মধ্য মৈথিলীতে 'সঁ' একটি করণ বিভক্তি, বেঙ্গসঁ = ব্যাঙের দ্বারা। সাদ = সাঙ্গ পুথিতে

এক্ষেত্রে ব হরফটি অন্য জায়গার ব থেকে ঈষৎ পৃথক দেখায়। এতে প এর আবছা over-writing থাকতে পারে। আর 'বড়হিল' পদের অর্থের সঙ্গে 'বেড়ে যাওয়া' বা বৃদ্ধি পাওয়া র কোনো সম্পর্ক নেই। 'বড়হিল' পদটি উদ্ভূত হয়েছে বড় (= কাটা, ছেঁড়া, টুকরো করা ইত্যাদি) ধাতু থেকে। সুতরাং পঙ্‌ক্তিটির প্রকৃত পাঠ 'বেঙ্গর্ সাপ বড়হিল জাঅ' এর প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ 'ব্যাঙের ছানা সাপ কাটা পড়ে', অর্থাৎ ব্যাঙ সাপকে কাটে। এই আর্থ ঈক্ষিত বিরোধাভাস সুস্পষ্ট। চর্যার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধারে পণ্ডিতেরা টীকা ও তিব্বতি অনুবাদের সাহায্য অবশ্যই নিয়েছেন। কিন্তু এ কাজ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করা হয়নি। আগামী দিনে যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করবেন, তাঁদের এ ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকতে হবে। সেই সঙ্গে আগামী দিনের চর্যা-গবেষকদের আরো একটি দুষ্প্রাপ্য পুথির সাহায্য নিতে হবে। এটি হল চর্যাগুলির ও তার মুনিদত্ত-কৃত টীকার তিব্বতি অনুবাদের মোঙ্গলীয় অনুবাদ। এই অনুবাদ লিখিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে করা হয়েছিল। এই অনুবাদ 'কাঙ্গ্যুর' সংকলিত হয়েছে। মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরের বর্তমান গ্রন্থাগারে ঐ কাঙ্গ্যুরের একটি পুথি রক্ষিত আছে। এই পুথির পুনরনুবাদের মাধ্যমে হয়ত চর্যার পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত হতে পারে। ভবিষ্যতেও চর্যার কালক্রম বিচারের আগে পাঠোদ্ধারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ পাঠোদ্ধারে ভ্রান্তি থাকলে রসোদ্ধারেও তার জের চলবে।

৩

বাংলা কবিতার আদি পর্বের একমাত্র বড়ো নিদর্শন চর্যাপদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মানবসমাজের তার তাত্ত্বিক বা ধর্মীয় পটভূমির কথা মনে আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা তা বাদ দিয়েই চলব। কারণ সেই তত্ত্বের সঙ্গে গানগুলির কাব্যিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং বলতে হয় বিরোধিতা বা অসামঞ্জস্যই আছে। কারণ তত্ত্বের দিক থেকে চর্যাকারেরা জীবন ও জগৎকে অলীক ও অসত্য বলেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে কৌতূহলের অসম্ভবের বিষয় হচ্ছে এই যে, জগৎ ও জীবনের অসত্যতা উপমা দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তাঁরা তথাকথিত অসত্য জগৎ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। যেমন, ৪১ নং চর্যায় ভুসুকু বলেছেন 'আইএ অইঅনা এ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই' = এ জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নি, ভ্রান্তিবশতই তা (সত্য বলে) প্রতিভাত হয়। কিন্তু দেখার ভুলে অসত্য যে সত্য হয় না তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে কবি পরের পঙ্‌ক্তিতে 'অসত্য' জগৎ থেকেই মোক্ষম উপমান নিয়েছেন। 'রজসাপ দেখি জো চমকিই যাবে কিং তং বোড়ো খাই' = (দেখার ভুলে) যে রজ্জু দেখে (তাকে) সাপ মনে করে চমকে ওঠে, তাকে সত্যিই কি বোড়া (সাপে) কামড়ায়? সুতরাং চর্যার বাচ্য ও বচনের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটুকুতেই আমাদের মতো রসপিপাসু পাঠকদের লাভ, কারণ উপমানের ভেতরের অর্থ যাই হোক তার বাচ্যার্থে যে জীবন ও জগৎকে

পাওয়া গিয়েছে তাতেই আমাদের সমস্ত চরিত্রটি হতে পারে

তাই তাদের কথা একেবারে বাদ দিলে এমন কি চর্যার শুদ্ধ অলঙ্কারের বহু আলোচিত প্রসঙ্গ বাদ দিলে একেবারে সমাজনির রসের উৎস সন্ধানে নামা যাক। চর্যার সর্বত্র রসের ছড়াছড়ি না থাকলেও তার যতটুকু উৎসার ঘটেছে তাতে দেখা যায় চর্যায় বিরহটি রসের প্রাধান্য। শৃঙ্গার করুণ ও হাস্য শৃঙ্গার রসের কবিতাগুলি প্রধানত দুটি যুগলকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে। একটি যুগলের নায়ক নায়িকা কাহ্ন ও ডোম্বী। আর অপর যুগলের নায়ক নায়িকা শবর শবরী। কাহ্ন ও ডোম্বী প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে (চর্যা ১৯), কিন্তু বিয়ের আগেই তাদের প্রেম জীবন বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। কাহ্ন ইতিপূর্বেই বিবাহিত সংসারে তার মা আছেন। নন্দ (তিব্বতি অনুবাদ অনুসারে লিসিমা বা মাসিমা) ও শবরী ছিল কিন্তু তাদের মেয়ে বোধ সে গৃহত্যাগী হয়েছে (চর্যা ১১)। এখন সে ডোম্বনির প্রেমে মাতোয়ারা। ডোম্বনিকে সে সাড়া করতে চায়। ডোম্বনির প্রতি তার ভালবাসা ঐকান্তিক। তার কথা সে তার সহকর্মীর কাছেও ছেড়েছে (চর্যা ১০)। কিন্তু ডোম্বনির আচরণ সন্দেহজনক, সে কাহ্নের কাছে দয়া নিলেও পাশাপাশি অন্য কুলীনদেরও সে ছাড়ে না (চর্যা ১৮)। তাকে আবার জানে লীলাভরে যাতায়াত করতে দেখা যায় (চর্যা ১৫)। কাহ্ন বুঝতে পারে ডোম্বির অন্যত্র নষ্টি ছিলনী (চর্যা ১৮)। (ডোম্বনির বাড়ি ছিলনা নেই)। কিন্তু সে ডোম্বনিকে ছাড়তে পারে না। তাই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ডোম্বনিকে জিজ্ঞাসা করে :

হা লো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
আইসসি জাস ডোম্বি কাহরি নাবে (চর্যা ১০)

ওলো ডোম্বনি তোকে সদভাবে জিজ্ঞাসা করি তুই আসিস যাস কার নৌকায়।

ডোম্বনির এই দ্বিচারিতায় সে প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে

মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ। (চর্যা ১০)

ডোম্বনি তোকে মারব, তোকে খুন করব।

বিগত এক হাজার বছরে প্রেমের কবিতা অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রেমানুভূতির সঙ্গে এমন ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার জ্বালা মিশ্রিত বিচিত্র মনস্তত্ত্ব আর কটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে? মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমমনস্তত্ত্ব অনেক সূক্ষ্মতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু রক্তমাংসের এমন উত্তাপ সেখানে (সেখায়? এ গানের তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, এর বাচ্যার্থের বিরল ব্যঞ্জনায় আমাদের রসবোধ তৃপ্ত না হয়ে পারে না।

অন্যদিকে, শবর শবরী বিবাহিত দম্পতি হলেও তাদের পরিচিত দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও আছে অপরিচয়ের আলোছায়া। শবরী মেয়েটি ময়ূরের পালক পরে গলায় গুঞ্জাফুলের টকটকে লাল মালা দুলিয়ে একলা একলা পাহাড় পথে চলেছে। এত সুন্দর হয়েছে তার সাজগোজ যে, তাকে দেখে তার স্বামী শবর তাকে চিনতেই পারল না, সে

ভাবল এ অন্য কোনো কাপালী। সে মুক্তিটির জন্য আকুল হয়ে উঠল। শবরী তখন স্বামীকে শান্ত করার জন্য বলল :

উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী
নিঅ ঘরিণী লাম্ব সহজ সুন্দরী। (চর্যা ২৮)

উন্মত্ত শবর পাগল শবর তুমি ভুল কোরো না। দেহই তোমার
(আমি) সহজসুন্দরী নামে তোমার নিজেরই ঘরনি।

শবর শান্ত হল। তারপর সে শবরীকে গলায় জড়িয়ে ধরে মিলনশয্যায় সারা রাত কাটিয়ে দিল। এইরকম প্রগাঢ় মিলনের সুন্দর ছবি আছে চর্যাসংকলনের শেষ গানটিতে। এটিও শবরপাদের রচনা :

হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা
সুকড় এসেঁ রে কপাসু ফুটিলা।।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি জাএলা
ফিটেলি অন্ধারী রে আকাশ ফুলিঅ
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শালিএর গান্ধেলা
অণুদিন সরলা কিম্পি ন জানই সহাসুখেঁ ভোলা। (চর্যা ৫০)

প্রাকারের মতো উঁচু তুষার (নাকি তেতলা) বাড়ি। তার পাশেই জোৎস্না প্লাবিত আর একটি বাড়ি। জোৎস্নার আলোয় চারদিক ভরে গিয়েছে। আকাশ দূর হয়েছে। আকাশে ফুটেছে (তারার) ফুল। জোৎস্নার মধ্যে ফুটে আছে শাদা শাদা কাপাস ফুল। বাতাসে ভেসে আসছে পাকা ধানের গন্ধ। এক মধ্যে শবর শবরী মিলনমত্ত হল। দিনের পর দিন শবরের কোনো চেতনা নইল না। সুখের আবেশে সে বিভোর। যেন সব প্রকৃতি যার হাত দিয়ে দেখিয়েছে। পেশাগত কারণে তিনি জগৎ বিমুখ যোগীপুরুষ হতে পারেন। কিন্তু তিনি যেখানে নরনারীর জীবনের মধ্যে প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন সেখানে তাঁকে প্রকৃতিচেতন মানবপ্রেমিক এবং কবি বলব না কোন যুক্তিতে? তবে চর্যায় শুধু দাম্পত্য মিলনের ছবিই নেই, দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে বিবাহপ্রাপ্ত নরনারীর বিশিষ্ট মিলনমত্ততার ছবিও পাওয়া যায়। 'সাসুধরে ঘালি কোঞ্চা তালা' (চর্যা ৪)। শাশুড়ির ঘরে তালাচাবি পড়ল। কাহ্নপাদ যোগিনী এবার জড়িয়ে ধরে যোগীকে আলিঙ্গন করে। কমল (= স্ত্রীলিঙ্গ) ও কুলিশের (= পুংলিঙ্গ) যোগাযোগে বিকাশ ঘটিয়ে এল

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দেই অঙ্কবালী
কমলকুলিশ ঘান্টি করহুঁ বিআলী।। (চর্যা ৪)

এই আবিষ্ট মিলনের মুহূর্তে প্রেমিক যোগীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়

যোইনি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি।।

মেখলিনী, তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। তোর মুখচুম্বন করে কমলমধু পান করি। এই যোগী মেখলিনী কি নিতান্তই শুধু হরগৌরীর সাধক সাধিকা? এখানেও কি বলতে ইচ্ছা করে না 'সত্য করে কহ মোরে হে (সাধক) কবি কোথা তুমি পেয়েছিলে এ প্রেমচ্ছবি?' এ প্রেমচ্ছবি যদি কোনো নরনারীর হয় তবে এক কবিতা বলতে দোষ কোথায়? এ কবিতায় বিরহের উষ্ণতা আছে কিন্তু কোনো বিকৃতি নেই। তাই এটি অশ্লীল নয়। হাজার বছর আগেকার একজন কবির মধ্যে এমন জীবনসংবাগ সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে।

চর্যায় করুণরসের বিমূর্ততায় অন্তত দুটি রচনা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। একটি কবিতায় এক পেশাদার মেয়ের অন্তরকথায় তার প্রসূতি অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। মেয়েটি নরনারীকল্প বিরহিত। কিন্তু তার স্বামী তার প্রতি উদাসীন। তার সন্তান প্রসবের সময় হয়েছে কিন্তু আতুরঘরের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। তাই তার বাসনার পুঁজি যে প্রথম সন্তান নাড়ি কাটতে না কাটতেই সে হারিয়ে ফেলে

পহিল বিআলে মোর বাসনঘুড়া।

নাড়ি বিছুড়েন্তু সেব বাসুড়া (চর্যা ২৭)

উদাসীন স্বামীর প্রতি অভিমানের সঙ্গে সন্তানহারা একটি মায়ের অপূর্ণ বাৎসল্য বোধ মিশে গিয়ে এই পঙ্‌ক্তিদুটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এর চর্যাগুলি অর্থ যাই হোক, এর কাব্যগুণের মানবিক রস উপভোগ করতে বাধা কোথায়? এই রকম বিরহভাব আর একটি কবিতা পাই ভুসুকুপাদের হাতে (চর্যা ২৯)। পদ্মাবতীতে ভুসুকুর নীরহর চলছে সঙ্গে তার স্ত্রী এবং সোনা রূপা ও তার কটি টাকার ভাণ্ডার। হঠাৎ নীরহরে ডাকাত পড়ল। কিন্তু ডাকাতেরা সেখানকার টাকা পয়সা সব লুট নিল। এমন কি তার স্ত্রীকেও তুলে নিয়ে গেল। চাঁড়ালের হাতে পড়ে তার স্ত্রী মৃত্যুমুখে হল। এই সব জেনে নিঃস্বতার মুহূর্তে কবির মনে হল জীবন এখন অর্থহীন :

চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।

জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ (চর্যা ৪৯)

এরা বাঙলা এই রিক্ততার মূল নিয়ে সাধক কবি আসলে তত্ত্বকথাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তত্ত্বের পাটাতন ভেঙে তাঁর আসল চেহারা এক হৃতসর্বস্ব রিক্ত মানুষ। যার সোনাদানা এমন কি স্ত্রীও ডাকাতের হাতে লুট হয়ে গিয়েছে। তার হতাশা ও বিধুর স্মৃতিটিই তো আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। এমন মর্মস্পর্শী কবিতা হাজার বছর আগে আর ক'জন লিখেছেন?

চর্যার আর একটি কবিকে উৎপলন হাসারস। তবে চর্যার মধ্যে হাসারস কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। কখনো pun এর বাক্‌চাতুর্যে, কখনো-বা ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম টিপ্পনীতে

তা এক অপরূপ বাকবিন্যাস পরিণত হয়েছে চর্যার pun এর উদাহরণ তার সন্ধাভাষার বাক্যাবলীতে যার মধ্যে আছে সন্ধ্যাশব্দের চতুর ব্যবহার ইংরেজিতে যা pun, বাংলা বা ভারতীয় মতে তা শ্লেষ অলঙ্কার শ্লেষ দু রকম সভঙ্গ ও অভঙ্গ pun দুরকমেরই হয় কিন্তু সন্ধ্যা শব্দ শুধু সভঙ্গ শ্লেষ এখানে শব্দটি ভেঙ্গে তার দ্বিতীয় অর্থ উদ্ধার করা হয় কবি টেন্টনপাদ যখন বলেন বলদ বিআনল গবিয়া বান্ধ (চর্যা ৩৫) (= বলদ বিয়োল, গাইগরু বাঁধা) তখন অসম্বন্ধের মোহনায় মানুষের চেতনা প্রথম ধাক্কা খায় কিন্তু যখন টীকার সাহায্যে জানা যায় যে বলদ বান্ধব অর্থ বলদটি (এখানে বলদ এর তাত্ত্বিক অর্থ অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান) তখন বিস্ময়ের কেন্দ্র যায় শুধু pun নয় বাক্যের শাণিত মাত্র কোথা কোথা চর্যায় বাক্যের ও সম্বন্ধের যেন অসঙ্গতি ঘটিয়ে ধাঁধা উদ্ভাবন তা বেশ উপভোগ্য। সামাজিক অনুশাসনে অবরুদ্ধ ভোমনী যেন নগরের বাইরে বাস করতে বাধ্য হয় কিন্তু জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের দুরাচারী তার যখন স্পর্শ পাওয়ার জন্য কাঙাল, তাই ভোমনী তাদের কোলাহল সম্বন্ধে করে (চর্যা ১০) জাতিভেদপ্রথা এমনই অলঙ্ঘ্য।

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ

ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।

ভোমনি নগরের বাইরে তার কুঁড়েঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস সেই ব্রাহ্মণকুমারকে সমাজে জাতিভেদ প্রথা যে কতটা অমানবিক তা বোঝা যায় কাহ্ন পাদের ১৯ নং গানে এই গানে দেখা যাচ্ছে কাহ্ন ব্রাহ্মণের বাড়ির সামনে ডোমনিকে নিয়ে নৃত্য করছে। প্রশ্ন উঠেছে ডোমনি নিবারিআ অহর্নিশি বুহ্ম ডোমনিকে নিয়ে নৃত্য করে তো জাত খোয়া গেল। কিন্তু সাথে সাথে উত্তর পাওয়া গেল কুড়ুকুড়ুকে কিঅ অকুড় দম্ম' কৌতুক যা পাওয়া গেল তাতেই ধর্মরক্ষা হল অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলের কাছে বাহ্যিক মূল্যবোধ একেবারে বর্জিত এই অসঙ্গতিই কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করেছে। সামাজিক অনুশাসনের অন্তঃসলিলধারা কুক্কুরীপাদের ১ নং গানেও উদ্ঘাটিত হয়েছে

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।

রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।

অন্তঃপুরিকা কুলবধূ সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে এই সন্ত্রস্ত যে বাইরে থেকে আসা কামরূপের ডাক শুনলেও সে ভয়ে স্তম্ভিত হয় কিন্তু কী আশ্চর্য রাত্রিবেলা তখন বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে কামরূপের প্রেমিকের অভিসারে চুপি চুপি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়ে তাঁর প্রেমোন্মাদনার কাছে কুলধর্মের মূল্য কতটুকু

সমাজে শুধু কবিতা তত্ত্বগুলিই নয় মূল্যবোধের সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটেছে সার্বিক ভাবে যে দুঃসহ অসঙ্গতি দেখা দেয় চর্যার কবি তাতে আহত হয়েও নিরুপায় কৌতুক বোধ করেছেন। এই কৌতুকবোধের মধ্যেই ফুটে উঠেছে তাঁর নিরুচ্চার প্রতিবাদ

জো সো বুধী সো নিবুধী।

জো সো চৌর সো ঘুকাধী।। (চর্যা ৩৩)

যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সে ই নির্বোধ, যে আসলে চোর সে ই হয় সাধু। মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হলে সমাজে এমন অঘটনই সত্য হয়ে দেখা দেয়। চর্যাগানের এই উক্তির তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, বাচ্যার্থে এই পদ বর্তমান পর্যন্ত সমাহিত। স্থানের দিক থেকে এই পদ হাজার বছর পরের এক কবির সুপরিচিত পঙ্‌ক্তিচয়ের সমতুল্য

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, দ্বিধা নেই, করুণার আলোক নেই,
পৃথিবী প্রচণ্ড আজ তাদের সুকঠোর মুঠোর ভিতর

পাদটীকা :

১ সম্প্রতি অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চর্যার [illegible] থেকে পাওয়া কতকগুলি পোড়ামাটির ফলকের আবিষ্কার করেছেন। এই সব ফলকে কিছু কিছু কথা লিখিবদ্ধ [illegible] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে রচনাগুলির কালো [illegible] নাম চর্যার বাংলা

২ এখানে সুনীতিবাবু ও সুকুমারবাবুর প্রদত্ত পাঠে কিছু গরমিল আছে। সেই কারণে অর্থোদ্ধারেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

৩ এখানেও পূর্বোক্ত দুইজনের পাঠে গরমিল আছে।

৪ সুনীতিবাবু এই বচনার অর্থোদ্ধার করেননি। প্রদত্ত অর্থ [illegible] শব্দকারের, তবে পাঠ অনেকক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হওয়ায় অর্থও স্বচ্ছ নয়

৫ দ্রষ্টব্য মধ্যযুগের কাব্যপাঠ নির্মল দাশ, কলকাতা ১৯৭৮

৬ An Anthology of Buddhist Tantric Songs A Study of the Caryagiti- Per Kvaerne, Oslo, Norway, 1977

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অভিনয় সঙ্কেত

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের [illegible] চারটি

১। পদরীতি

২। পাঁচালী রীতি

৩। গীতিকা রীতি

৪। নাটগীত রীতি

প্রথম রীতির উদাহরণ হয় পদ [illegible] ও [illegible]

দ্বিতীয় রীতির লেখা হয়েছে মঙ্গলকাব্য [illegible] অনুবাদগুলি যথা কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী [illegible]

তৃতীয় রীতির [illegible] রীতিতে

চতুর্থ রীতির [illegible] হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

[illegible] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের [illegible] অভিনয়, [illegible] সঙ্গে সম্পৃক্ত এ [illegible] নাট্যশালার আয়োজন।

৪১৯টি পদের সমন্বয়ে [illegible] যদিও পদরীতিতেই [illegible] কিন্তু [illegible] পদগুলিতে [illegible] প্রসঙ্গ সঙ্গীতের সাথে [illegible] অভিনয় সংস্কৃতির চিহ্ন [illegible] এসেছে [illegible] দণ্ডক ইত্যাদি পদের দৃষ্টান্ত সহযোগে এই সমস্ত [illegible] বাক্য করা যেতে পারে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন [illegible] গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাঁকে অনুসরণ করেই এই প্রবন্ধ।

১। **দণ্ডক** — শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে সমস্ত পদ বিরহজনিত একোক্তি বা মনোলাপ তাকেই কবি [illegible] দণ্ডক বলা [illegible] রাধার প্রতি কৃষ্ণের একটি উক্তি—যাতে রাধাকাপের বিবৃতি [illegible] (৭৩)

সমস্ত পদটি রূপমুগ্ধ কৃষ্ণের রাধার রূপবর্ণনা, পদটি [illegible] কৃষ্ণের উক্তি রাধার প্রত্যুত্তর নেই কাজেই এটা সংলাপ হয়ে উঠল না এটা কৃষ্ণের একালাপ রাধার উদ্দেশে

[illegible]

২। লগনী [illegible] যেমন—দানখণ্ডের ৫২ নং পদ—

কৃষ্ণ— [illegible]
প্রাণ মোর ফুটি জাও বুক মেলে চীর।
রাধা— [illegible]
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।।
কৃষ্ণ— [illegible]
তোহ্মে মোর সব ঠীক তোহ্মে পূণ্যস্থান।।
রাধা— [illegible]

[illegible] বলে

৩। লগনী দণ্ডক [illegible]

কৃষ্ণ— বাতার বহ তোঁ কাহার রানী।
কেহ্নে যমুনা তোলসি পানী।।
রাধা— বড়ার বহ মো বড়ার বী
আহ্মে পানী তুলি তোহ্মাতে কী।।

[illegible] চারলাইন ভনিতা সহ কবির বিবৃতি—

[illegible] চণ্ডীদাস (১৫ [illegible])

দণ্ডক [illegible] দুটি চরিত্রের কেবলমাত্র সংলাপ [illegible] কবির অস্থির বিবৃতি সহ দুটি চরিত্রের দ্বিবালাপ।

৪। বিচিত্র লগনী দণ্ডক [illegible] নাটকীয়তা অর্থাৎ [illegible] যাকে বলে action বা নাট্যক্রিয়া [illegible] যে পদে এই তিনটি ব্যাপার একত্র ঘটে তাকে বলা হয়েছে বিচিত্র লগনী দণ্ডক। [illegible] শেষ পদটি যেমন

রাধা— কাহ্নাঞি তোর কথা শুনী বড়ায়ির মুখে

কহিতেই না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ।
তোহ্মার বিরহে মোঁ হইলোঁ বেআকুলী
তেঁ কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী
কৃষ্ণ — রাধা বিরহে আকুলী হৈলোঁ আপনার দোষে।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে।।
আহ্মার খাঁয়ার যবেঁ না করহ তোষে
তবেঁ কি বিরহ দুখ তোক দিএ আহ্মে।।
রাধা — কাহ্নাঞি যে কারণে খাঁয়ার তোহ্মার মোএঁ কৈলোঁ
সে কারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ।
আর কাড়ো চঞ্চল না করিহ মনে।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে।।
কৃষ্ণ — তোর প্রতি মোর মনে নাহিঁ কিছু রোষ
এহা হতু কহিঁ জানী সহ মোর বাঁশ
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ।
সহরঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ

এইভাবে রাধা কৃষ্ণের সংলাপ চলছে। কেবল মাত্র যদি চরিত্র দুটির সংলাপে পদটি সমাপ্ত হত তাহলে এটি হত 'লগনী' কিন্তু পদের শেষকালে আছে কবির বিবৃতি—

হেন মতে বাঁশী পাআঁ হরষিত মনে।
কাহ্নাঞি নই হৈল হৈতেঁ ঘর থেকা কাহ্নে
পাছে রাধিকা সখী বড়ায়ি গেলী ঘর।
কহিল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর। (৩৪৯)

এই শেষ চার পংক্তি নাট্যসংলাপের শেষে কবির বিবৃতি। এই কারণে এটি 'লগনী' না হয়ে হল লগনী দণ্ডকের পদ। আর বিচিত্র লগনী দণ্ডক বলা হল কেন পদটিকে? কারণ সংলাপের মধ্যে যখন কৃষ্ণ রাধার কাছে বাঁশী প্রার্থনা করলেন তখন এক সময় ঘড়ার ভিতর থেকে লুকোনো বাঁশীটা বের করে কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে গিয়ে রাধা বললেন—

হেন ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী।

এই যে নাট্যক্রিয়া বা action বাক্যের দিয়ে বর্ণনা হল সেজন্য এই পদটি আর 'লগনী দণ্ডক' না হয়ে 'বিচিত্র লগনী দণ্ডক' হয়ে উঠল। নাট্যক্রিয়া সংলাপ আর কবির বিবৃতি একসঙ্গে থাকার ফলে কবি পদটির পরিচয় দিলেন 'বিচিত্র লগনী দণ্ডক' বলে।

৫। লগনী চিত্রক — শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো পদে যদি দুটি চরিত্রের সংলাপ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় নাট্যক্রিয়া বা action তাহলে কবি সেই পদটিকে বিশেষিত করেছেন 'লগনী চিত্রক' সংজ্ঞাতে। যথা বংশীখণ্ডের একটি পদ (৩৪৫) যেখানে বড়ায়ি বংশী প্রার্থনা করে রাধার কাছে কৃষ্ণকে হাতছাড়া করতে বলেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তা করতে চাইছেন না,

এই নিয়ে বড়ায়ির সঙ্গে কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি বা কথা কাটাকাটির পরে অবশেষে কৃষ্ণ হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। বড়ায়ি ও কৃষ্ণের সংলাপের শেষে কৃষ্ণের হাতজোড় করে দাঁড়ানোর এই নাট্যক্রিয়ার জন্য পদটি কবির পরিভাষায় হয়ে দাঁড়ালো 'লগনী চিত্রক'।

৬। **প্রকীর্ণ লগনী**—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পদগুলিতে নাট্যসংলাপের আদিতে মধ্যে ও অন্তে থাকে কবির বিবৃতি সেই সব প্রকীর্ণ উক্তি সম্বলিত নাট্যসংলাপাত্মক পদগুলিতে বলা হয়েছে প্রকীর্ণ লগনী। এ যেন পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনের মাঝে কবির বিক্ষিপ্ত মন্তব্য বা নির্দেশ। যেমন ধরা যাক তাম্বুল খণ্ডে বড়ায়ি রাধার কথোপকথনের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে কবির বিবৃতি—

পদের আদিতে—

কবি— কথা খানি শুনি কহিল বড়ায়ি রসিআ রাধার পাশে
কর্পূর, তাম্বুল দিআ রাধাক বিমুখ বদনে হাসে। ল বড়ায়ি

রাধা — কহিব কর্পূর তাম্বুল বড়ায়ি কহিব নেত্র পাটাব
নেআলী মাইলী আওর নানা ফুল দে দিআ পাঠাইল। আর ল বড়ায়ি

বড়ায়ি আইস রাধা কহা তোহারে কৃষ্ণের পাঠ আবলা
বিরহ জ্বরে তোহ্ন ভাবিলা পাঠাইলা তোহ্নে বেথা

পদের মধ্যে—

কবি এ বোল সুনিআ নাগরী রাধা হাথে এ সকল গাএ।
মাই নানা ফুল পান কর্পূর সব পেলাইল পাএ।।
উঠিআ বড়ায়ি রাধাক বুইল—

বড়ায়ি— হেন কাম না করিএ।
নাগের বন্ধন ভুবন বন্ধন তোহ্ন দরশান ভাঁএ।।

রাধা ঘরের সামী মোর সঙ্গাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গাক রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।।

পদের অন্তে—

বড়ায়ি যে দেব মরণে পাপ বিমোচান দেখিল হএ মুকতী।
যে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী

রাধা— ধিক জাউ নারীর জীবন দহ পসু তার পতী
পন পুরুষের নেহাএ যাহার বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী

কবি নাগর শেখর নান্দের সুন্দর উপখিল মতিমোরে
নামগ্রী চরণ শি(রে) বন্দিআ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। (২২)

৭। **প্রকীর্ণ লগনী দণ্ডক** এই জাতীয় পদে আছে একাধিক চরিত্রের সংলাপের পাশাপাশি মাঝে মাঝে কবির ঘটনা বিবৃতিসহ মন্তব্য। এখানে আদ্যন্ত বিবৃতির প্রাধান্য

এবং কবির [illegible] কাহিনী [illegible] যেমন রাধাবিরহের একটি পদ

কবি— বড়ায়িকে তবে বুইল রাধা

রাধা— কি পুছহ মোরে বুধী।

[illegible] ল বড়ায়ি

কবি— [illegible] বুইল [illegible]

বড়ায়ি— [illegible] ল রাধা

কবি— [illegible] না পাইয়া [illegible]

[illegible] ল রাধা

(নারদের প্রবেশ)

কবি— [illegible] হাথে

রাধা— [illegible] ল মুনী

[illegible]

কবি— [illegible]

[illegible]

নারদ বুইল

নারদ— [illegible]

[illegible]

কবি— [illegible]

[illegible]

[illegible] পাইল [illegible]

[illegible] চরণে

[illegible] মাঝে [illegible] চরণে

রাধা— [illegible] না চাল [illegible] চরণে

বড়ায়ি— [illegible]

[illegible]

রাধা— [illegible] চরণে।

[illegible]

কবি— [illegible] পাশে

[illegible] চরণ [illegible] চণ্ডীদাসে (৩৯৬)

৮। প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী দণ্ডক

এই জাতীয় পদে একদিকে থাকে নাটকীয় উপাদান বা action অন্যদিকে মাঝে মাঝে

কবির বিবৃতিসহ চরিত্রদ্বয়ের সংলাপ

যেমন— রাধাবিরহের ১৭২ নং পদটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য।

বড়ায়ি — শুন নাগিনী রাধা আহ্মার উত্তর
বাঁশী লইয়া লুকাইতে গেলাম্ভি গদাধর।
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথা গিয়া চাহী তাক কিছু নাহি ডর।

রাধা — মুখাই বড়ায়ি তোহ্মে নাহি কিছু বুলি
হাথে হাথে ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী।।
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।
তথা আলসি পাইব নান্দের নন্দন।।

কবির বিবৃতি— রাধার বচনে বড়ায়ি চলী বৃন্দাবন
তথা হেন রাধিকারে বুইল বচন।

বড়ায়ি— আত্ত জাত্তা রাধা কাহ্ন চরিতের আপুনী
তবে সে মেলিব তোকে দেব চক্রপানী।।

কবির বিবৃতি— বড়ায়ির বচন শুনী উল্লসিত মতী
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।।
দেখিয়া গোপ্ত বর্ণিতেঁ বুলে বনমালী
মদনে মুকছা গলী রাধা চন্দ্রাবলী
মুখে জল দিঞা বড়ায়ি ততিখনে।
অপারেণ বর্ণিকারে করায়িল চেতনে।।
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইঞা চেতনে।
পাইল বড় চণ্ডীদাস রামলীগণে (২৬৮)

পদটি আরম্ভ হয়েছে কৃষ্ণের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বড়ায়ি ও রাধার সংলাপ দিয়ে কিন্তু শেষকালে কবির বিস্তৃত ঘটনা বিবরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বনমালীকে বনের ভিতর দেখতে পেয়ে রাধার মূর্চ্ছা এবং বড়ায়ির জলসিঞ্চনে মূর্চ্ছাভঙ্গের নাটকীয় উদ্যোগ। এই কারণে পদটি প্রকীর্ণক চিত্রক লগনী দণ্ডক অর্থাৎ সংলাপসহ কবির বিবরণে নাট্যোদ্যোগময় ঘটনাবিবৃতি।

৯। **কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী**: বিবৃতিমূলক সংলাপাত্মক গানে আবেগময় নাট্যক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে হবে কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী। অর্থাৎ কাব্যময় বিবৃতিমূলক সংলাপ।

যথা— রাধাবিরহে রাধার বিরহকথা উত্থাপন করে গতকৃষ্ণ কৃষ্ণের প্রতি বড়ায়ি

কবি — কাহ্নাঞিক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।

বড়ায়ি— চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।
লুনী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপূন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে
বিলম্ব না কর সুন সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।।

কবির বিবৃতি —বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই
হাথে ধরিআঁ কাকুটী কইল বড়ায়ি
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।

বড়ায়ি —রাধাক তোরহ বোল পাঞ্চহ কাহ্নাঞি।।

কবির বিবৃতি চিন্তের ইঙ্গিতে বড়ায়ির কথা শুনী
ঈষত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।।

কৃষ্ণ— বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী
পাছে অন্তী বৈসু তোহ্মা মধুরস বাণী।

কবির বিবৃতি কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।।
রাধার কপেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। (৩৯৯)

এই পদে আছে বড়ায়ি ও কৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি তাই লগনী, কিন্তু মাঝে মাঝে আছে কবির বিবৃতি। বিবরণ বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের প্রতি বড়ায়ি-এর আবেগময় আদর সংলাপের মধ্যে এই আবেগময় নাট্যক্রিয়া বর্ণিত হওয়ার দরুণ এই পদ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী।

এইভাবে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নানা ঢঙের পদ আছে। কখনও একজনের ভাষণ (দণ্ডক) কখনও দুজনের সম্ভাষণ (লগনী), কোথাও কবির বিবরণ (প্রকীর্ণক), কোথাও বা নাট্যক্রিয়া (চিত্রক) এবং কখনও বা আবেগ (কাব্যোক্তি) —এইসব অভিনয় বা নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষা সম্বলিত নাট্যসঙ্কেত যুক্ত থাকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিছক কাব্য না হয়ে, হয়ে উঠেছে নাট্যরীতিতে পরিবেশিত সেকালের নাটগীত।

আধুনিক পাঠক ও বৈষ্ণব পদাবলী, আধুনিক কবি ও বৈষ্ণব পদাবলী

সত্যবতী গিরি

জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে যাদবেন্দ্র দাস পর্যন্ত আদি আর মধ্যযুগের কবিদের বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদনে তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কাব্যরস উপভোগ করার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু একজন আধুনিক পাঠক কোনো কবিতা গল্প অথবা উপন্যাস পড়তে বসে কি কেবলমাত্র তার বর্ণনার সৌন্দর্যে নিজেকে মোহিত করে নিজস্ব আস্বাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন? দেশকালের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যকে রাখতেই হয়। এমনকি সাহিত্য বিচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য ঘটে যায়। তাই একজন আধুনিক সচেতন পাঠক হিসেবে বলতেই হয় যে বৈষ্ণব পদাবলীকে তত্ত্বনিরপেক্ষ যথার্থ কাব্যপাঠ হয় না। কারণ গড়ে ওঠা তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে বৈষ্ণব কবিতাকে ফেলে দেখলেই তার গুণপ্রশ্নিকতাকে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসকে ধরা যায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিরা মাঝে মাঝে এমন এক একটি কবিতা আস্বাদের উপহার দেন যেগুলিকে আমরা কোনোমতেই তত্ত্বের খাঁচায় আটকে রাখতে পারি না। তেমনি কিছু কবিতা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত বলরাম দাসের বাৎসল্যের পদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পঞ্চরসাশ্রিত কৃষ্ণ উপাসনায় বাৎসল্য রস একটি গুরুত্বপূর্ণ আলম্বন। আর বলরাম দাস বাৎসল্য রসের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলিতে কৃষ্ণ উপাসনার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু বাঙালি পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক স্নেহময় প্রাত্যহিকতার উপর এর প্রতিষ্ঠা। তাই এর মাধুর্য এবং স্নিগ্ধতার যে সৌন্দর্য তা অভ্যাসের তুচ্ছতায় আকীর্ণ। বলরাম দাসের মতো কবিরা সেই তুচ্ছতা থেকেই আহরণ করেছেন বাস্তবের ছবি।

বাঙালি বলরাম দাসের বাৎসল্যরসের পদে আঁকা জননী যশোমতী একান্ত ভাবেই এক বাঙালি মা। স্বামী সন্তান স্বজন পরিজনে ঘেরা তাঁর একান্ত মমতায় গড়া সংসারের সীমানাতেই তাঁর প্রাত্যহিক দিনযাপন, তিনি সীমাবদ্ধের ইন্দ্রাণী। এর বাইরে কোনো বড় আদর্শ, কোনো মহৎ ভাব সন্তানের কোনো মহৎ কীর্তির উজ্জ্বলতা তাঁকে স্পর্শ করে না। তাই সন্তানকে বাইরে যেতে না দিয়ে উপায় নেই জেনেও তিনি তাকে স্নেহাঞ্চল ছায়ায় ঘিরে রাখতে চান। অথচ মহাকাব্যের বাল্মীকির আঁকা জননী সুমিত্রা সপত্নী পুত্র রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে ইচ্ছুক একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণকে বাধা তো দেনই নি, বরং বলেছিলেন— 'এষ লোকে সতাং ধর্মো যদ্ভ্রাতৃবশগো ভবেৎ। এখানেই শেষ নয়, তারপরেও—'সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তাম্।' সুমিত্রা বারবার লক্ষ্মণকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে বনে যেতে বললেন। অন্যদিকে মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও আমরা অলর্কজননী মদালসাকে

[illegible] মাতৃমূর্তি

[illegible]

[illegible] কেমন জানি করে'।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অর্থাৎ [illegible]

[illegible]

কবিতা হিসেবে [illegible] কবিতার সঙ্গে [illegible] কবিতাটিকে সংগতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

গোবিন্দ দাসের [illegible] পদের [illegible] পাওয়া যায়, যেখানে একটি পদে [illegible] কৃষ্ণের কাছে করুণা প্রার্থী। তিনি কৃষ্ণকে আরো বলেন—

তুঁহু যদি কাথ গোপী সঙ্গে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সে সুখে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল আধ না ভাবিয়ে মন্দ।।

[illegible] পদে [illegible] কৃষ্ণকে [illegible] করে [illegible] কবিতার [illegible]

যদি তব [illegible] ভুলেবারে যদি তব [illegible] নাহি তুমি
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও

[illegible] মনে হয় [illegible] কবিতার [illegible] কিন্তু [illegible] প্রকাশ করেছে [illegible] প্রকাশ করেছে [illegible] সুখ প্রকাশ [illegible] কিন্তু [illegible] বাঙালি সমাজের [illegible] থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়।

[illegible] নবীনচন্দ্রকে [illegible] ভাবসম্পদ ও রূপ সম্পদ [illegible] মাত্র কবিতা কল্পনা [illegible] কবিতার [illegible] ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য সমসাময়িক কবি [illegible] একটি পদ থেকে পাওয়া, [illegible] কৃষ্ণও [illegible] যেন আর না যান, [illegible] কৃষ্ণের [illegible] দেখা মধ্যাহ্নের খরসূর্যতাপে ঘর্মাক্ত রাধার চিত্রটি অঙ্কন [illegible]

রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভারে আউলাইল কবরী।

মনে হয় শ্রমক্লান্ত রাধা আর ব্যথিত কৃষ্ণের মমতাকাতর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারেই জীবন্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা কাব্যগ্রন্থের অপ্সরিনী কবিতায়

এর প্রভাব পড়েছে। পসারিণীকে সম্বোধন করে কবিও কৃষ্ণের মতই বলেন—এতভার মরি মরি কেমনে বয়েছ ধনি! কোমল করুণ ক্লান্ত কায়। বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন

মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।

আর রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে বলেন—

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে
কিসের দুরাশায়।

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

এ ভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

মধ্য দিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথ উড়ে তপ্ত বালি

বংশীবদনের কৃষ্ণ রাধাকে বলেন—

শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার কোলে
সকলি কিনিয়া লব আমি।

কৃষ্ণের করুণরঙীন কোমলমধুর প্রেম এইভাবে আধুনিক যুগের কবির কাব্যকেও স্পর্শ করেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের মতো বৈষ্ণব পদাবলীর নির্যাস নানাভাবে সুরভিত করেছে আধুনিক কবিদেরও। আসলে অনিবার্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে *T S Eliot* যথার্থভাবেই আমাদের জানিয়েছেন –

No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone. (Tradition and Individual Talent).

অনেক সময় বৈষ্ণব পদাবলী নয়—তার নায়ক কৃষ্ণের পৌরাণিক ইমেজও উঠে এসেছে আধুনিক কবিদের কবিতায়। এক্ষেত্রে হয়তো মিথের শিকড় সেখানে গভীরে যায়নি কিন্তু তার আর্কিটাইপকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। একই মিথ বিভিন্ন শিল্পীর হাতে পরিবেশিত হয়ে থাকে ভিন্ন ভাবে। বৈষ্ণব পদাবলী তথা কৃষ্ণকথার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আর সেই কারণেই বিষ্ণু দে'র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'সন্ধ্যা রাত্রি ভোর' কবিতায় 'ছোট্টো ছোট্টো মেঘ' হাজার ধ্বনী স্থির তারা 'কার বাঁশি শোনে'।

এই একই কবিতায় বলরামপুরের জঙ্গলে রুঢ় কঠিন পাহাড়ের ওপরের আকাশে গতিশীল মেঘ দেখে কবির মনে হয়—

আর ছোটে দক্ষিণে জঙ্গল অন্ধ ও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা
অসহায় গোপিনীর মতো ছোটে পাণ্ডুর মেঘেরা

ভাগবতের ভাগবত প্রচারিত রাসলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে পুরোপুরি নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিয়ে কবি বলেন—

যেন কোনো লঙ্গরের খাওয়ার সন্ধানে
কলকাতার পথে পথে অনাহারী ভিড়
ভিখারী স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
কিংবা কোনো কাঁদুনে বোমায় ডালহৌসির ক্ষেরাবি জনতা।

এক্ষেত্রে ক্লাদ লেভি স্ত্রোস পুরাণের নব রূপায়ণের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা উদ্ধৃত করতে পারি—

'mythology would be held to be reflection of the social structure and of social relations. And observation contradicts the hypotheses they will immediately suggest that the proper object of mytho is to offer a derivator to real but compressed sentiments.

আসলে পুরোনো ক্লাসিককে নতুনভাবে ব্যবহার করা যেন অনেক বহুসময় — অনেক অচেনা অন্ধকার থেকে কিছুটা সংশয় আর কিছুটা অপরিচয়ের সংকোচ ঠেলে সরিয়ে তুলে আনা স্বয়ংপ্রভ মণির প্রেমে ধন্য হয়ে যাওয়া।

বৈষ্ণব পদাবলীতে একদিকে আছে এক কলরব কিশোর তার প্রেমে পাগল অসংখ্য যুবতী তাদের ফেলে চলে যাওয়া — কারুরই ফিরে না আসার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা

আবার অন্যদিকে রাধার সর্বস্বত্যাগী একনিষ্ঠতার বিপরীতে তাঁর অবিশ্বস্ততা আর আপাত বহুচারিতাও কৃষ্ণ সম্পৃক্ত আধ্যাত্মিকতার আবরণকে সরিয়ে এক কৌতুকতরল লঘুতায় লিপ্ত করেছে তাঁর চরিত্রকে— প্রসাদ ছবচন যার অবর্ণনীয় প্রকাশ

আধুনিক কবিরা তাঁদের নিজস্ব জীবন ভাবনা আর জীবন ভাষ্যের সংস্পর্শে এই পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় কাব্য নায়ক চরিত্রকে নতুন ভাষ্যমন্ডলে দেন। বিষ্ণুদের অনেক পরবর্তী কবির লেখা কবিতায় আমরা খুঁজে দেখতে পারি কৃষ্ণের নতুন নির্মিতিকে।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জয় গোস্বামীর 'অন্ধ যদি আমাকে জিজ্ঞাস করে' কাব্য গ্রন্থটি এরই একটি খুব পরিচিত মুখ মুখ ফেরা কবিতা— 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'। জয় গোস্বামীর কবিতায় কালো নিম্নবিত্ত বাঙালি মেয়েরা বারবার আসে। তারা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মেজাজ' কবিতার নায়িকার মতো স্বামীর গোপন চুম্বনে অভিষিক্ত হয়ে ভাবী সন্তানদের নাম 'আফ্রিকা' রাখার স্বপ্ন দেখতে পারে না। তাদের জীবনে প্রেম আসে প্রতারণাময় ইন্দ্রজালের ক্ষণিক বর্ণাঢ্যতায়। তাদের জীবনের পরবর্তী অন্ধকার এত সান্ত্বনাহীন। নিম্নবিত্ত জীবনের সেই অন্ধকারে বসে কেননা লোমহর্ষন ও এক স্বপ্ন বিলাসমাত্র। 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' সেই দিশাহীন নিরাশ অন্ধকারে ঘেরা বাস্তবের কবিতা। কবিতায় যে মেয়েটি তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলে তার কোনো নাম নেই

তার প্রেমিকের নাম বেণীমাধব কৃষ্ণের একটি পরিচিত প্রতিনাম। গোটা কবিতায় [illegible] কৃষ্ণের ইমেজ একবারই এসেছে যখন—

বেণীমাধব, মোহন বাঁশী তমাল তরু মূলে
বাজিয়েছিলে

বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুর শুনে [illegible] সব ছেড়ে উদভ্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেণীমাধবের মোহন বাঁশীর [illegible] এক কালো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কল্পনায়। কৃষ্ণ নয় আধুনিক মানুষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণের সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেণীমাধবের [illegible]

সুন্দরী হওয়ার আশায় ভাসাইয়া—
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
তেমতি হউক সে।

[illegible] বেণীমাধবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেমন হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মেয়েদের [illegible] [illegible] কিছু উত্তরণের পাশাপাশি [illegible] [illegible] ছবি এই কবিতা। তাই [illegible] নামে 'আধুনিকা' কবিতা লিখলেন; সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য অবহেলিত ফুল, তাদের [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু তারা কেউ রাধা হয়ে উঠতে পারে না। এই কবিতার বেণীমাধব কৃষ্ণ আজকের প্রজন্মের অনিশ্চিত প্রেমের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী বাংলা কবিতাটি কিন্তু কৃষ্ণেরই কবিতা। গোটা কবিতায় চূড়ান্ত অ্যান্টিরোমান্টিক বিদ্রূপ আর প্রেম কবিতা পাঠকদের মনের নিজস্ব সুন্দর কৃষ্ণ মিথ কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আবারও জয়ের কবিতায় আসে পাড়ায় পাড়ায় কালো মেয়ের কথা। তাঁর কলম যদি ছন্দ হত তবে ছন্দ [illegible] কৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করতেন কালো মেয়েদের গতি করে দেওয়ার জন্য—

তুই কিছু ব্যবস্থা কর, বনপক্ষ এত চাইছি পেরে উঠবো না,
আজ কিংবা কাল

[illegible]

[illegible]

[illegible] **প্রতিদ্বন্দ্বী সুদামা-র লাশ ফেলে দেওয়া।**

[illegible]

[illegible]

মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ঃ মধ্যযুগের কবিদের চোখে

সনৎকুমার নস্কর

সাহিত্যের সার্থকতা কি শুধু সমীক্ষক ও পাঠক নিরপেক্ষ তবে কি স্বতন্ত্র মূল্য আছে? উপভোক্তাবাদের দিক থেকে বিচার করলে এ দুটি প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরই মিলবে কেননা ঐ মতবাদ বলে সাহিত্যের চূড়ান্ত সার্থকতা নিছক কবি যথার্থ উপভোক্তা বস উপচিত হয় সহৃদয় হৃদয় সংবাদী ভাবুক পাঠকের মনে। ফলে যোগ্য উপভোক্তা প্রস্তুত করাও লেখকের দায়বদ্ধ ব্যাপার। কোনও এই কারণেই পরিবেশের অনেক সার্থক লেখকের সাহিত্য যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সেই সব সার্থক লেখকের ভাগ্যে দুর্নাম ও গ্লানি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। আমার আলোচ্য কবি তাঁর সমকালের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ছিলেন যে অনবদ্য প্রকাশের কাজে তাঁর সৃষ্টি সমর্থিত হয়নি। আমরা কবিদের এই দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করে কয়েকটি কবিতা নিবেদন করছি। শুধুমাত্র রসসা নিবেদন নিবেদন না লিখ মা লিখ, মা লিখ

প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্যবিচার কর্মে ছন্দ ছিল অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুগ আলোচনার। রস রীতি ধ্বনি অলঙ্কার ঔচিত্য ইত্যাদির মধ্যেই কবি কর্ম তাই কাব্যপ্রকৃতি বা কাব্যরূপ নামকরণ কালবিচারের উপরও কেউ কেউ ছিলেন সাহিত্যের দ্রষ্টা। মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি কবিরা নিজেদের প্রকৃতি শ্লোক পাঁচালী ভাষাকাব্য অনুবাদ সাহিত্য আর কিছু কলম নিঃসৃত হতো সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস দ্বারা। স্বাধীন পাঠক গোষ্ঠীর জন্ম হয়নি দূর অস্তু। ফলে রাজসভা আর দেবমন্দিরের দিকে তাকিয়েই কবিদের প্রহর গুনতে হয়েছে। মধ্যযুগের অনেক বাঙালি কবির জীবনেতিহাস চোখ বোলালে দেখা যাবে পৃষ্ঠপোষক রাজা সম্রাট কিংবা প্রভাবশালী জমিদারদের তো বটেই এমনকি পদস্থ কর্মচারীরাও কবিদের লেখনী ভূলুণ্ঠিত বলগা টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মস্থানে ধর্মের আর অভিজাত রাজসভায় অভিজাতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের কবিরা পুতুল পরিণত হননি বাংলা সাহিত্যের স্বাধীনতা বিলিয়ে দিয়েছিল। সেই মানসিকতার চিহ্ন পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য আর প্রণয় কাব্যের খাতায় পাওয়া। অবশ্য এই দুই প্রতিষ্ঠানকেও এক শ্রেণীর সমালোচক বাদ গণ্য করতে হবে, অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করতে হবে তাদের কাব্যপ্রাণ নিয়ন্ত্রণের আংশিক ক্ষমতা।

কবি কর্তৃক কবিদের সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব একটা প্রাচীন নয়। মধ্যযুগ থেকেই এর সূচনা ধরা যেতে পারে এবং অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এগুলি ছড়িয়ে আছে। মুদ্রণযন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব না থাকায় সেকালে পুস্তকের ব্যাপক প্রচলন হতে পারেনি এবং এর ফলেই পূর্ববর্তীকালের ও সমকালের সাহিত্যচর্চার পরিচয়ও সকলের কাছে অবলিত

হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে 'সমালোচনা' নামক বস্তুটিরই তখন যথার্থ অভাব ছিল। স্বাধীন পাঠকের যে নিজস্ব মতামত দানের অধিকার থাকে—এটা জানতে পারা গেছে উনিশ শতকে পশ্চিমী শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে ওঠার পর। ধর্মমূলক সাহিত্যের প্রচার ছিল একেবারে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। ফলে সেখানে ব্যক্তিপাঠকের মতামতের তুলনায় সম্প্রদায়ের সামগ্রিক প্রতিবেদনটাই মুখ্য। বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি শাখা আছে যেখানে 'সমালোচনা মানেই পূজা'—এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সনাতন হল বৈষ্ণবজীবনী কাব্য। এর পিছনে যে কারণটি লুকিয়ে আছে সেটি সাহিত্যের রসবোধের তুলনায় মোহন্তকেন্দ্রিক সম্মাননা ও বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত। শুধু রীতি হিসেবেই নয়, হয়তো বা অনেকে সত্যসত্যই চরিত্র হননে সম্মান প্রদর্শনের নিষ্ঠা ও আনুগত্যের দ্বারা এবং সেক্ষেত্রে রসবিচার ব্যতিরেকেই কাব্যের গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে গেছে কেবল অগ্রবর্তী কবি বলেই। আবার এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। কখনো কবির, কখনো কাব্যের অথবা পাঠকের রুচিবোধের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে নিজস্ব শক্তির প্রতি আস্থা ও কাব্যসৃষ্টির প্রসঙ্গে দৈবী অনুকূল্যের কথাও বলা হয়েছে। যত বেশি আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে এসেছে সাহিত্য রচনার সময়ে আমাদের মনে হয় ততবেশি যুক্তিবাদের পথ গেছে খুলে। অবশ্য তার পিছনে কবির ভিন্ন ধরনের জীবনদর্শন থাকতে পারে এবং এই জীবনদর্শনের শিকড় আত্মগোপন করে থাকতে পারে জীবনের কোন তিক্ততর অভিজ্ঞতার অন্ধকারে।

অতএব সমালোচনার ধারাকে আমরা স্পষ্টত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি। যার একদিকে থাকছে স্তুতিকীর্তনের আড়ম্বর, অন্যদিকে শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা। সংগঠনমূলক আলোচনার প্রাণ হল পূর্ববর্তী কবির প্রতি নির্লজ্জ শ্রদ্ধাবোধ। আর বিরুদ্ধালোচনায় রয়েছে কোন কাব্যের ক্ষয়সাধক মূল্যায়ন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, অনুরূপ শ্রদ্ধানুরাগ কি কাব্যের প্রকৃত বিচারের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? সব সময়ে নাকি প্রশস্তিবচনের মাঝে মাঝে সত্যভাষণের দায়বদ্ধতাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই সব সমালোচকেরা? বিভিন্ন দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে এই দুই শ্রেণীরই নমুনা চোখে পড়বে। দেখা যাবে, কেবল রসবিচার নয়, কবির কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, কাব্যের মাঙ্গলিক ভূমিকা, বিচার ইত্যাদিও বিচার্য হয়ে উঠেছে অন্য কবির কাছে। কেউ শুধু উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কোথাও রয়েছে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য অগ্রজ বন্দনা। যেমন—মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য থেকে জানা গেছে চট্টগ্রামঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্তের কথা। কিংবা বিজয় গুপ্ত জানিয়ে দেন আদি মনসামঙ্গলকার কানা হরিদত্তের নাম। কবিকঙ্কণ তাঁর অবলম্বিত কাহিনীর উৎস স্বরূপ মাণিক দত্ত সম্পর্কে বিনয় প্রকাশ করে বলেন—'মাণিক দত্তের আদি কবিত্ব বিনয় যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।' আর এই শ্রদ্ধাপূর্ণ সৌজন্যের বিপরীত প্রান্তে কটু সমালোচনার সূত্রে অগ্রজ কবি কানা হরিদত্ত উল্লেখিত হন বিজয় গুপ্তের কলমে—'মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য/প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।' উল্লেখের এই ধারাটা খুবই গতানুগতিক এবং সচরাচর বৈশিষ্ট্যহীন। তবুও এইটুকু ভদ্রতায় পূর্বজদের প্রতি কবিদের মনের আনুকূল্য

[illegible] পণ্ডিত কিংবা সীতারাম দাসাদের কলমে।

[illegible]

[illegible] *Scott always preferred to be known as a landed gentleman rather than as an author* [illegible]

[illegible]

ভাবনাকে তুলে ধরেছিল। বৃন্দাবন শ্রী আচার্য নরহরি সরকারের সাধনপদ্ধতিকে হীনভাবে সমালোচনা করলেও নরহরির শিষ্য লোচনদাস বৃন্দাবনের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিত একচিত্ত / জগত পূর্ণিত যাঁর ভাগবতগীত। আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস রচিত গ্রন্থটির মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেন নিম্নোক্ত পংক্তি কটিতে—

'বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।।
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।'

এ ধরনেরই গ্রন্থমহিমা ব্যক্ত হয়েছে লোচনদাস বিরচিত চৈতন্য পূর্বাবতারের সম্পর্কে রচিত শিষ্য বলে পরিচিত সিদ্ধ মুকুন্দদাস বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় কবিকাব্যকে 'ত্রিভুবনে অতুলনীয়' বলে গণ্য করেছেন। আর বলেছেন – 'নিত্য পরিপূর্ণ তা তাহে পূর্ণ শুনি।' এই অভিমতের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন নরহরি চক্রবর্তী। এছাড়া উদ্ধব দাস পুরাণসা কবিকে কৃষ্ণদাসের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অনুরূপ সাধিত্ব বলেছেন। বলরাম দাস বাড়ুরীর প্রাচীন কবি বলে পরিচিত। তাঁর ভাষা ছন্দ কবিত্ব একবাক্যে প্রশংসা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাধু অনুভূতির বিশেষ প্রকাশ তাঁর গ্রন্থমধ্যে সরলা। কবিরাজ দাস তাই বলেন। সরল তরল বাক্য পাষাণ প্রসাদ। যেখানে তাঁর সেই পাষণ কাল সেই কালের প্রাণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্য সম্পর্কেও একই উচ্চাঙ্গ পাণ্ডিত্য বাক্যবিন্যাস। সদাশিবের বাক্য অমৃতের তুল্য প্রবণমাত্র প্রাণ যায় গলি। এমনতরো মানুষ প্রশংসা হীনতা বোধের সহজ পরিচয় সমুদ্রে।

তুলনায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতিবাদী সমালোচকের দৃষ্টান্ত বেশ বিরল। এ জাতীয় বিরুদ্ধ চিন্তার সৃষ্টিকারণ হতে পারে ব্যক্তিস্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বার্থবোধ। মধ্যযুগ ধর্মসংঘাত ছিল, কিন্তু তাকে কেউ গ্রন্থসমালোচনায় লালন করার মতো উপকরণ বলে ভাবতে পারেননি। অন্যদিকে ছাড়ের বৈচিত্র্য বৈষম্যের সক্ষমতা কাব্যকারের নব প্রকরণ যেগুলি ব্যক্তি মানুষকে নতুন ভাবনায় উদ্বেলিত ও সৃষ্টির জগতে স্বতন্ত্র করে তোলে তেমন বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও কোন কোন কবির লেখায় পরস্পরের নিয়ে ব্যঙ্গ শোনা গেছে, দেখা গেছে নিছক সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধ কটুবাক্য বর্ষণও। আবার কোথাও আত্মবঞ্চনার গৌরবকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার প্রয়াস রয়েছে এবং এ নিয়ে সাহায্য করেছে সেকালের ধর্মভীরু মানুষের ধর্মভীতি। কোন কোন কবি যুগের চাহিদা অসম ও প্রাণপ্রবাহের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের মধ্যে কিছুটা এবং কৃষ্ণরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে পুরোপুরিই এই বোধ পরিণত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। অনুমান যে যতই মধ্যযুগের নিশাঙ্ককাল অপসৃত হচ্ছিল ততই মানুষের মন আধুনিক, যুক্তিবাদী, কৌশলী ও ধর্মবিষয়ে সংশয়ী হয়ে উঠছিল। হয়তো এই কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় শেষ দিকে বেশি পরিমাণ প্রতিবাদী

সমালোচনার সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি। এইসব কবিরা যে যুগমানসিকতায় বিচরণ করেছিলেন তার নিরিখে পূর্বকার সাহিত্য-ভাবনা যে কতটা অলৌকিকতামণ্ডিত, প্রথানুগ ও কার্যকারণহীন তা সেদিনও তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কমবেশি ধরা পড়ে গিয়েছিল। এ কারণেই এ ধরনের সমালোচনা কেবল সাহিত্যের নান্দনিক তুলামূল্যেরই বিচার নয়, একই সঙ্গে কবির জীবনবোধ ও কালের প্রকৃতি বোধেরও পরিমানক।

তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে যাঁরা কাব্য সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা সবাই আধুনিক কালের কবি মানসের অধিকারী। কিংবা তাঁরা মধ্যযুগের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কাব্যজগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কালগত বিচারে তাঁরাও কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টা। আবার ভাবের দিক থেকেও তাই। কেননা যে কাব্যরীতির ও জীবন ভাবনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁরা, তার থেকে বেশি দূরে সরেও যেতে পারেননি। যেমন বিহারীলাল কাব্যে ইন্দ্রিয়সুখ কাব্যের সমালোচনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর কাব্যও সাধারণ মানবের কাব্যের সঙ্গে প্রতি তুলনায় কিছু খাটো। তেমনি অলৌকিকতার প্রসঙ্গ তুলে দামোদর যতি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলকে সমালোচনা করলেও তাঁর লেখাতে আমরা কম অবাস্তব কিছু পাই না। আবার কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কাব্যের সুপ্রচারের জন্য মাধবাচার্যের প্রথাকে শুধু চামড়াভরানো গীত বলে ব্যঙ্গ করলেন না। তাঁকে পাঠকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা দেবতাকেও কাজে লাগালেন কল্পনার অলৌকিক বাঘ তৈরি করে। এ সবই ছিল মধ্যযুগীয় সীমাবদ্ধ ভাবনার বৃত্তে কবিদের এদিকওদিক পরিভ্রমণ। তবুও এইসব সমালোচনার গুরুত্ব আছে, মূল্য আছে সাহিত্যের ইতিহাসের পালাবদলের অধ্যায়ের প্রাক্কালটি। কবিরা যে চলমান প্রবাহধারায় আত্মসত্তাকে পুরোপুরি সঁপে দেননি, অন্তরালের সচেতন প্রয়াস ছিল তাকাবার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। এগুলো তারই প্রমাণ। যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

আধুনিক যুগের অলৌকিকতা বিরোধী দৈবীপ্রভাবমুক্ত যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে যেমন আমরা আজকাল মধ্যযুগের কাব্যপ্রত্যয় ও প্রকরণ কৌশলকে অবাস্তব ও সত্যবর্জিত বলে ব্যাখ্যা করি, সেকালের অন্ততঃ দুজন কবিকে পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের মানসিকতাটি ছিল এই গোত্রের। একই পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে অথবা ঘটনার সত্যাসত্যে সন্দিহান হয়ে তাঁরা যে এই ধরনের কাব্যালোচনায় মত্ত হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। কবি রাধাকান্ত মিশ্রের তো স্পষ্ট অভিযোগ বহুচর্চিত সেই প্রথাটির প্রতি। কবি তাঁর যুগে যে 'আধুনিক' ছিলেন তারও প্রমাণ রেখেছেন পূর্ববর্তী রচনাকারদের 'প্রাচীন কবি' এই অভিধায় ভূষিত করে। প্রত্যাদেশ স্বপ্নাদেশ, বেশ পরিবর্তন করে দেবতার দিবালোকে বিচরণ, জিহ্বায় কবিতা লিখে কবির কবিত্ব প্রদান ইত্যাদি অতি পরিচিত ও নব ব্যবহৃত দেবতা বালহাসের ধরনকে কবি মৃদুভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তবে তিনিও যে ধর্মভাবনার বাইরে অবস্থান করছেন না তারও প্রমাণ রেখেছেন নীচের ছত্রগুলিতে। "যে পদ ধিয়ান করিয়া পান বিধাতা। মানব হৈয়া কেহ কহে হেন কথা, কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।" সমশ্রেণীর অভিযোগ উত্থাপিত হয় অষ্টাদশ শতকের কবি রামানন্দ যতির

কলমেও। অনেক শিষ্যের অনুরোধে তিনি চণ্ডীমঙ্গল লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন। খুব সম্ভব তাঁর কবিখ্যাতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল বহুল প্রচারিত ও ভূয়সী প্রশংসিত কবি মুকুন্দের চণ্ডীকাব্য। তাই তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দিতে চান মুকুন্দের স্বপ্নলব্ধ চণ্ডীমঙ্গলের কথা। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনায় ঝলসে উঠেছে তাঁর এই পংক্তিগুলি:

> "চণ্ডী যদি দেন সেবা/তবে কি তা যায় লেখা পাঁচালীর অমনি বচন,
> বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে সত্য বটে পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।
> এত দোষ উদ্ধারিতে/লোকের চৈতন্য দিতে/চণ্ডী কহে রামানন্দ যতি
> অনেকের উপরোধ/কেহ না করিহ ক্রোধ অনেক শিষ্যের অনুমতি

রামানন্দ নিজেকে 'কলিযুগে বুদ্ধ অবতার' বলে ঘোষণাও করেছেন। অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনূদিত রামায়ণে। যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে এই ধারণায় আসতে বাধ্য করেছিল যে, 'বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ।' — সেই প্রখর যুক্তিবাদ ও ভৌমদৃষ্টিই বোধহয় মুকুন্দের কাব্যের দোষ নির্ণয়ে তাঁকে প্রবোধিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, যেকালে আধুনিক সমালোচনা শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়নি, যেকালে কবি সমালোচকদের জীবনদৃষ্টি ছিল সীমিত পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ, বাংলা সাহিত্যের সেই প্রায়ান্ধকার যুগে যে এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া গেল, তা কাব্যালোচনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে কাব্যালোচনার যে আলোচনা আজকের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির একটি প্রধান নিদর্শনে পরিণত হয়েছে, মধ্যযুগের ক্ষেত্রে সেই বোধ কখনোই পাকা হয়ে ওঠেনি। বর্তমান কালে ইওরোপীয় কাব্যকলার অনেক প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসপ্রস্থানকে তেমন আর গুরুত্ব দিই না। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, সেকালের কবিরা সংস্কৃতানুসারী কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যা আজকের চোখে খানিকটা গতানুগতিক বলে মনে হতে পারে। তবুও আমরা স্বীকার করবো, সাহিত্যের ভালোমন্দ নিয়ে কোনো প্রাচীন কবির এইসব মামুলি প্রশ্নের গুরুত্ব, অনুধাবন করতে পারলে হব সেই প্রতিভা দৈন্যের দিনেও কীভাবে এক কবির কাব্যের জনপ্রিয়তাকে নস্যাৎ করে অপর কবির কাব্য উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠতো, অথবা যেমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন ধর্মকাব্যের ফাঁদে পড়া অনতি সচেতন ব্যক্তি-মানুষ। সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা সমাজ মানসের ক্রম পরিবর্তিত ভৌমদৃষ্টি কীভাবে সেদিনের আধুনিকতাকে বরণ করে নিচ্ছিল — সেটাও হয়ে ওঠে আজকের জিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধানের অন্যতম বিষয়।।

শতাব্দক্রমে বাংলা মঙ্গলকাব্যের গতি-প্রকৃতি

(উন্মেষ, বিকাশ, নবীনতা)

সুমঙ্গল রাণা

[illegible] অষ্টাদশ [illegible] ঘটনা [illegible] এই সময়ের [illegible] এই সময়ের সমস্যা [illegible] মঙ্গলকাব্যের [illegible] বিবর্তনের স্বরূপটুকুই একক্ষেত্রে আলোচ্য।

[illegible] মঙ্গলকাব্যের [illegible] প্রাচীনতম [illegible] ছিল [illegible] পুঁথি [illegible] ১৮৯৯ খ্রিঃ প্রকাশিত [illegible] বিশ্ব [illegible] বিশ্ব [illegible] বিশ্ব [illegible] না লিপিকরণ [illegible]

কবিকঙ্কণ [illegible] কবিকঙ্কণ [illegible] মুকুন্দরাম [illegible] মানিক দত্তের [illegible] মুকুন্দরাম মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

মানিক দত্তের কবিত্ব পরিহার।
বড় সর্বানন্দে কৈনু নমস্কার।। কবি-সং

[illegible] চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির একটি পাতাও [illegible] পাওয়া গেল [illegible] মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস [illegible] শোভনীয়। ময়ূরভট্টই নাকি ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি। ময়ূরভট্ট জনশ্রুতি। তাই তাঁকে জনশ্রুতিমূলক আদি কবি বলা হয়েছে। ময়ূর নাম বাঙ্গালার কখনও ছিল না, আজও নেই। তাহলে কে এই ময়ূর ভট্ট?

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রায় সব কবি [illegible] রচনা শুরু করেছেন।

ইনি কাদম্বরী খ্যাত বাণভট্টের পালক। সংস্কৃত ভাষায় সূর্য শতক কাব্যের রচয়িতা। ভগ্নিপতি বাণভট্টের অভিশাপে ময়ূর ভট্ট কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন এবং কাব্যের কৃচ্ছ্র সাধনায় সূর্যকে তুষ্ট করে ব্যাধিমুক্ত হয়ে সূর্যশতক রচনা করেন। এদিকে [illegible] দেবতা ধর্মঠাকুরও কিয়দংশে সূর্যদেবতা এবং কৃষ্ণরোগের নিবারণকারী। সম্ভবতঃ এই কারণে ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গলের কবিদের আদর্শস্থানীয়। [illegible] ময়ূরভট্ট যে বাংলায় ধর্মমঙ্গল কাব্য (যার নাম হাকন্দ পুরাণ) কখনও রচনা করেন নি সে বিষয়ে আজ আর কোনো সংশয় নেই। শূন্য পুরাণের ধর্মাদি পণ্ডিতের অবস্থাও [illegible] অনেকে মনে করেন এক মতো। থেকেও নেই কিংবা না থেকেও বিদ্যমান। [illegible] বলে সত্য। [illegible] দ্বাপরে নীলাই পণ্ডিত, শ্বেতাই পণ্ডিত, কাঁসাই পণ্ডিত এবং কলিযুগে ধর্মদাস পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট ছিল সিদ্ধান্ত একাদশ কিংবা চতুর্দশ শতক যাই হোক না কেন যাকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ বলা হয় একমাত্র কবির নাম ছাড়া সে সময়কার সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই নি। [illegible] কারণ মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজের যে স্তরে প্রচলিত ছিল লিখিত রূপ দিয়ে [illegible] তাদের ছিল না। সে সময় মঙ্গলকাব্য ছিল নিছক মৌখিক সাহিত্য। [illegible] তা বটেই।

পরবর্তী কালে রচিত অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। রামমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম খ্যাতিমান কবি কৃষ্ণরাম [illegible] আত্মকাহিনীতে উল্লেখ করেছেন

পূর্বেতে কবিল গীত মাধব আচার্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য।।

নানা কারণে মাধব আচার্যের গীত দক্ষিণরায়ের পছন্দ হয় নি। অগত্যা কৃষ্ণরামকে [illegible] রচনায় হাত দিতে হয়। এই মাধব আচার্যের কোনো পরিচয় এবং [illegible] কাব্যের কোনো পুঁথি পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ শতক থেকে মঙ্গলকাব্যের সৃজন যুগের সূচনা। এই সময়ে যে কবির কাব্যে মনসা মঙ্গল কাব্য কাহিনীর পরিবর্তিত ও পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় তিনি বিপ্রদাস পিপিলাই। ১৪১৭ শকাব্দে (১৪৯৪ খ্রিঃ) বিপ্রদাসের মনসা বিজয় রচিত।

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।

কবিবর্গ, গুরুজন ও পণ্ডিতদের কাছে যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করে বিপ্রদাস রচিল পয়ার গীত শাস্ত্র অনুসারে।

শাস্ত্র বলতে তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক পুরাণ। পুরাণই মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি ভূমি। কাব্যের দেবখণ্ডে নানা পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

বেদাশ্রিত সনাতন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে পুরাণ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য। খ্রিঃ দ্বাদশ শতকে বঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার বিশেষতঃ 'তুর্কানা' শক্তির অবাধ প্রয়োগে দেব মন্দির, দেববিগ্রহ ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ প্রভৃতির ফলে হিন্দুধর্ম পুনরায় বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে সমূহ বিলুপ্তির হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার জন্যই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়।

মঙ্গলকাব্যে কবিগণ যে ভাবে পুরাণ কাহিনীর বর্ণনা করেছেন তাকে স্বচ্ছন্দে পুরাণ সাহিত্যের মধ্যযুগীয় সংস্করণ বলা চলে। প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যেই কম বেশী সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর বর্ণনা আছে। 'যবে নাহি দিল মহী তার পূর্ব কথা কহি।' এই সৃষ্টিপত্তন বর্ণনায় ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। প্রায় প্রত্যেক মনসামঙ্গলে বিষোৎপত্তি প্রসঙ্গে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থন কাহিনীর বর্ণনা আছে, তবে চাঁদ সদাগর এবং ধন্বন্তরী যে সমুদ্রমন্থনজাত এ তথ্য পুরাণ সমর্থিত নয়। মঙ্গল কাব্যের কবিদের বর্ণনায় দেখা যায় সমুদ্র মন্থনে চাঁদ সদাগরের আবির্ভাব লগ্নেই দেবতারা তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করে মনসাকে অমান্য করার মন্ত্র দিলেন। ধন্বন্তরীকেও ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করে আধি ব্যাধি জর্জরিত মর্ত্যলোকে প্রেরণ করলেন। চাঁদ সদাগরও ধন্বন্তরীর ব্রহ্মজ্ঞান হরণ করার জন্য মনসামঙ্গলের কাহিনীতে নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দর যে পূর্বজন্মের উষা অনিরুদ্ধ এ তথ্য কিভাবে সমাহৃত জানিনা কিন্তু এই পালার বর্ণনায় মনসামঙ্গলের কবিরা শ্রীমদ ভাগবতের কাহিনী নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করেছেন।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের দেবখণ্ডে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী হর পার্বতীর পারিবারিক জীবন কাহিনী বেশ বিস্তৃত। শিবের সঙ্গে গঙ্গার বিবাহ, কোচনীর বেশে গৌরীর শিবকে ছলনা, শিবের ভিক্ষাটন প্রভৃতি কাহিনীতে পৌরাণিক শিবের রুদ্র ও কোমল রূপের চেয়ে লৌকিক ভিখারী শিবের গৃহস্থ রূপেরই প্রাধান্য। চণ্ডীর ক্ষেত্রেও বৈদিক অরণ্যানি, পৌরাণিক দুর্গা ও অনার্য সেবিতা চণ্ডীর মিশ্র রূপ। মনসা ও ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

বাংলা মঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুসরণের তারতম্য যেমন কাল অনুসারে তেমনি কবির প্রবণতা অনুযায়ীও বটে। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলির সঙ্গে পুরাণ কাহিনী যোগ যতটা নিবিড় অষ্টাদশ শতকের কাব্যগুলিতে ততটা নয়। যুগ্ম প্রয়োজনে অষ্টাদশ শতকে রচিত মঙ্গল কাব্যগুলি সংক্ষিপ্ত হলো। একজন কবি একাধিক কাব্য রচনা করতে লাগলেন। এবং কাব্যের বহিরঙ্গের প্রতি অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ায় অন্তর্গত ভাবের দীনতা বেশ অনুভব করা যায়।

নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দের তুলনায় পরবর্তী কালের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেবখণ্ডের পৌরাণিক অংশ সংক্ষিপ্ত। অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে বিষয়টি কেবলমাত্র সৃষ্টি পত্তন কাহিনীর বর্ণনায় এসে ঠেকেছে।

সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অন্নদায় পরিণত হয়েছেন। বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। মুকুন্দরাম সংস্কৃতজ্ঞ কবি ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত জ্ঞান সর্বজন বিদিত। কবি নিজেও বলেছেন—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।

ভারতচন্দ্র তাঁর পুরাণ জ্ঞান অন্নদামঙ্গল রচনায় প্রয়োগ করেছেন। একান্ন পীঠের বর্ণনায় মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ব্যাসের শিবনিন্দার কাহিনী স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত। কাশীর মাহাত্ম্য সূচক অংশ কাশীখণ্ড থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার অধিকাংশ মনসামঙ্গলের কবি কাব্যের নাম দিয়েছেন পদ্মাপুরাণ। পদ্মাপুরাণ নামটি অঞ্চল বিশেষে মনসামঙ্গল কাব্যের সাধারণ নাম।

পুরাণ অনুসরণের সূত্রে দেব-দেবী বন্দনার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হয়। দেবদেবী বন্দনা মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভিক অংশ। সংক্ষেপে হোক, বিস্তারিত হোক মঙ্গলকাব্যে দেবদেবী বন্দনা থাকবেই। একেবারে প্রথমে থাকে গণেশবন্দনা। বন্দনার প্রথমে গণেশকে শিরোধার্য করার ধর্মীয় কারণ যাই থাক মঙ্গল কাব্যের কবিরা গ্রন্থ রচনায় বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে মাঝপথে কাব্য রচনা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় সেই জন্যই এই প্রতিরোধক ব্যবহার করেছেন। গণেশ সিদ্ধি দান করেন, বিঘ্ন নাশ করেন। উপরন্তু প্রধান পঞ্চদেবতার মধ্যে প্রথম পূজিত হবার অধিকারী।

তারপরেই থাকে সরস্বতী বন্দনা। কারণ সরস্বতী সঙ্গীত ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মনসা মঙ্গলের কবিরা আরও একটি কারণে সরস্বতী বন্দনা করতে বাধ্য। দেব ভাবনায় আদিযুগে মনসা এবং সরস্বতী নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। দুই দেবীর পূজা তিথি অভিন্ন। মনসার নাগ পঞ্চমী, সরস্বতী শ্রীপঞ্চমী। সরস্বতী নৃত্যগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মনসাও নৃত্যগীত বাদ্য প্রিয়া। সরস্বতী ও মনসার পারিবারিক জীবন একইরকম। জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ দেবসমাজে নিয়ম রক্ষা মাত্র, তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। এদিকে সরস্বতীর সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক দেবসমাজে পরিজ্ঞাত। মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে বিষয়টি অজানা ছিল না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই—দেব নারায়ণ সঙ্গে বঞ্চিব তোমারে রঙ্গে

ঘনরামের কাব্যে সরস্বতী বন্দনার প্রথম ছত্র

কবিয়া প্রণতি স্তুতি বন্দি মাতা সরস্বতী
বিশ্বগতি বিষ্ণুর দুর্লভ।

চৈতন্য পরবর্তী কালের মঙ্গল কাব্যগুলিতে চৈতন্যবন্দনা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যবন্দনায় কবিদের মধ্যে ইতিহাস নিষ্ঠা ও ভক্তির সমন্বয় দেখি। আবার কোনো কোনো কবি চৈতন্যের অলৌকিক মহিমা প্রকাশের জন্য আজগুবি গল্প ফেঁদেছেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে এই রকম একটি গল্প রয়েছে—কাটোয়ার জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী

নীলকণ্ঠ তাঁহার কাপড়ের গুদামে আগুন লাগে। চৈতন্যদেবের নামে (দয়ায়) তাঁর অর্ধদগ্ধ বস্ত্রাদি বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল ভালো দামে। নীলকণ্ঠও চৈতন্যের নামে কাটোয়ায় একটি অতিথিশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন।

যাই হোক মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবদেবী বন্দনার ধরন ধারণ এক এক যুগে এক এক রকমের। পঞ্চদশ শতকে রচিত কাব্যগুলিতে দেব-বন্দনা সংক্ষিপ্ত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি মুকুন্দরামের কাব্যে সব চেয়ে বেশী traditional - দেবদেবী ছাড়াও দিগ্‌বন্দনা নামক একটি অতিরিক্ত তালিকা মুকুন্দরামের কাব্যে রয়েছে। দিগ্‌বন্দনা হলো স্থানীয় গ্রামদেবতা এবং গৃহ দেবদেবীর বন্দনা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গায়েনদের হাতে পড়ে এই তালিকা ক্রমশ বেড়ে গেছে।

সপ্তদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলির দিগ্‌বন্দনায় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সেখানে হিন্দু দেবদেবীর নাম তালিকায় মুসলমান পীর ফকির গাজীদের নামও যুক্ত করে দিয়েছেন। মুকুন্দরামের কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির চিত্র আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের গোঁড়ামিই তাকে এই কাজে বিরত করেছে। সপ্তদশ শতকে রচিত অন্যান্য কাব্যে পীর ইসমাইল গাজী গুচি খাঁ পীর বাহারাম পীরের নামও হিন্দু দেবদেবীর তালিকায় যুক্ত হয়ে গেছে অবলীলাক্রমে। বেশ বোঝা যায় হিন্দু মুসলমান বিভেদ বিদ্বেষ সমাজে তখন অনেকটাই প্রশমিত। মুসলমান পীর ফকিরেরাও তখন হিন্দুদের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়। দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর কাহিনী সেখানে পরমেশ্বর কৃষ্ণ পয়গম্বর রূপ ধরলেন—

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টানা
বনমালা ঝিলিমিলি তাতে।
ধবল অর্ধেক কথা অর্ধ নীলাম্বর প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হয়ে।।

সত্য পীরের সত্য নারায়ণ কবিতাটি আরও পরবর্তী কালের ঘটনা। অথচ পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কাব্যে আপন মহিমা প্রচারের জন্য মনসা হাসন হোসেনের পুরীতে প্রবেশ করে যে কাণ্ডটা বাধালেন মানুষের সম্বর্দ্ধিত তাকে সদুপায় বলা চলে না।

মনসার এই হিংস্রতা কালক্রমে মন্দীভূত হয়েছে। দেবভাবনার ক্ষেত্রেও মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কালানুক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তথাকথিত আদি কবি হরিদত্তের রচনায় মনসার রূপ বর্ণনা ভয়াবহ—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সুতলি।
শ্বেতনাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি।।
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মনি।

অমৃত নয়ান এড়ি দেবী বিষ নয়ানে চায়
চন্দ্রসূর্য গিয়া তার আড়ালে লুকায়।।

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার রাজবেশ ও রাজসভার বর্ণনা

নাগ আভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড।
কালি নাগিনী তার শিরে ধরে দণ্ড।।
দুই ভিতে নাগগণ ধরিল যোগান।
বাসুকি পাঠেন আছে শাস্ত্র পুরাণ।।

মনসার এই রূপ কালক্রমে অন্তর্হিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে রচিত জগজীবন ঘোষালের কাব্যে মনসার দুর্গম পাহাড়ের করুণ উদ্রেক করে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার যথারীতি বিবাহ হলো। জরৎকারুর শর্ত ছিল

স্বামের যদি গর্ভহিত বহিবেক কদাচিত
এড়িয়া পলাইব তবে।

জরৎকারু পদ্মাকে সঙ্গে নিয়ে নিভৃতে সমুদ্রতীরে বাস করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে পথশ্রান্ত জরৎকারু বৃক্ষতলে নিদ্রাভিভূত হলেন। এদিকে সন্ধ্যা বন্দনার কাল উত্তীর্ণ হয়। অগত্যা পদ্মা স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করলেন। অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গে ক্রুদ্ধ মুনি নির্জন জঙ্গলে পদ্মাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। স্বামী পরিত্যক্তা মনসা -

মাথে হাত দিয়া দেবী করএ রোদন।
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল কিসের কারণ।।

পদ্মা বনেই বাস করে। পাহাড়ের কোলে পাকে ফলমূল খায়। অতঃপর পদ্মার গর্ভে পুত্রের জন্ম হলো, নাম আস্তিক। এখন পুত্রকে নিয়ে পদ্মা লালন পালন করলেন। সে এক দুশ্চিন্তা। মনে বড়ই দুঃখ—

অন্যের ছাওয়াল হৈলে দুগ্ধ ভাতে খায়।
আমার ছাওয়াল নিলে শিমলা লাগোয়।

অগত্যা মনসা পুত্রক্রোড়ে রাখাল বালকদের কাছে পুত্রের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন।

চণ্ডী ও ধর্মঠাকুর কালক্রমে উদ্ভাবিত দেবতা দিয়ে অতি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছেন। অতঃপর চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে বিচ্ছেদ বিধুর পিতা মাতার কন্যারূপে। মাতা পত্নী কন্যা বধূদের এই ত্রিবিধ মঙ্গল সম্ভার করেছেন। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবী গণ কালক্রমে যেন ভয়ঙ্করী থেকে শুভঙ্করীতে পরিণত হয়েছেন। এর কারণ অবশ্যই চৈতন্যের আবির্ভাব এবং চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার।

ষোড়শ শতকে রচিত চৈতন্য ভাগবতে চণ্ডীপূজার উল্লেখ নেই কিন্তু মঙ্গল চণ্ডীর গীতের উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেব শ্রীবাস ভবনে উচ্চস্বরে নাম সংকীর্তন শুরু করলে জগাই মাধাই ভেবেছিল নিমাই পণ্ডিত বুঝি বা মঙ্গল চণ্ডীর গীত আরম্ভ করেছে। তাছাড়া চৈতন্য ভাগবতে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে' - ছড়াটি তো সকলের জানা। অন্যত্রে

মনসা পূজার উল্লেখ থাকলেও মনসামঙ্গল গানের উল্লেখ চৈতন্য ভাগবতে নেই। সে সময় নবদ্বীপে বিষহরির পূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল।

দত্তকবি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।

কিন্তু মনসা পূজা উপলক্ষে মনসামঙ্গলের গান গাওয়া হতো না। কাজেই মনসা মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল ধর্মমঙ্গলের গান দেবপূজায় আবশ্যিক উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হতো—ষোড়শ শতকের পরবর্তী কাল থেকে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদি 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি' হয়, কৃষ্ণকথামূলক কাব্য যদি কৃষ্ণমঙ্গল হয় তাহলে মঙ্গলকাব্যকে মনসা চণ্ডী ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথামূলক কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কেন? দেব মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই তো মঙ্গল গীত। কিন্তু মনসা মঙ্গল কাব্যে অন্ততঃ দেবী মনসা স্বপ্নে হোক স্বরূপে হোক কবিদের 'মঙ্গল গীত' রচনার জন্য বারংবার হুমকি দিয়েছেন। দৈবাদেশ তো অলঙ্ঘনীয়।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কাব্যের ধারা

কাননবিহারী গোস্বামী

।। প্রাক্‌কথন ।।

হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের অনুবাদ কাব্যগুলি একটি বিশিষ্ট ধারার অন্তর্গত। এর উৎপত্তি ও বিস্তৃতিকাল পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চার শতাব্দী জুড়ে, যদিও উনিশ শতকেও এর কিছু অনুবৃত্তি চলেছিল। এই অনুবাদগুলি মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্য আশ্রিত। তবে ঠেট হিন্দী, ফার্সী ও ব্রজভাষা থেকেও কিছু কাব্য অনূদিত হয়েছিল। এই কাব্যগুলি উচ্চতর এবং সমৃদ্ধ ভাষাগুলির সাহিত্যসম্পদ বাংলা ভাষায় পরিবেশন করে এই ভাষার কলেবর পুষ্ট করেছে, সর্বভারতীয় সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রাদেশিক বাংলা ভাষার যোগসাধন ও ঐক্যবিধান করেছে, কাব্যে বৈচিত্র্য এনেছে, তত্ত্ব প্রচার করেছে, লোকশিক্ষা দিয়েছে এবং বাঙালীর গল্পরস পিপাসা মিটিয়েছে। সেই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বাংলা ভাষার প্রকাশ সামর্থ্যকে বহুগুণ বর্ধিত করে দিয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এই অনুবাদ কাব্যগুলি তাই বিশেষ মূল্যবান।

মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ কাব্যগুলিকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি, বিবিধ সংস্কৃত 'রামায়ণ' অনুবাদের ধারা। দ্বিতীয়টি সংস্কৃত 'মহাভারত' অনুবাদের ধারা। তৃতীয়টি, ভাগবত পুরাণ অনুবাদের ধারা। চতুর্থটি ঠেট হিন্দী, ফার্সী ও ব্রজভাষায় রচিত কাব্য অনুবাদের ধারা। পঞ্চমটি, সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র ও তত্ত্বনিবন্ধ এবং স্তোত্রাবলী অনুবাদের ধারা। আর ষষ্ঠটি হল, জয়দেবচন্দ্র ও তাঁর উত্তরকালীন কবিদের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদের ধারা। স্বল্প পরিসরে এই ছয়টি ধারার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করব।

।। ১. 'রামায়ণ'-অনুবাদের ধারা ।।

মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ কাব্যের জনপ্রিয়তম ধারা হ'ল সংস্কৃত 'রামায়ণ' মহাকাব্য অনুবাদের ধারা। এই ধারায় যে 'বাল্মিকী রামায়ণ' এর অনুবাদ হয়েছে তাই নয়, 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণেরও খণ্ডাংশ এবং কোনো কোনো কাহিনীর অনুবাদ হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন '*The Bengali Ramayanas*' গ্রন্থে ও অধ্যাপক নলীনীমোহন বসু 'বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে ৫১ জন কবির বাংলা 'রামায়ণ' অনুবাদের কথা বলেছেন। এঁদের সকলের অনুবাদ কর্মের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে প্রধান কবিগণ পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। এই ধারা পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে অপ্রধান কবিদের পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ অনুবাদের ধৈর্য ও শ্রমস্বীকার কমে গেছে। তাঁরা 'রামায়ণ'-

এর কোনো কোনো কাণ্ডের নিরপেক্ষ পাঠের অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের 'Literal Translation' বা আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এগুলি মূলতঃ ভাবানুবাদ বা সারানুবাদ। অনুবাদে মূলের ক্রমও সবত্র রক্ষিত হয়নি। কতগুলি কাণ্ড সর্বভারতীয় কাহিনীতে স্বাধীনতা নিয়েছেন, নৈতিক কাহিনী ঢুকিয়েছেন এবং বাঙালিয়ানা মিশিয়েছেন। এঁদের কাণ্ডক্রমের পরিচয় সংক্ষেপে নেওয়া যাক।

প্রথমেই আসে ফুলিয়ার কৃত্তিবাস বা **কৃত্তিবাসের** কথা। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় আধুনিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে কৃত্তিবাস ১৪৬৬ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের সুলতান কংসনারায়ণ বা রাজা গণেশের রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তাঁর অনুরোধে এর পর বাঙ্গালির 'রামায়ণ' মহাকাব্যের স্বাধীন অনুবাদ করেন **'শ্রীরামপাঞ্চালী'** কাব্য রচনা করেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনীর কাঠামো অনুসরণ করলেও এই রামায়ণের কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন এবং 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ভাগবত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' 'পদ্মপুরাণ' কৃষ্ণপুরাণ বৃহদ্ধর্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ, নরসিংহপুরাণ 'দেবীভাগবত', ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' 'অনর্ঘরাঘব' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে নানা কাহিনী ও উপাখ্যান সংগ্রহ করে নিজ কাব্যে যোজনা করেছেন। এছাড়া দেবীবন্দনা, তপনীসেন মহিরাবণ অহিরাবণ কাহিনী, রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গা চণ্ডিকার অকালবোধন ও ১০৮ নীলপদ্মের কাহিনী, রাবণের ভল্লুকরূপে হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যু বাণ হরণ, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামচন্দ্রের রাজনীতিশিক্ষা প্রভৃতি উপাখ্যান কৃত্তিবাসের মৌলিক সৃষ্টি। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এর প্রধান পার্থক্য চরিত্রসৃষ্টি এবং রসসৃষ্টিতে। বাল্মীকির নায়ক রামচন্দ্র 'মানুষোত্তম' কৃত্তিবাসের নায়ক রামচন্দ্র নারায়ণের অংশাবতার এবং ভক্তবৎসল ভগবান। বাল্মীকির সীতা সৌন্দর্যে ও মহিমায় মহান কৃত্তিবাসের সীতা স্বভাবকোমলা ভীরু বঙ্গবধূ। বাল্মীকির মহাকাব্যের মূলরস বীর ও করুণ রস। কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল রস ভক্তিরস যদিও এতে করুণ রস এবং কিছু হাস্যরসের মিশ্রণ আছে। বাঙালীর গৃহজীবনে আদর্শ ভ্রাতৃপ্রীতি পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি বাৎসল্য বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতির প্রচার ছিল কৃত্তিবাসের কাহিনীগ্রন্থনা ও চরিত্রচিত্রণের মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাঙালীর জীবনাদর্শকে চালিত করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পরবর্তীকালে অজস্র প্রক্ষেপসত্ত্বেও এই মূল জীবনাদর্শ লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। ড. সুকুমার সেন এজন্য যথার্থই বলেছেন 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নিখিল বঙ্গভাষীর কাছে **'আহার এবং ঔষধ'—দুই ই।**

বাংলা ভাষায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে ষোড়শ শতকের কবি **নিত্যানন্দ আচার্যের** বাংলা অদ্ভুত রামায়ণ অনুসারী। এর ভাষা কৌশল্যা চরিত্রে কিছু নতুনত্ব আছে। এই শতকের **কৈলাস বসুর** রামায়ণ ও 'অদ্ভুত রামায়ণ' আশ্রিত। এই শতকের মহিলা কবি **চন্দ্রাবতীর** রামায়ণ সীতাবর্জনের জন্য রামের প্রতি ধিক্কার

মধ্যযুগেও আধুনিক নারীবাদী চেতনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের **ভিষক্ রামশঙ্কর দত্তের** 'রামায়ণ' কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সময়িত রূপ **ভবানী দাসের** 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়', 'শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়' প্রভৃতি খণ্ডিত পালার যুদ্ধকাহিনীর সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনচিত্র মিশে গেছে। **দ্বিজ লক্ষ্মণের** কাব্য অধ্যায় রামায়ণ-অনুসারী। এঁর শিবরামের যুদ্ধ পালাটি উল্লেখযোগ্য। 'বৃন্দাবতীর' **রামানন্দ ঘোষের** রামায়ণের বিচিত্র বিষয় হল, এঁর কাব্যে রামচন্দ্রই জগন্নাথ এবং বৃক্ষ কাব্যের শেষে কাষ্ঠমূর্তি বা দারুব্রহ্ম জগন্নাথের প্রতি যে নাস্তিক্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে আধুনিক ব্যক্তিভাবনার চিহ্ন আছে। **রামানন্দ যতি** বা **'ভিক্ষু'**র রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে 'ভাগবত', 'গীতা' ও মুক্তাবলীর মিল দেখানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পিতা-পুত্র **জগন্নাথ রায়** এবং **রামপ্রসাদ রায়ের** যুগ্মপ্রচেষ্টায় লেখা রামায়ণটি এই কাব্যধারার সর্ববৃহৎ রচনা। এর কাণ্ডসংখ্যা আট। পুষ্পদন্তের 'নতুন সংস্করণ রামায়ণ' অংশটি ধরলে এর কাণ্ডসংখ্যা নয়টিও বলা যায়। রামায়ণ বিচিত্র বাংলার ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলার বাসের অনুসরণে এই রামায়ণে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা ও তাঁর সখীদের রাসবিহারের বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের এইসব বিচিত্র রামায়ণ অনুবাদের ধারা উনিশ শতকেও বাহিত হয়েছিল। রামায়ণের মূল ধারার কবি **রঘুনন্দন গোস্বামীর** রামরসায়ন কাব্যে রামায়ণ কাব্যধারার শেষ বৃহৎ রচনা। কবিটি কবির সংস্কৃত জ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের নিদর্শন পূর্ণমাত্রায় আছে। এই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কিন্তু সীতার পাতালপ্রবেশ বর্ণিত হয়নি।

।। ২. 'মহাভারত'-অনুবাদের ধারা ।।

'বাল্মীকি রামায়ণের' মতো আর এক আদি মহাকাব্যের *Authentic Epic* বেদব্যাসের 'মহাভারত'। এই অষ্টাদশ পর্ব সংস্কৃত মহাকাব্যও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে অনূদিত হয়েছে। কোনো কোনোটি পূর্ণাঙ্গ অষ্টাদশ পর্বেরই অনুবাদ, অধিকাংশই একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদ। বাঙালীর রামায়ণ অনুবাদের উৎস যেমন বাল্মীকি ছাড়াও অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণ ও বিবিধ পুরাণ, মহাভারতের কিন্তু তেমন নয়। 'মহাভারতের' পূর্ণাঙ্গ ও খণ্ডিত অনুবাদগুলি মূলতঃ বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারতের অনুসারী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল জৈমিনি ভারত থেকে কিছু কিছু কাহিনী নেওয়া হয়েছে। 'মহাভারতের' অনুবাদ বাল্মীকিরামায়ণ অনুপ্রবেশও কম।

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, সঞ্জয়ের 'মহাভারতই' প্রথম অনূদিত বাংলা 'মহাভারত'। ড. সুকুমার সেন সঞ্জয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি। তাঁর অনুমান সঞ্জয় হরিনারায়ণ দেবের ছদ্মনাম। কিন্তু কবি সঞ্জয়ের অস্তিত্ব এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯২৮-৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের নির্দেশে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালের তত্ত্বাবধানে আমি নানা পুথি থেকে সঞ্জয়ের 'মহাভারত' অনুবাদের সমগ্র কাব্যের অনুলিপি প্রস্তুত করে দিই।

ও মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সেই অনুলিপি অবলম্বনে কাব্যটি সম্পাদনা করেন। ড অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পাদিত সংস্করণের ভাষা বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সঞ্জয় খুব প্রাচীন কবি নন তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের সমসাময়িক হতে পারেন তাঁর 'মহাভারতে'র দ্রোণপর্বে দ্রৌপদীর যুদ্ধ' একটি নতুন আখ্যান

বস্তুতঃ বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু হয়েছিল মুসলমান শাসকদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের অধীন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের আগ্রহে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়পাণ্ডব' নামে সংক্ষেপে সমগ্র অষ্টাদশপর্ব 'মহাভারতে'র কাহিনী গ্রন্থনা করেন লস্কর পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ খান বা ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী 'মহাভারতে'র অংশবিশেষের অনুবাদ করেন এটি হল 'অশ্বমেধ' বিজয় পণ্ডিতের নামে সংকলিত মহাভারত আসলে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'বিজয় পাণ্ডব' কাব্যেরই নকল এবং কথাপ্রসঙ্গে নুসরৎ খান বা ছুটি খানের আগ্রহে শ্রীকর নন্দী যে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন তার মূল 'জৈমিনি ভারত' যে পর্বের কাব্যকাহিনী বেদব্যাসের 'মহাভারত' থেকে বিচ্ছিন্ন, শ্রীকর নন্দীর কাব্যে বীরবলের সঙ্গে হাসাবস পরিবেশনেও কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক তাঁর পূর্বে এবং সমকালে আর যাঁরা 'মহাভারতে'র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ হরিদাস ঘনশ্যাম দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ এঁরা কেউই পুরো 'মহাভারত' অনুবাদ করেননি, অংশবিশেষের অনুবাদ করেছিলেন। এঁদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে বঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রাদর্শ সম্প্রসারিত হয়েছিল। দৈবকীনন্দন কর্ণপর্বের অনুবাদ করেছিলেন। বাকি কবিরা প্রায় সকলেই অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। এঁদের অনুবাদের মূল অবলম্বন 'জৈমিনি ভারত'। বলা নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরামের কিছু পূর্বে বৈয়াসকি 'মহাভারতে'র অনেকগুলি পর্ব অনুবাদ করেন কাশীরামের অনেক পাঠান্তে নিত্যানন্দের রচনাংশ ঢুকে গেছে। নিত্যানন্দের রচনা বাহুল্যবর্জিত সংযত ও পরিচ্ছন্ন।

কাশীরাম যে বেদব্যাসের 'মহাভারতে'র কিরূপ মূলানুসরণ করেছেন, তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 'বনপর্ব' পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বনগমনের প্রাক্কালে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলেছিলেন –

দ্রুপদস্য কুলে জাতাং, সুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্।
মাংবে বনগতাং দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব।।
নূনঞ্চ তব বৈ নাস্তি মন্যুর্ভরতসত্তম।
যত্তে ভ্রাতৃংশ্চ মাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা ন ব্যথতে মনঃ।।

ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্মি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্
তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ।।'

কাশীরামের মূলানুগ স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এইরকম—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি কৃষ্ণা নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি তব রানী
মম দুঃখ দেখি হৃদি তাপ নাহি হয়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়,
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।"

কাশীরাম দাসের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও অষ্টাদশ শতকে যাঁরা 'মহাভারতে'র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবীন্দ্র নিত্যানন্দ দাস, গোবিন্দ কবিশেখর, শঙ্কর চক্রবর্তী, সারলা দাস, রাজেন্দ্র সেন, বাসুদেব, গোপীনাথ দত্ত, দ্বিজ ঘনশ্যাম, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, রাজীব সেন, রামলোচন প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রায় সকলেই 'মহাভারতে'র সপ্তাংশের অনুবাদক। যেমন, গোবিন্দ কবিশেখর কোচবিহার রাজসভায় 'কিরাত' পর্বের অনুবাদ করেন। সারলা দাস উৎকল 'আদি' ও 'বিরাট' পর্ব অনুবাদ করেন। শঙ্কর চক্রবর্তী 'মহাভারত' অনুবাদ করেন সংক্ষেপে। রাজেন্দ্র সেন 'ব্যাস অশ্বমেধ' কাহিনীতে অভিনবত্ব এনেছেন। বাসুদেব অনুবাদ করেন 'স্বর্গারোহণ' পর্ব। গোপীনাথ দত্তের অনুবাদ 'দ্রোণ' ও 'নারী' পর্বের। দ্বিজ ঘনশ্যাম এবং দ্বিজ কৃষ্ণরাম দুজনেই জৈমিনি ভারত থেকে 'অশ্বমেধপর্ব' অনুবাদ করেন। রাজীব সেনের উদ্যোগপর্বের অনুবাদ বেশ গাঢ়বদ্ধ। রামলোচন অনুবাদ করেন 'নারী' পর্ব। এঁদের এইরকম বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদ-গৌরব কাশীরামের অনূদিত 'মহাভারতে'র যশোপ্রভায় ঢেকে গেছে।

।। ৩. 'ভাগবত'-অনুবাদের ধারা।।

বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু হওয়ার আগেই 'ভাগবত পুরাণ' অনুবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই অনুবাদের ধারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব প্রেমধর্ম আন্দোলনের পূর্বেই মহাপ্রভুর পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরী দক্ষিণ ভারত থেকে বঙ্গে 'ভাগবত-পুরাণ' আনেন ও এর ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। বাংলা ভাষায় 'ভাগবতে'র প্রথম অনুবাদক শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বহুমানিত 'গুণরাজ খান' উপাধিক **মালাধর বসু**। এঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে সম্বর্ধিত করেন গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। বর্ধমান কুলীন গ্রামবাসী এই বিদগ্ধ কবি 'ভাগবতে'র দশম একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে রচনা করেন তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য **'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'**। কাব্যরচনাকাল ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের হ্রদ, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা—এই চারপর্বের বিবিধ লীলা বর্ণিত হয়েছে। মালাধর শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবনলীলা সংক্ষেপে সেরেছেন, তাঁর অপর তিনটি পর্বের লীলায় ঐশ্বর্য ভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তুর্কী-আক্রমণোত্তর বঙ্গে

উদ্দীপ্ত ও দুর্বল বাঙালী জাতির চিত্ত বলিষ্ঠ সাহস ও আত্মপ্রত্যয় জাগাবার জন্য বীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। মালাধর তাঁর কাব্যে সেই জাতীয় কৃত্যই সম্পাদন করেছেন। তবেই মহাপ্রভু মালাধরের কাব্যে "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"। এই ছত্রটির মধ্যে মধুরসের ও সখ্যভক্তির প্রকাশ দেখে ভাবাবিষ্ট হন এবং কাব্য ও কবির প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদান করেন।

মালাধরের অনুবাদ মূল সংস্কৃত 'ভাগবত পুরাণ' অনুসারী কিছু তিনি অনুবাদকালে 'ভাগবতের' গোপীপ্রসঙ্গ প্রায়ই এড়িয়ে গেছেন। যেমন, 'ভাগবতের' কালিয় দমন কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের কালীহ্রদে পতনের পর পুত্র হারে নন্দ যশোদা ও গোপীদের বিলাপের কথা আছে—

"গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদং স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়রহিতমেত্য গৃহাস্ত্বিষীদন্ন্"

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্তচিত্তা এবং তাঁর ভালবাসা ও হাস্যমিশ্রিত কটাক্ষের মধুর বাক্য স্মরণকারিণী গোপীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সর্পগ্রস্ত হলে অত্যন্ত দুঃখাগ্নিতপ্ত হয়ে প্রিয়বিরহিত গৃহকে শূন্য দেখেছিলেন। মালাধর গীতির পরিবর্তে বর্ণনায় গোপীপ্রসঙ্গ এইভাবে বাদ দিয়েছেন—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

মালাধর তাঁর কাব্যে কিছু কিছু ভাগবত বহির্ভূত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন, বাল্যলীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণের দৃশ্যের আদর্শ উদ্ধৃতিকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বমূর্তি প্রদর্শন বিশ্বরূপের ও 'হরিবংশ' অনুসরণে পারিজাত হরণ 'মহাভারত' অনুসরণে ভগবদ্গীতার অনুবাদ ও হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব অংশ অবলম্বনে বলরাম উপাখ্যান ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের মতো মালাধরও তাঁর কাব্যের কোনো কোনো স্থানে বাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, তাঁর কাব্যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে বসে 'ভাত' খান, মথুরার দিক দিকে দেখা যায় 'গুয়া তমলপাতি কাঁঠালকলা' গাছ, দ্বারে দ্বারে বিরাজ করে নারিকেল গাছের সারি। এসব বর্ণনাও কাব্যটিকে বাঙালীর প্রিয় করেছিল।

ভাগবত অনুসারী অন্যান্য মধ্যযুগীয় কাব্যের মধ্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কঙ্কদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয়' পাঁচালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যগুলি ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কবিশেখরের

কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' সমগ্র ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ভক্তিমান কবির এই কাব্যটি মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল। দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ভাগবতের অনুসরণে ছাড়াও 'মহাভারত', 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপুরাণ' থেকে নানা পৌরাণিক কাহিনী এবং লৌকিক উৎসজাত লোকলীলা, লৌকিকলীলার কাহিনী আশ্রয়ে কবি রাধাপ্রেমের মাধুর্য ও গৌরব নিবেদনের প্রয়াস করেছেন। কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'ও ভাগবত ছাড়াও 'মহাভারত', 'হরিবংশ' ও বিবিধ পুরাণের কৃষ্ণকাহিনী আশ্রয়ে। কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের 'গোপালবিজয় পাঁচালী'তে লৌকিক কাহিনীই বেশী।

অষ্টাদশ শতকের রচিত দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল'ও লৌকিক কাহিনীরই প্রাধান্য। এ কাব্যের নামের সার্থকতা এটি গোবিন্দ ভবানন্দের 'হরিবংশ' সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের সূচনায় রচিত হয়। মাধবের শ্রীকৃষ্ণের এত কবি মূল সংস্কৃত হরিবংশ বিষয় অনুসরণ করেছেন। লৌকিক [illegible] কাহিনীই বেশী পরিবেশন করেছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' ভাগবতের স্বাধীন অনুবাদ। দ্বিজ রমানাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'ও তাই।

।। ৪ বিবিধ বৈষ্ণব কাব্য কবিতা নাটক তত্ত্বনিবন্ধ অনুবাদের ধারা ।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে, সংস্কৃত থেকে বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদ সব থেকে বেশী বৈচিত্র্য আছে। এই সব অনুবাদের ধারা চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাহিত হয়েছিল। এই পর্যায়ের ভক্তিমান বৈষ্ণব কবিরা মূল প্রভুর শিক্ষাদর্শে উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁদের অনুবাদে সংস্কৃতের মূল বিষয়বস্তু বিনা দ্বিধায় অনুসৃত। এদের মধ্যে রয়েছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র মতো নাট্য আখ্যান গীতিকাব্য, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'চমৎকার চন্দ্রিকা'র মতো আখ্যানকাব্য, কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' এবং রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভের' মতো নাটক, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র মতো স্তোত্রকাব্য, শ্রীরূপের 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবে'র মতো স্তবকাব্য এবং 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'র মতো স্তবগাথা, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'মনঃশিক্ষা' এবং 'স্বনিয়মদশকে'র মতো সাধন কবিতা, শ্রীরূপের 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'র মতো বৈষ্ণব অলঙ্কারগ্রন্থ, কবি কর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতো ঐতিহাসিক তত্ত্বনিবন্ধ ইত্যাদি। এদের বিস্তৃত পরিচয় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থের বিষয়। আমরা কয়েকটির সংক্ষিপ্ত দিগ্দর্শন মাত্র করছি।

প্রথমে একটি স্তবকাব্যের কথা বলি। এটি শ্রীরূপের সাধনকাব্য 'নিকুঞ্জরহস্যস্তব'। এই কাব্যের মালিনী ছন্দে রচিত ৩২টি শ্লোকে শ্রীরূপ তাঁর সাধনায় মানসনেত্রে স্ফুরিত বৃন্দাবনের নিভৃতনিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা স্মরণ করেছেন। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ এবং প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী কবি, আমাদের উৎকলের স্বাদশ পুরুষ, বংশীবদন চট্টো ষোড়শ শতকে 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবগীতালি' নামে ৩৩টি পদে এর চমৎকার মুক্তানুবাদ করেন। একটি পদ

মূলাতিরিক্ত মৌলিক রচনা। এই স্তবকাব্য ও তার অনুবাদে নিগূঢ় মঞ্জরীসাধনার কথা বাক্ত। কবির অনুবাদ থেকে একটু পরিচয় দিচ্ছি। শ্রীরূপের মূল ১৬-সংখ্যক পদটি এই—

"কনকজলদগাত্রী নীলনীলাঞ্জনেত্রী
মৃগমদরসভালী মালতীকুন্দমালী।
তরলতরকনীলী নীলপীতাম্বরোলী
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ।"

বংশীবদনের সুললিত অনুবাদ এইরকম—

"নিকুঞ্জমাঝারে দেখ রূপ অনুপাম।

নবঘনে চলচপল প্রতি অঙ্গ নিরমল প্রেমপীরিতি নিরমল।।
কবিত কাঞ্চনমণি শ্যামজলধর জিনি উজ্জ্বল মনোহর শোভা
হসিত অমৃতকেহ অরুণ কমলাধর নয়ন সুধারস আভা।
মৃগমদ রসরাজ কপালে তিলকসাজ গলায় মালতী কুন্দমাল
যৌবন রসমূল সকল কলেবর বেশ তরল অতি ভাল
মদন মনোহর নীল পীতাম্বর দুঁহু তনু পহিরণ লোহে।
দাস বংশীবদন রসিক রঙ্গিনী রূপে বৃন্দাবন মোহে।"

মূলের মালিনী ছন্দকে পরিহার করে বংশীবদন এখানে বাংলা ত্রিপদী ছন্দেই জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ কাব্যের 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্' পদের ধ্বনিঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছেন।

অন্যান্য বৈষ্ণবীয় স্তোত্রে ও স্তবকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাতনামা কবি অনূদিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর স্তোত্রকাব্য 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' ও রূপ গোস্বামীর চাটুপুষ্পাঞ্জলি স্তবকাব্য। বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামীর অনুলিখা প্রেমদাস অনুবাদ করেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাধনকবিতা 'মনঃশিক্ষা'। অজ্ঞাতনামা আর এক কবি অনুবাদ করেন দাস গোস্বামীর আর একটি সাধনকবিতা 'স্বনিয়মদশক'।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের অনেকগুলি পদানুবাদ হয়েছিল। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বসন্তরায় দাস, রঘুনাথ দাস এবং ভগবানদাসের অনুবাদ। সবগুলি অনুবাদই আঠারো শতকের। এই কাব্যানুবাদের ধারা বিশ শতক পর্যন্ত বাহিত হয়েছে।

নাটকের মধ্যে মহাপ্রভু কৃপাধন্য কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকং' অবলম্বনে ১৬৩৪ শক বা ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত কবি প্রেমনাথ বা পুরুষোত্তম মিত্র রচনা করেন 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' কাব্য। কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। প্রেমদাসের রচনা মূলানুসারী ও স্বচ্ছন্দ, পড়লে অনুবাদ বলে মনে হয় না। একটু উদাহরণ দিই। কর্ণপূরের মূল নাটকে 'সর্বাবতারদর্শন' নামক দ্বিতীয় অঙ্কে ভক্তিদেবীর উক্তি অনুসারে মহাপ্রভুর ষড়ভুজ রূপ দেখে নিত্যানন্দপ্রভুর স্তব এইরকম—

"ইদিস্থং হরস্থং বিবিক্তিস্তমেব ত্বমপস্ত্বমগ্নিস্ত্বমিন্দুস্ত্বমর্কঃ

নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুত্বং মুরারে নমস্তে নমস্তে সমস্তেশ্বরায় ।"

প্রেমদাসের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—

"তুমি হরি তুমি হর তুমি ব্রহ্মা রুদ্র। তুমি ইন্দ্র তুমি অগ্নি তুমি দিবাকর ।
তুমি নভ তুমি ক্ষিতি বায়ু মুর অরি সমস্ত ঈশ্বর তুমি নমস্কার করি।"

প্রেমদাসের কাব্যটির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে কারণ, এই কাব্যে মূলাতিরিক্ত এমন কিছু প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যা অন্য ত্র অপ্রাপ্য। যেমন, নাটকের দশম অঙ্কে কর্ণপূর জানিয়েছেন স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের অনবসরকালে মহাপ্রভু বিরহজ্বরে আক্রান্ত হন তখন স্বরূপ গোস্বামীর পরামর্শে মহাপ্রভুকে মধুরসাশ্রিত একটি "গৌড়ীয়ভাষোপনিবদ্ধম ভগবদ্বংশীনাদ মাধুরী প্রতিপাদকং গীতম্" শুনিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র ঐ গানটি বুঝতে পারেন নি। তখন কাশীমিশ্র রাজাকে ঐ গীতটি শোনান। কর্ণপূর গীতটি উল্লেখ করেন নি কিন্তু প্রেমদাস সমগ্র গীতটি উল্লেখ করে জানিয়েছেন এটি বংশীবদন চট্টো বিরচিত "মধুর মধুর বংশী বাজে বনে" পদ। ড সুকুমার সেন *A History of Brajabuli Literature* গ্রন্থে জানিয়েছেন, প্রেমদাস যেহেতু বংশীবদন পরিবারের অনুশিষ্য তাই তাঁর দেওয়া তথ্য প্রামাণিক ও যথার্থ। বংশীবদনের 'নিকুঞ্জরহস্যস্তবশীর্ষক' এবং প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা আমার **'রাধাবল্লভী সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসাহিত্য'** গবেষণাগ্রন্থে লভ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় যদুনন্দন দাস শ্রীরূপের **'বিদগ্ধমাধব'** নাটকের পদ্যানুবাদ করে নাম দেন—**'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব'**। এতে নাটকটির ঘটনাগুলি পয়ার ছন্দে এবং গানগুলি পদের আকারে অনূদিত হয়েছে। যদুনন্দন শ্রীরূপের **'দানকেলি কৌমুদী'** নাটকের অনুবাদ করেন **'দানলীলাচন্দ্রামৃত'** নামে।

রায় রামানন্দের এই **'জগন্নাথবল্লভ'** নাটকের একাধিক পদ্যানুবাদ হয়েছিল। ষোড়শ শতকে নাটকের মূল শ্লোকগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এর অনুবাদ করেন লোচনদাস। সপ্তদশ শতকে নাটকের অঙ্ক ধরে অনুবাদ করেন অকিঞ্চনদাস। আরো পরবর্তীকালে রায় রামানন্দের এই **'জগন্নাথবল্লভ'** নাটকের পদ্যানুবাদ করেন গোপাল দাস ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর আখ্যানকাব্য **'চমৎকারচন্দ্রিকা'**র কাব্যানুবাদ করেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য কৃষ্ণদাস। চারটি 'কুতূহল' বা আখ্যানে কাব্যটি গ্রথিত। আখ্যান গুলিতে বিচিত্র ছদ্মবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন বর্ণিত। বর্ণনা নাটকীয় ও কৌতুকরসস্নিগ্ধ। প্রথম কুতূহলে কৃষ্ণ যশোদা প্রেরিত অলঙ্কার পেটারীর মায়া কৌশলে ঢুকে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দ্বিতীয় কুতূহলে কৃষ্ণ কুটিলাকে ছলনা করে অভিমন্যু বা আয়ানের বেশে রাধার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছেন। তৃতীয় কুতূহলে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন তাঁর বিদ্যাবলী ছদ্মবেশে। আর চতুর্থ কুতূহলে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন সুগায়িকা কলাবতীর ছদ্মবেশে। কৃষ্ণদাসের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ এবং সর্বত্র মূলানুসারী। এই আখ্যানকাব্যে বর্ণিত ছদ্মবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলনের বিষয়টি

পদকর্তাগণের নানাবিধ রসের পদাবলীতে এবং আমার বৃন্দাবনস্থ বিপিনবিহারী গোস্বামীর মধুর মিলন কাব্যে অনুসৃত হয়েছে। এ সব প্রসঙ্গের বিশদ বিবরণ আমার তত্ত্বাবধানে কৃত ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংহিতা, নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্যাখ্যান'-এ লভ্য।

বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থাদির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত **নরনারায়ণের 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব'** ও কালের **'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'**র এবং **শচীনন্দন বিদ্যানিধির 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'** শ্রীরূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কাব্যানুবাদ। অনুবাদ দুটি যথাযথ মূলানুসারী। এই শতকেই দীনহীন নামে কবি **'কিরণদীপিকা'** নামে কবিকর্ণপূরের ঐতিহাসিক তত্ত্বনিবন্ধ **'গৌরাগণোদ্দেশদীপিকা'**র মূলানুগ কাব্যানুবাদ করেন। দেবানন্দ দাসও এর একটি ভাষানুবাদ করেন। এগুলি ছাড়াও মহাপ্রভু, তাঁর পার্ষদগণ এবং তাঁদের অনুবর্তীদের পুরাণ, ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রায় চারশো বছর ধরে অজস্র বৈষ্ণবগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় কাব্যানুবাদিত হয়েছে। এই সমস্ত কাব্যানুবাদ বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে এবং মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমধর্মকে নিখিলবঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে।

। ৫ আরবি, ফার্সী, ঠেট গোহারী ও ব্রজভাষায় রচিত কাব্যানুবাদের ধারা।।

মধ্যযুগে কাব্যে, নাটকের বাইরে মানবিক রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে সপ্তদশ শতকে পূর্বাঞ্চলে আরাকান রাজসভায় নতুন ধরনের কাব্য রচিত হয়। এগুলি ফার্সী ও আরবি কাহিনী পূর্বীয়া হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও এদের মধ্যে কবিদের দর্শনের এবং আখ্যান গ্রন্থনে বেশ মৌলিকত্ব আছে। এই পর্যায়ের দু'জন প্রধান কবি **দৌলত কাজী** এবং **সৈয়দ আলাওল**। রোসাঙ্গ রাজ থিরিথুদম্মা বা শ্রী সুধর্মার রাজত্বকালে (১৬৩১-৩৮ খ্রীঃ) দৌলত কাজী তাঁর **'লোরচন্দ্রানী'** বা **'সতীময়না'** কাব্যটি রচনা করেন। এই অসমাপ্ত কাব্যটি ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন পরবর্তী কবি সৈয়দ আলাওল। দৌলতের কাব্যের উৎস মূলা দাউদের প্রাচীন হিন্দী কাব্য 'চন্দায়ন' এবং মিয়া সাধনের ঠেট গোহারী ভাষায় রচিত কাব্য 'মৈনা সতবন্তী'। অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণ নয়, কাহিনীধারার অনুবর্তন। কাহিনীর বিষয় গোহারি রাজকন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে রাজা লোরকের প্রণয়। চন্দ্রানীর স্বামী নপুংসক বামনীকে যুদ্ধে হারিয়ে লোরকের চন্দ্রানীলাভ ও পরিশেষে লোরকের পূর্বপত্নী সাজী মগনমতীর বিরহ এবং লোরকের প্রত্যাবর্তনে সাজীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন। কাব্যটির মধ্যে সূফী দর্শন এবং হিন্দু যোগদর্শনের কিছু পরিচয় আছে।

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী সুপণ্ডিত **আলাওলের** শ্রেষ্ঠ কাব্য **'পদ্মাবতী'** (১৬৪৬ খ্রীঃ)। এই কাব্যটি মূলতঃ অবধী হিন্দী ভাষায় রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ। কাব্যকাহিনী অবশ্য ঐতিহাসিক। এর বিষয়—দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ এবং চিতোরের রাজা রত্নসেনকে বন্দীকরণ। রাণার সুন্দরী গৌরী ও

বাদিনার কৌশলে তাঁর মুক্তিলাভ, রাণার পত্নী পদ্মিনীকে রাজা দেওপালের বিপথগামিনী করার চেষ্টা, দেওপালের সঙ্গে যুদ্ধ রত্নসেনের মৃত্যুবরণ, রাণার দুই পত্নী পদ্মিনি ও নাগমতির স্বামীর চিতায় অনুমৃতা হওয়া, আলাউদ্দিনের চিতোরে এসে জ্বলন্ত চিতায় প্রণতি জানিয়ে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন। কাব্যকাহিনীতে ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে লৌকিক উপাদান মিশে গেছে। এর মধ্যে সুফী ধর্মের কিছু কথক প্রভাবও রয়েছে। কোরেশী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। কাব্যটির মূল তত্ত্ব নিষ্কাম প্রেমের জয়গান।

আলাওল জায়সীর কাব্যের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেন। তবে ঘটনাবর্ণনা ও চরিত্রবর্ণনে কোথাও কোথাও কিছু মৌলিকতা দেখিয়েছেন। স্থানে স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু কিছু উপকরণ নিয়েছেন।

আলাওলের **'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'** আরবী ভাষায় লেখা আলিফ লায়লা বা আরব্য উপন্যাসের একটি কাহিনী অনুসরণে। এর বিষয় মিশরের বাদশাহপুত্র সয়ফুলমুলুকের সঙ্গে পৌরাণিক পরীরাজকন্যা বদিউজ্জামালের রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী। কবির **'হপ্তপয়কর'** কাব্যটি নেজামি সমরকন্দীর ফার্সি ভাষায় রচিত কাব্যের অনুসরণ। এই কাব্যে আরব ও আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহরামের বিবিধ 'কেরামত' যুক্ত সাতটি গল্প বর্ণিত। আলাওলের **'তোহফা'** পয়ত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত মুসলমান সমাজের নীতিগ্রন্থ। এর অবলম্বন ইউসুফ দেহলবী বা গদার ফার্সী **'তুহফাতুনসেনা'** নামের নীতিকথা। আলাওলের সর্বশেষ কাব্য **'সেকান্দারনামা'** ফার্সী কবি নেজামি সমরকন্দীর 'ইস্কান্দারনামা' কাব্যের অনুবাদ। এর বিষয় গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের কিছু কিছু বিজয়কাহিনী।

মুসলমানী কাব্যের বাইরে বৈষ্ণবীয় ভক্তদের জীবনকাহিনী নিয়ে হিন্দীর আঞ্চলিক রূপ ব্রজভাষায় নাভাজী রচনা করেন **'ভক্তমাল'** গ্রন্থ (১৫৬০ খ্রীঃ)। পরে নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস এর একটি টীকা লেখেন। উভয় গ্রন্থ অবলম্বনে কৃষ্ণদাস বা লালদাস উনিশ শতকের প্রথম ভাগে **'বাঙ্গালা ভক্তমাল'** গ্রন্থ রচনা করেন। এতে মূল কাহিনীগুলির অনুসরণ ছাড়াও 'রসপ্রকরণ' নামে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক নিবন্ধ আছে।

।। ৬. ভারতচন্দ্র ও উত্তরকালীন কবির কাব্যানুবাদের ধারা ।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শেষ বড় কবি ও ভাষাশিল্পী কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। এর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি **'অন্নদামঙ্গল'** (১৭৫২ খ্রীঃ) কাব্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এ রাজকণ্ঠের মণিমালা। এই কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড **'কালিকামঙ্গল'** বা 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ ভারতচন্দ্র এই অংশের কাব্যনায়ক চোর রূপে ধৃত গোপন অভিসারী রাজকুমার সুন্দরের মুখে সংস্কৃত **'চৌরপঞ্চশিকা'** কাব্য থেকে তিনটি শ্লোক বসিয়ে দিয়েছেন। এই শ্লোক তিনটির প্রথম পংক্তিগুলি হল যথাক্রমে (১) "অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং ", (২) "অদ্যাপি তন্মনসি বর্ততে মে " এবং (৩) "অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং " শ্লোকগুলি সার্থক।

একটি আর্য দেবী কালিকা-পক্ষে আর একটি অর্থ নায়িকা বিদ্যাপক্ষ। ভারতচন্দ্র পুথি বেড়ে যাবার আশঙ্কায় এই তিনটি শ্লোকের শুধু বিদ্যাপক্ষে অর্থ ধরে অনুবাদ করেছেন। ভারতচন্দ্রের সমকালে কিংবা কিছু পরবর্তীকালে চৌরপঞ্চ শিক্ষার পঞ্চাশটি শ্লোকেরই দেবীপক্ষ এবং বিদ্যাপক্ষে কাব্যানুবাদ হয়েছিল। অনুবাদক সম্ভবতঃ নন্দকুমার কবিরত্ন অনুবাদে ইনি কাশীনাথ সার্বভৌমের সাহায্য নিয়েছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র পত্নীসহ সেখানেই বসতবাটী নির্মাণ করে বাস করেন। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র ও তাঁর মা ঐ গ্রাম পত্তনি নেন এবং রামদেব নাগকে তার পত্তনিদার নিযুক্ত করেন। রামদেব ভারতচন্দ্রের উপর নানা অত্যাচার শুরু করলে বিপদগ্রস্ত কবি শিখরিণী ছন্দে 'নাগাষ্টক' নামে আটটি সংস্কৃত শ্লোক ও তার বঙ্গানুবাদ লিখে কৃষ্ণকান্তের কাছে পাঠান। শ্লোকগুলি এবং তাদের অনুবাদে আর্ত কবির প্রতিকার প্রার্থনা ব্যক্ত। একটি সংস্কৃত শ্লোক ও তার কাব্যানুবাদ দেখা যাক—

মূল : গতে রাজ্যে কার্য্যে কুশলবিহিতবীর্য্যে পরিচিত
স্তবোদ্দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে কথমপি।
স্থিতা মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি মরিবাগো হরি হরি ''

অনুবাদ : ''কিবা রাজকার্য্যে কুশলবিহিতবীর্য্যে সকাল ফুরালো
তোমার দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে রহিয়াছি হে।
ওহে মূলাযোড়ে পরমকুশলে কাল হরিছি
বিবাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি।।''

মধ্যযুগের সাহিত্যে কোনো বড়ো কবির স্বকৃত সংস্কৃত কবিতার বাংলায় নিজকৃত কাব্যানুবাদ এই প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র।

ভারতচন্দ্র তাঁর পোষ্য কৃষ্ণচন্দ্রকে বসন্তকালে সংস্কৃতে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি সাতটি সংস্কৃত শ্লোকের সমষ্টি, এতে রাজার প্রতি আশীর্বচন এবং বসন্তবর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্র বাংলায় এরও কাব্যানুবাদ করেন। প্রথম দুটি শ্লোক এবং তাদের কাব্যানুবাদ দেখা যাক—

মূল : ''অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্ত্যং সবিশেষ নিবেদনম্ ১

মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ। স্মৃতবীর্য্যাং সূর্য্যাত্মজং কীর্তিপথে।
স্থিত্বা রাজপথালয়া ত্বাং ঢিবত্বা যতোহস্মানান্তে সমস্তং পুরস্তৎ।। ২।

অনুবাদ : ''অবশ্য প্রতিপাল্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণ।
নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদন ।১।।

শুন হে মহারাজ প্রতাপতপন আজ
ফুটিল সবসীমাঝে কীর্তিপঙ্কজ হে
আশীর্বাদ করি আমি হও পৃথিবীর স্বামী
বাক্‌লক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুনাল হে।। ২।।

বাংলা সাহিত্যের কোনো কবির সংস্কৃতে পত্ররচনা এবং বাংলায় তার কাব্যানুবাদের এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত।

উপরের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যযুগের শেষ ভারতচন্দ্রের মতো বড়ো কবি ও শব্দশিল্পী গোষ্ঠীয়তনা এবং দেবতাদের বাইরে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ও উপলব্ধিকেও কাব্যরূপ দিচ্ছেন এই *Subjectivity* বা মন্ময়তা এবং *Individuality* বা ব্যক্তিকতার সূত্রেই ভারতচন্দ্রের রচনা মধ্যযুগের প্রথাগত কাব্যবলয় থেকে সরে আধুনিক মানসিকতার দিগন্তে এসে দাঁড়িয়েছে

শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্য

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত বঃ শচীনন্দনঃ।

এই শচীনন্দন কৃষ্ণ সর্বদা সকলের হৃদয়ে ও সর্বত্রে সমভাবে আত্মস্বরূপে বর্তমান আছেন। অচৈতন্যবিষয়ে তাঁর এই প্রকাশকে অনুভব করা যায় না। কলিকালে চৈতন্যহীনতাই তার কারণ। সেই হেতু পূর্ণ সৌন্দর্য মাধুর্য দীপ্তিমন্ত হন। যে স্বরূপে এতকাল অনর্পিত ছিলেন অর্থাৎ কারও কাছে আত্মপ্রকাশ না করে গোপন ছিলেন। সেই উন্নতোজ্জ্বল রসস্বরূপ আপনাকে এবং আপনার প্রতি অভিনিবেশের প্রেমাঙ্কুর ভক্তিধারাকে করুণাবশে প্রকাশ করার জন্য শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তোমাদের হৃদয়ে সুপ্রকাশিত হোন।

কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনের ইতিবৃত্ত জীবনী বস্তুর উপজীব্য। আধুনিক কালে আমরা জীবনীগ্রন্থে সমকালীন যুগ ও জীবনের রূপায়ণ প্রত্যাশা করি, এইজন্যই বলা হয়েছে *Biography is the key to a society*। জীবনীকাব্য সমকালীন সমাজ জীবনে প্রবেশের চাবি কাঠি। অর্থাৎ জীবনীকাব্যের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ তার বাস্তবতা, ঐতিহাসিকতা ও জীবনীকারের সমাজ সচেতনতা। জীবনীকাব্য যাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হবে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি যথেষ্ট বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই এবং তাঁর জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে একটা ঐতিহাসিক পারম্পর্য থাকা দরকার। সর্বোপরি সমকালীন সমাজ জীবনের বিশ্বস্ত উপস্থিতি ঐ কাব্যে আমরা প্রত্যাশা করি।

কিন্তু চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি মধ্যযুগের ভক্তকবিদের দ্বারা বিরচিত, যাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন ভগবান স্বয়ং স্বশরীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদেরই পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে। একথা এযুগে বিশ্বাস করা কঠিন হলেও মধ্যযুগের লোকে তা সহজেই মেনে নিতেন। তাই পৌরাণিক চরিত্রগুলি অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদানে পূর্ণ হতে বাধা ছিল না। তাঁর জীবনের তথ্যগত বিশৃঙ্খলা সে যুগের মানুষকে কিছুমাত্র বিচলিত করত না। ইংরেজিতে তাই *Hagiography* অর্থাৎ 'সন্তজীবনী' কথাটি জীবনীকাব্যের এই শ্রেণীর রচনা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিকেও আধুনিক জীবনীকাব্য বা *Biography* না বলে *Hagiography* রূপে দেখলেই তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে। 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থের রচয়িতা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

বলেছেন আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আধুনিক যুগের লোকের মনোবৃত্তি নিয়ে মধ্যযুগের ঘটনা বুঝতে চেয়েছেন এটাই তাঁদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি

অবশ্য মানবিক মূল্য সম্বন্ধে স্বজ্ঞানিষ্ঠা থাকলে তবেই জীবনীকাব্য রচনার প্রেরণা আসে মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব সেই মূল্যবোধ জাগিয়েছিলেন বলেই তাঁর জীবনী আশ্রয়েই বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার সূচনা হয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

'পৃথিবীতে কোন এক ব্যক্তিকে অবলম্বন করে এত ভক্তির উচ্ছ্বাস এত ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বের এত নিকট স্পর্শ, অস্তিত্বের এত আলোড়ন কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলঙ্কার দর্শন ও বিবিধ রচনায় এমন আশ্চর্য মননশক্তি ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানে এমন আন্তরিক সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিনা সন্দেহ তাই চৈতন্যকেন্দ্রিক ষোড়শ শতকের এই চেতনাকে জাগরণকে চৈতন্য রেনেসাঁস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যচরিত সাহিত্য নিয়েই বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হয় চৈতন্য উদ্ভব বাংলা সাহিত্যে দেবতার একচেটিয়া আধিপত্যের স্থানে মানবমহিমা কীর্তন শুরু হয় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তথ্যানুসৃতি ও ইতিহাস চেতনার কিছুটা উন্মেষ লক্ষ্য করা যায় 'চৈতন্যচরিত' কাব্যগুলিতেই।

এক হিসাবে চৈতন্য জীবনীকাব্যের সূত্রপাত হয় শ্রীচৈতন্যের প্রকট কালেই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত কীর্তন সহচর পার্ষদবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় নানা রচনায় হাত দেন চৈতন্য সহপাঠী মুরারি গুপ্ত তাঁর চরিতকথা অবলম্বনে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' বা 'শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম' রচনা করেন চৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচল জীবনের প্রিয় সহচর স্বরূপ দামোদরও একখানি কড়চা গ্রন্থ লেখেন, কবি কর্ণপূর চৈতন্যকে নিয়ে 'চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম' 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম', 'শ্রী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' রচনা করেন এছাড়া রঘুনাথ দাস লেখেন 'গৌরাঙ্গ স্তবকল্পবৃক্ষ' প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত বাঙালি কবিগণ যথা নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গৌরাঙ্গের রূপ, গুণ তাঁর জীবনের নানা ঘটনা তাঁর পতিতোদ্ধার কাহিনী নিয়ে 'গৌরাঙ্গ' বিষয়ক প্রচুর পদ রচনা করেন এই সব পদের ঐতিহাসিকমূল্য অনস্বীকার্য পরবর্তীকালের জীবনীকারগণ চরিতগ্রন্থ রচনায় সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন অবলম্বন করেছেন তেমনি গৌরপদের শরণ নিয়েছেন। বাংলা ভাষাতে চৈতন্যকে আশ্রয় করে চৈতন্য সমকালীন দুএকখানি কড়চা গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, স্বরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চায় বঙ্গানুবাদ (স্বরূপকৃত) গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' প্রভৃতি।

ওড়িয়া ভাষায় একাধিক চৈতন্য জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে—যেমন ঈশ্বর দাসের

শ্রীচৈতন্য ভাগবত (সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষে রচিত) মাধব পট্টনায়েকের 'বৈষ্ণব লীলামৃত' প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য প্রথম (?) রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। **চৈতন্যভাগবত**, লোচনদাস ও জয়দেবের **চৈতন্যমঙ্গল** নামে দু'খানি কাব্যের নাম এই সঙ্গে করতে হয় কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত** কাব্যখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনারূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবনকে চরিতকারগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এই সেইভাবেই জীবনীকাব্যে — তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে এঁকেছেন। কোন কোন চরিতকার যেমন— চৈতন্য ভাগবত 'চৈতন্য কীর্তন' রূপেই রচিত এটি গেয় কাব্য — লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও সেই উদ্দেশ্যেই লেখা এবং পাঠকগণ লোচনদাসের কবি কল্পনার তুলিতে গৌরাঙ্গ জীবনলীলার চিত্রপটটি এখানে আঁকা। কোন কোন চরিতকার যেমন, চৈতন্য চরিতামৃত — শ্রীচৈতন্যের জীবনীর সূত্র অবলম্বনে গৌড়ীয়, বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের মূল প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক বিরচিত তাই চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গের মানবরূপটি যতখানি প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে তা হয়নি সেখানে চৈতন্যের ভাগবত স্বরূপের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বৃন্দাবন দাসের মনে চৈতন্যের দেবত্ব সম্পর্কে সংশয় না থাকলেও তিনি যেহেতু চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দমুখে চৈতন্যচরিতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাই শিশু ও বালক নিমাই-এর দুরন্তপনা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর গার্হস্থ্যজীবন কীর্তন লীলা, বঙ্গদেশ পর্যটন ও সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা কতকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মানবোচিত করেই বৃন্দাবন তাঁর চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করেছেন স্থানে স্থানে অলৌকিকতা থাকলেও মোটের উপর তাঁর বর্ণনা বাস্তব ভিত্তিক। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে চৈতন্য সমকালীক নবদ্বীপের ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক পটভূমিকার যে পরিচয় দিয়েছেন তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন

ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দেবতা জানেন সর্পে চণ্ডী বিষহরি।
তাও যে পূজেন কেহ মহাদম্ভ করি।।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।।

আসলে বৃন্দাবন দাস ভক্ত হলেও চৈতন্যচরিত চিত্রণে জীবনীকারের ভূমিকাটি তিনি অনেকখানি পালন করেছেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভূমিকাটি শুধুমাত্র চরিতকারের ভূমিকা নয় অনেকটা আচার্যের ভূমিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবক্তা চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচার্যরূপে গ্রন্থাদি রচনা করে বঙ্গ তথা ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেননি সে অবস্থা বা মনোভাব কোনওটাই তাঁর ছিল না — বৈষ্ণবদর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যেরা — কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাঁদের গুরুরূপে বরণ

করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থাদি সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় সেই সব গ্রন্থের সার সংকলন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই আশ্চর্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এ গ্রন্থ চরিত এবং অমৃত অর্থাৎ তত্ত্ব কথার একত্র সমাহার। কৃষ্ণদাস জানতেন শ্রীচৈতন্যদেবের মতো মহাপুরুষের জীবনে তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বের মূল্য কত বেশী। মহাপ্রভুর মতো মানুষের জীবনচরিত তাই শুধুমাত্র জীবনের তথ্যপঞ্জী নয়। তাঁর অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনই চরিতকারদের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবার শুধু একা চৈতন্যদেবকে আঁকলেই চলবে না। তাঁর সাক্ষাৎ পরিকরদের পরিচয়ও তুলে ধরতে হবে এই জীবনীকারেরা। তাই চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকারেরা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরদের ব্রহ্মা হরিদাস, দেবানন্দ দাস, রূপসনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি চৈতন্য ভক্তবৃন্দের কথাও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ফলে চৈতন্য ভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থরূপে চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্যজীবনীকাব্য হিসাবে বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের তথা রসিক পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার কথা যেমন সবিস্তারে জানা যায়, চৈতন্য চরিতামৃতে তেমনি তাঁর নীলাচল লীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। অধিকন্তু চৈতন্য অবতারের মুখ্য কারণ, তাঁর রসাস্বাদ, তাঁর উপদেশ, সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিক্ষাশ্লোকাষ্টক প্রভৃতির ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব দর্শনের মর্যাদা লাভের উপযোগী এই গ্রন্থখানি রচনা করে কৃষ্ণদাস আমাদের মহৎ উপকার সাধন করেছেন। কিন্তু জীবনীকারের মধ্যে জীবনীকারেরই বলছি, কতটা পালন করেছেন কিনা

জীবনীগ্রন্থকার চৈতন্য চরিতামৃতেরও অসম্পূর্ণতা আছে। চৈতন্য তিরোভাব সম্পর্কে তাঁর নীরবতার কারণ যাই হোক না কেন জীবনীকারের পরিসমাপ্তি তিনি যেভাবে ঘটিয়েছেন আমরা তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যের মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণীরূপে গ্রন্থশেষে তাঁর শিক্ষাশ্লোকাষ্টককে উপস্থিত করে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব ধর্মের সারকথাটি সকলকে শোনাতে চেয়েছেন কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর অন্তিম দশার কথা বলার দায় এড়িয়ে গেছেন — অথচ শচীনন্দন মানবরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আটচল্লিশ বৎসর মানব লীলাই করে গেছেন। সুতরাং তাঁর তিরোভাব মানবোচিতই হয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। যেমন হয়েছিল কৃষ্ণ বুদ্ধ খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহামানবদের। তাঁরাও মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও মানবোচিত লীলাসংবরণ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে লোচনদাস ও জয়ানন্দ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, তবে লোচনের উল্লেখে কিছু অলৌকিকতার আভাস আছে, জয়ানন্দ এ বিষয়ে বাস্তবধর্মী এবং তাঁর সাক্ষ্য ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গৃহীত হতে পারে। তাঁর বর্ণনানুসারে রথের আগে নৃত্যকালে প্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাত লাগে এবং তার ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিরোভাবের পর তাঁর মরদেহ — 'মায়াশরীর থাকিল ভূমে পড়ি' কিন্তু তার শেষ পরিণতি কি হল এ বিষয়ে বাস্তব বর্ণনা জয়ানন্দতেও মেলে না। এ ব্যাপারে শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া জীবনীকারেরা বরং কিছু তথ্য দিয়েছেন। ওড়িয়া ভাষায় 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা ঈশ্বর দাস যা লিখেছেন তাতেও অলৌকিকতার আভাস আছে কিন্তু মাধব পট্টনায়কের

বৈষ্ণবলীলামৃতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য তিনি লিখেছেন

একদিনরে নৃত্যকলা উদাস ভাব ন ছাড়িলা
গোল করতাল সহিত পাদ চলই অবিরত
কাট ইটে পড়িথিলা, তহিকি দৃষ্টিতা ন থিলা ।
বাজিল বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি কধির ঝরিলা নিকিটি
পাদ বজ্রাই খোড়ি হেলা গলবাজি তলে পড়িলা

এর অর্থ একদিন উদ্দাম ভাবে (শ্রীচৈতন্য) নৃত্য করছিলেন, খোল করতালের সঙ্গে পা যেভাবে চলেছিলেন তিনি সম্মুখে ইট পড়েছিল তিনি দেখেন নি, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে জোর আঘাত পেলেন আর ক্ষত স্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হোল গলায় শব্দ করে তিনি পা মুড়ে পড়ে গেলেন। ইত্যাদি।

এর পর মাধব যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে জানা যায় ঐ আঘাত থেকে চৈতন্যের পায়ে জ্বর দেখা দেয় পা ফুলে ওঠে ক্রমে জ্বালা পা ডুবিয়ে একটু আরাম পেলেও ক্রমে তার সব শরীর ফুলে যায়, জ্বর আরও বাড়তে থাকে চন্দন যাত্রার পূর্বে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ব্রহ্মমুহূর্তে তিনি দেহত্যাগ করেন (দিনটা ছিল ১৫৩৩ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রিল রবিবার)

লোচন দাস ও জয়ানন্দ সুতরাং ঐ একই দিনের কথা বলেছেন তবে স্থান ও কাল সম্পর্কে তাঁদের মতের পার্থক্য আছে লোচন বলেন বেলা তৃতীয় প্রহরে, জয়ানন্দ দশ দণ্ডরাতে তবে তাদের দুজনের সঙ্গে মাধবের বর্ণনার সঙ্গে বড়ো পার্থক্য প্রভুর পার্থিব লীলাসংবরণ সম্পর্কে জয়ানন্দের বর্ণনা থেকে মনে হয়, টোটা গোপীনাথের মন্দিরেই তাঁর দেহের সমাধি দেওয়া হয়। লোচনদাস বলেন গুণ্ডিচা মন্দিরেই প্রভুর দেহ সমাহিত হয়। আর মাধব পট্টনায়কের মত—

মন্দিরে মরা গলা প্রভু এহাকু এ যে পোতাইবু ।
কোইলী বৈকুণ্ঠে নব নেই পোতাইলে গাত খোলাই
এ থা ন জানে আন কেহি। পড়িলা দু-আথ ফিটাই

অর্থাৎ প্রভুর মৃত্যু এখানেই (মন্দিরে) হয়েছে তাঁর মরদেহ এখানেই সমাহিত করবো। দেহ কোইলী বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়া হোল ওখানে গর্ত খোঁড়া হোল। রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস আর জন দুই সেবক মরদেহ প্রোথিত করলো। এ কথা আর কেউ জানলেন না এরপর বন্ধ রাখা সিংহদরজা খুলে দেওয়া হল প্রভুর মৃত্যু ও তাঁর দেহ সমাহিত করার কাল পর্বে মন্দিরের সিংহদরজা বন্ধ রাখা হয়েছিল

মাধব কথিত 'কোইলী বৈকুণ্ঠ' বা 'কৈবল্য বৈকুণ্ঠে' জগন্নাথ দেবের জীর্ণ দারুমূর্তি সমাহিত করা নীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিপালিত হয়ে আসছে, সেখানে শ্রীচৈতন্যের মরদেহ যদি প্রোথিত হয়ে থাকে তবে রাজা প্রতাপরুদ্র আর রায় রামানন্দ যে তাঁকে প্রায় শ্রীজগন্নাথের স্তরে উন্নীত করে দুর্লভ সম্মান দিয়েছেন একথা স্বীকার করতেই হবে। আর তাছাড়া এই প্রক্রিয়াকে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দেবের দারুবিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়া বলে

(এ প্রভু সে প্রভুরে লীন') বর্ণনা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। এই বিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়ার কথাই বলেছেন উৎকলীয় লেখক অচ্যুত, দিবাকর আর ঈশ্বর দাস। অবশ্য ঈশ্বরদাস চৈতন্যের মরদেহ সম্পর্কে কিছু গোপন তথ্যও প্রকাশ করেছেন তার চৈতন্যভাগবতে। তিনি লিখেছেন—

শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞাপাই অন্তর্ধান লেলে শব বহি,
গঙ্গারে ফেলি দেলে শব সে শব হোইলাক ভাসি ,
চৈতন্যরূপ প্রকাশিলে গঙ্গারে লীন হোই গেলে

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর চৈতন্য প্রভুর শব অন্তর্ধানকে বহন করে গঙ্গাজলাঙ্গি (পুরী থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচী নদীতে) ভাসিয়ে দেওয়া হয় শ্রী জগন্নাথ দেবেরই নির্দেশে পরে ঐ দেহ জীবন্ত হয়ে গঙ্গায় লীন হয়। চৈতন্য তিরোভাবের কাল ঈশ্বরদাসের মতানুসারে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অন্যদের মত রথযাত্রার পর তৃতীয়ার দিন চন্দন যাত্রা উৎসবের দিন।

'শ্রীচৈতন্য তিরোধান রহস্য নিয়ে নানাজনে উৎকট ধরনের গবেষণা করেছেন, কেউ কেউ তাঁর গুপ্ত হত্যার কথাও বলেছেন—চৈতন্য পরিকরেরা চৈতন্য তিরোভাবের সত্য ঘটনা জানতেন—তাঁদের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজও সে সব কথা অবশ্যই শুনেছিলেন। মর্মান্তিক দুঃখ পেলেও জীবনীকারেরা তিনি কেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন উল্লেখ রেখে গেলেন না সেটাই আমাদের তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। তিনি যদি তা করতেন তাহলে চৈতন্যের তিরোভাব নিয়ে গবেষকদের কষ্ট কল্পনা ও উৎকট সন্দেহ আজ কোন গুরুত্বই স্থান পেতো না। তাঁর চরিতামৃতও সুসম্পূর্ণ জীবনী গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারতো।'

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে 'ধুয়া' গান

নির্মলেন্দু ভৌমিক

...১.

'ধুয়া' গান : পরিচয় ও সাধারণ বক্তব্য

'ধুয়া' গান বা ধুয়া পদ সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। মূলত এটি মধ্যযুগীয় বাঙলা আখ্যানকাব্য পাঁচালি প্রভৃতির উপস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একটি সাহিত্যিক কৌশল। ধুয়া একটি তদ্ভব শব্দ। সংস্কৃত ধ্রুবক > ধ্রুবা > ধুয়া— এই ভাবে এটির উদ্ভব ঘটেছে। অন্য ভাবেও এটির বিবর্তন দেখানো যায়। সং ধ্রুবক > প্রা ধুअअ > ধুअ ধুঅ ধুয়া। সংস্কৃতে 'ধ্রু' মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি ও পালাগানে দোহারের (< ধ্রুবকার) যে পদ বা শ্লোক বারবার গেয়। ধুয়া বলা হলে প্রথম পদ বা কলি গাওয়া। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রেমের গানের (সং ১৬, গী বি) প্রথম কলি হল— 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়া দেবো কে রে তুই'।

মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে ধুয়া ধ্রুবপদের অবস্থান এক। অন্যত্র সর্বত্রই এক বা অভিন্ন হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা যাচ্ছে, পদের দ্বিতীয় কলিতে ধুয়া বা প্রয়োগ হচ্ছে এবং তা তিন পঙ্‌ক্তিরূপে গঠিত। অপূর্ব ত্রিপদী ছন্দে, আঞ্চলিক ভাষে কবিতা সেই ধুয়াকে 'ঝুমুর' বলা হচ্ছে। কিন্তু আখ্যান কাব্যগুলিতে ধুয়ার অবস্থান পদের প্রারম্ভে এবং সাধারণভাবে তার বিস্তার দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে। ক্রমে এই ধুয়া ধ্রুবপদ দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির বদলে গোটা একটা গানেই পরিচিত হয়েছে।

আখ্যান কাব্যগুলির আখ্যানের পটভূমিকায় ধুয়াগুলি সাধারণভাবে কবিদের নিজস্ব *Interpretation*। কখনো বা এগুলি গায়কদের সংযোজনা। গায়কদের যোজনাই বেশী। কেননা উপস্থাপনা শিল্পটিকে জমা ও মনোহারী করবার জন্যই এগুলির প্রয়োগ হত। মুদ্রিত আখ্যান কাব্যগুলি দেখলে আজ সহসা বোঝবার উপায় নেই, সেগুলি কবিদের না গায়কদের দৃষ্টি। তবে পারিপার্শ্বিক নানা কারণ বিচার করলে সেগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনুমান করা যায়। আখ্যানের সেই বিশেষ অংশটি কোন দৃষ্টিতে বিচার্য অথবা তার রস গ্রহণীয়—বা কোন বিশেষ ভাবাবেগ এটির পেছনে ক্রিয়াশীল, এ সবই ধুয়া গানের মধ্যে মেলে। মধ্যযুগের বঙ্গীয় আখ্যানকাব্য ছিল মূলত *Objective*, কিন্তু এই ধুয়াপদগুলি ছিল কবিদের (গায়কদের) *Subjective* বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভব উপলব্ধির দিক। বাঙলা সাহিত্যে কবিদের প্রাচীনতম এবং প্রথমতম ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতি প্রকাশের স্থল হল এই ধুয়াগুলি। আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার প্রাচীন ও দেশীয় উৎস বলতে এই নাম পদগুলিকেই নির্দেশ করতে হয়।

শ্রীচৈতন্য দেবের অবদান এক্ষেত্রে সর্বাধিক। রাধা বিরহ ভাবকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে ধারণ করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিই শেষে 'গৌরচন্দ্রিকা' রূপে প্রবর্তিত হয়। গৌরচন্দ্রিকা যেমন কোনো বিশেষ পর্যায়ের পদাবলীর ভূমিকা হয়েছে, তেমনি সেই রীতি-দ্বারা আখ্যানকাব্যের কবি গায়কগণও প্রভাবিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের ভূমিকা রূপে ধুয়াগানের প্রয়োগ করেছেন।

পদের দ্বিতীয় কলিতে তিন পঙক্তিতে ধুয়া ছাড়াও দুই পঙক্তির আয়তনে পদের প্রথমেও বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ধুয়ার যোজনা করেছেন। অবশ্য এই দুই রীতিরই ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। কবিদের সম্বোধন, প্রশ্ন, বিস্ময়, আবেগ এই ধুয়াগুলির মূল লক্ষ্য। এই রীতির জের আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে এবং চৈতন্য জীবনীমূলক কাব্যেও টানা হয়েছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্য এবং চৈতন্যদেবই যে ধুয়া গানের প্রবর্তনের অন্যতম উৎস বা কারণ, তার এক প্রমাণ হল কবি কঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর সামান্য পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধব 'ধুয়া'কে 'বিষ্ণুপদ' আখ্যা দিয়েছিলেন। যদিও ধুয়া এই অভিধা তখন পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। যদিও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে ধুয়া পদের কোনো প্রয়োগ নেই। অতএব প্রমাণ হল — আখ্যান কাব্যেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের ধুয়া পদে বৈষ্ণবী ভাবের প্রভাব দেখা যায়। যাই হোক, সম্ভবত জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকে ধুয়াপদের প্রবর্তন ঘটেছে। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে দেখা গেছে মনসা বা ধর্ম মঙ্গলে ধুয়া পদের ব্যবহার খুবই কম, চণ্ডীমঙ্গলে সেই তুলনায় বেশী। চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবি — মুকুন্দ এবং ভারতচন্দ্র ধুয়া পদ রচনা এবং প্রয়োগে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। মধ্যযুগের অপর প্রখ্যাত মুসলমান কবি দৌলত কাজীর নামও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বা উত্তরবঙ্গের মনসা মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি জগজীবন ঘোষালের 'মনসা পুরাণ' এ ধুয়াপদের ব্যবহার একেবারেই নেই।

সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পড়বার জন্য রচিত হয়। কিন্তু এতেও বাগ্‌প্রিত পদ ধুয়া রূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

এইভাবে, মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের ধুয়াপদের একটি সাধারণ পরিচয় এখানে তুলে ধরা গেল। এবার এই পটভূমিকায় আলোচ্য প্রসঙ্গটির বিস্তৃত ও বিশদতর পরিচয় দিই এবং কাব্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রসঙ্গটির কী পরিণতি ঘটেছে, তার ইতিহাস ব্যক্ত করছি।

...২...

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ধুয়াপদ

বৈষ্ণব পদাবলীতে দ্বিতীয় রাগিটি ধুয়ারূপে চিহ্নিত হয়েছে (পরবর্তী কালে এই ধুয়া 'ঝুমুর' নামে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই গৃহীত হয়েছে)। দ্বিতীয় কলিটিকে ধুয়া রূপে

উপমেয়ের রীতি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ ও [illegible] গ্রন্থ—সেখানে তা ধ্রুবম নামে উল্লিখিত কিন্তু এই ধ্রুবম এক পঙ্‌ক্তির বৈষ্ণব পদাবলীর মতো তিন পঙ্‌ক্তির নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধুয়া পদ প্রসঙ্গে দুটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, বড়ু দুটি পদের মধ্যখানে সংস্কৃত স্ব-রচিত শ্লোক দিয়েছেন, যা ধুয়া নয় কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে সেগুলি ধুয়ার ভূমিকা পালন করেছে। ধুয়া নয় বলেই এগুলির (অর্থাৎ স্ব-রচিত শ্লোকগুলির) সঙ্গে স্বভাবতই ধুয়া গানের কথা উল্লিখিত হয়নি। এগুলি যোজনার উদ্দেশ্য হল কাহিনী যেই ধরা কাজেই এগুলি হল সংযোজক। ভাবের দিক থেকে দুটি ভাবের সংযোজক। এখানেই এসেছে শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবের প্রতিফলন যা ধুয়াগুলি একটি বিশেষত্ব। দ্বিতীয় কথা এই অধ্যাপক ড. সুকুমার দাস তাঁর বিশিষ্ট গবেষণা (বাঙালি প্রবন্ধ অক্টোবর ২০০৩) 'কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপ ও স্বরূপ' প্রবন্ধে বিস্তৃত গবেষণায় প্রমাণিত করেছেন বড়ুর কাব্য গীত হবার জন্য লিখিত হয়নি। পরবর্তী গায়কেরা ওই কাব্যের গীত রূপ দেন এবং তখনই গায়কেরা তাতে ধুয়ার যোজনা করেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ধুয়াগানগুলি বড়ুর নিজের রচনা নয়। পালাবদলের গায়কেরাই রচনা ও যোজনা এবং সেই কারণেই অধ্যাপক দাসের এই অনুমান মূল পদের সঙ্গেও ধুয়াগানগুলির প্রসঙ্গত সঙ্গতি এবং ছন্দগত সঙ্গতি নেই। আমরা অধ্যাপক দাসের এই অনুমানি অনুমোদন করি এ কারণেই যে ওই গীত সম্পর্ক মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে ও সহ এবং তমসত্তা বা কৃষ্ণকীর্তন প্রবন্ধেই তা সূচনা হয়ে গেছে। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের পর্যবেক্ষণ করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি এই ধরনের ধুয়া নামের ধারা নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়বে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী রচনা চর্যাপদের ধুয়ার কথা এখানে স্বভাবতই ওঠে। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন যেহেতু বৈষ্ণব পদাবলীর অনেক ধুয়া ত্রিপদীছন্দে বদ্ধ হয়ে থাকে অতএব চর্যাপদের যে যে অংশ ত্রিপদী ছন্দে সজ্জিত করা যায় সেই সেই অংশ ধুয়াগানের আদি উৎস। এই বলে তিনি ২৮ সংখ্যক চর্যার বিশেষ একটি অংশকে ত্রিপদী ছন্দে পুনর্বিন্যাস করে তাকেই ধুয়া বলেছেন

মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিন মাবরী
গিবত গুঞ্জরী মালী।।

অধ্যাপক বসুর এই মন্তব্য পড়লে সহজেই মনে হয় ধুয়া বলতে আমরা যে বিষয় প্রসঙ্গটিকে বোঝাতে চাইছি তাঁর ধারণা তা থেকে ভিন্ন।

...৩...

পদাবলী ও চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যে ধুয়া পদ

আগেই বলেছি, বৈষ্ণব পদাবলীতে গীত গোবিন্দের অনুসরণে প্রথম পদের

অব্যবহিত পরেই ধুয়া ব্যবহৃত হয়েছে এই ধুয়া সচরাচর তিন পঙ্‌ক্তির, তবে ব্যতিক্রমও আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থের দিক থেকে সেগুলি হয় সম্বোধন মূলক, নয়তো প্রশ্নবোধক। গোবিন্দ দাসের পদ থেকে এর উদাহরণ দিই

ক. পদের আরম্ভেই ধুয়া :

শুন শুন মাধব কেন কলাকুঠী সেয়।

প্রেম হেম গাহি আপন রঙ্গ দেই

এ হেন সাজাওলি তোয় ধ্রু। শ্রীপদামৃত মাধুরী/পৃ ১৮৪

(তোমার প্রেম রূপ সুবর্ণ গ্রহণ (গাহি') করে তার পরিবর্তে নিজের রঙ্গ (মজমুলোর ধাতু বা প্রভা) দিয়ে তোমাকে এমন করে সাজাল কে? —খণ্ডিতা)

খ. পদের দ্বিতীয় স্তবকে ধুয়া :

হরি ঘরে হরিখে বদিয়ে রস বাদর

সাদরে পুছয়ে বাত।

নিবাষ বদন তোরি, আকুল সো হরি

নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত।

মানিনি! কিয়ে কঠিন তুয়া মান

ছলে বলে দিবি জলে তোহে কত সাধল

পাপটি না হেরলি কান। ধ্রু ঐ পৃ ২৬৫

[সখির উক্তি। কলহান্তরিতা শ্রীকৃষ্ণ যখন হরিভাব রসের বাদল সৃষ্টি করেন, তখন কতো আদরে তোমাকে নানা প্রশ্ন করেন সেই হরি আজ তোমার মুখপানে চেয়ে আকুলা হয়েছেন এবং তোমার হাত নিয়ে নিজ মস্তকে স্থাপন করেছেন (সাক্ষাৎ করবার ছলে) ....]

চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি সব বৈষ্ণব কবিই এই দু ভাবে ধুয়ার প্রয়োগ করেছেন হয় একেবারে পদের প্রথমেই, নয়তো দ্বিতীয় স্তবকরূপে। ধুয়া সর্বত্রই তিন পঙ্‌ক্তির এবং তা সম্বোধন, প্রশ্ন বা বিস্ময়বোধক বাক্যরূপে প্রযুক্ত এমন কি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' এ যখন কোনো রাগাশ্রিত গান দিয়েছেন (মধ্যলীলা। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ), তখন তিনিও এই রীতি মান্য করেছেন :

আনোর সে অনাগমন আমার মন বৃন্দাবন

মনে মনে এক করি জানি।

তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়

তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি।

প্রাণনাথ মোর সত্য নিবেদন।

ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম,

না পাইলে না রহে জীবন।। ধ্রু।।

আমি এখনো নিশ্চিত নই, তবে মনে হয় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকেই সম্ভবত মধ্যলীলার বিশেষত্বপূর্ণ ধুয়ার ব্যবহার আরম্ভ হয়ে থাকে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও ধুয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমে বৃন্দাবন দাসের ধুয়ার পরিচয় দিই। বৃন্দাবন দু রকমের ধুয়ার ব্যবহার করেছেন তিন পঙ্‌ক্তির এবং দুই পঙ্‌ক্তির। মনে হয়, তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া নীতি বৈষ্ণবপদাবলীর ধারার অনুগত। আর দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়া পাঁচালী কাব্যের ধারার অনুগত। দৃষ্টান্ত এই :

ক. তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া। এগুলিকে অপূর্ণ ত্রিপদী বলা যায় :

কি আরে রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে

ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর,

আনন্দে দেখিছে।। ধ্রু।।

[ধ্রুবাংশ। চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড। রাম = বলরাম, গোপাল = শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বৃন্দাবন দাস বলছেন]

খ. তিন স্তবকের ধুয়া গানের দ্বিতীয় স্তবক অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে :

জিনিঞা রবিকর, অঙ্গ মনোহর,

নয়নে দেখই না পারি

আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম

চৈতন্য লহিক নিছনি। ধ্রু। [প্রথম স্তবক]

হে মাই! হে মাই! দেখত গৌরাঙ্গ চন্দ্র।

নদীয়াক লোক— শোক সব নাশম,

দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ।।

[ভাবাভাস লক্ষণীয়। নিম্নের ধারণা। আদিখণ্ড।]

গ. অপূর্ণ ত্রিপদীতে ভাবিয়ারা রাগে :

[illegible] নন্দন নাচে রঙ্গে

বিহ্বলা হৈলা সব পারিষদ সঙ্গে।

হরি রাম রাম রাম।। ধ্রু।।

[মধ্যখণ্ড। অষ্টম অধ্যায়।]

ঘ. দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়া। পয়ার ছন্দের একপদী :

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।

দশ দিনে উঠিলা আনন্দ।। ধ্রু।।

ঙ. দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাভূত হওয়ার পর ভক্তের উল্লাস। বর্ণনার মাঝখানে স্থাপিত

হরি হরি বোল বোলা পর নাচে বাহু তুলি।

ভকতগণ বান্ধল কদলী বলে বলি। ধ্রু।

[ধ্রুবাংশ। আদি খণ্ড, নবম অধ্যায়।]

চ. পণ্ডরীক-বাদাধর শিষ্যদের পর উল্লাস

নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি

অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি ধ্রু।।

[মধ্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায় অসাধনে = সাধন ভজন ব্যতীতই। চিন্তামণি = এখানে চৈতন্যদেব মানুষের হাতে বিধি এই চিন্তামণিকে সাধন ভজন ব্যতীতই তুলে দিলেন

ছ গৌর এ নবীন মঙ্গল।

ধন্য স্থিতি, ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল ধ্রু

[মধ্যখণ্ড শ্রীধর বরলাভ বর্ণন নামে নবম অধ্যায়]

জ. গৌরনিধি কপটসন্ন্যাসিবেশ ধারী।

অখিল-ভুবন-অধিকারী।। ধ্রু।।

[শ্রীচৈতন্যের কোনো মায়াবন্ধন নেই। তাছাড়া তিনিই শ্রীকৃষ্ণ কাজেই তাঁর দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য কোনো উপাসনারই দরকার নেই এজন্যই তাঁকে 'কপটসন্ন্যাসীবেশধারী' বলা হয়েছে মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর সন্ন্যাস নেবার প্রয়োজন নেই।]

ঝ. মোর মোর বঁধুয়া

গৌর গুণনিধিয়া।। ধ্রু।।

[ভাষা সঙ্গীত মধ্যখণ্ড মহা মহাপ্রকাশবর্ণন নামে দশম অধ্যায়]

অতঃপর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধুয়ার ব্যবহারের কথা বলি বড়ুচণ্ডীদাস যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই পদের মধ্যবর্তী এক পদের প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকের যোজনা করে ধুয়ার পরিবর্তে পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তেমনি দুটি রীতির অবলম্বন করেছিলেন এক পরিস্থিতি ও বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সমতা-সাদৃশ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিভিন্ন বৈষ্ণব পুরাণ গ্রন্থ থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যা 'তথাহি গ্রন্থকারস্য' বলে নিজের রচিত সংস্কৃত শ্লোক যোজনা করেছেন এই দুই রীতির মধ্যেই স্বয়ং কৃষ্ণদাসের নিজস্ব ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণটি খুবই উদ্ভাসিত বটে তবে দ্বিতীয় রীতিটিরই মধ্যে তা বেশি পরিমাণে দেখা যায় কী করে Objective বিষয় পরিস্থিতিকে Subjective করে নেওয়া যায় এগুলি তারই নিদর্শন। এছাড়াও কৃষ্ণদাস তৃতীয় আর একটি রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাকে খাঁটি ধুয়াই বলা যায় যেমন মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে 'তথাহি পদম্' বলে তিনি দুই পঙ্‌ক্তির একটি ধুয়ার উল্লেখ করেছেন এবং এটি যে ধুয়াই, নিজেই তার উল্লেখ করেছেন

তথাহি পদম্

সেই সেই ত পরাণনাথ পাইনু

যাহালাগি মদন-দহনে দহি গেনু।

এই ধুয়া-গানে নাচেন দুই ত প্রহর।

কৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাই এ ভাব অন্তর

এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।

সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক।।

এই একই রকম ভাবে, বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তার পদকে চৈতন্য দেবের মানস-প্রকাশক ধুয়া রূপে কৃষ্ণদাস ব্যবহার করেছেন যেমন,

ক. তথাহি পদম্—

কি কহব রে সখি, আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।। ধ্রু।।
এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন।
স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জন মধ্যলীলা। ৩য় পরিঃ

খ তথাহি পদম্—

হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ধ্রু।
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতর।।

এখানে লক্ষ করলাম নিশ্চয় হল ক পদম বলতে কৃষ্ণদাস প্রথমের রচিত গানকে বুঝিয়েছেন যা ধুয়া রূপে গীত হয়েছে। ধুয়া এখানে গানের ধুয়া নয়, অর্থ প্রসঙ্গ-পরিস্থিতির প্রকাশক একটি সাহিত্যিক দিক। সংগীত, বিস্ময়, ভাবাবেগ প্রভৃতি দিক এখানে মূল লক্ষ্য। তা ব্যক্ত করতেই এই শৈলীর আশ্রয় নেওয়া। এই সব ক্ষেত্রে যে ভাষাগত বিশেষত্বের সৃষ্টি হয়েছে — তা পূর্ণমাত্রায় Stylistics বা শৈলীবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রধান দিক।

...৪...

মঙ্গলকাব্যে ধুয়াপদ

চৈতন্য পরবর্তী বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্যে ধুয়া পদের ব্যবহার বিস্তৃততর হয়েছে। চৈতন্য দেবের ভাবাবেগময় জীবন ব্যক্ত করিবার মনেও অনুরাগ বেদনার ভাব সৃষ্টিও করেছিল। সে কারণেই প্রাকচৈতন্য যুগের তুলনায় চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্যে ধুয়া পদ এত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের ভাবাবেগের আবেগকে অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবিদল যেখানে নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগে পরিণত করে নিতে পেরেছেন এবং নিজ নিজ কাব্যে, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে তা প্রয়োগ করতে পেরেছেন, সেখানেই ধুয়াপদ একটি সাহিত্য শিল্প হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সাহিত্যাবেগ শেষে বাঙলা গীতিকাব্যের উৎসরূপে কাব্য কাব্যে মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের দুই সেরা কবি—মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্র—এই দুজনের ধুয়াগানের বিশদ আলোচনা করলেই এই বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করা যাবে। দেবী মঙ্গল, মনসা ও ধর্মমঙ্গলের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলে ধুয়া পদের

প্রয়োগের পরিমাণ অধিক। এর মূল কারণ, মনসা বা ধর্মের তুলনায় চণ্ডী শিল্পতর দেবী কাজেই তাঁকে কেন্দ্র করে আবেগের উৎসারণ সহজতর হয়েছে, চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই ভাবাবেগকে তীক্ষ্ণতর ও ব্যাপকতর করেছে। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য এবং তাঁর পরবর্তী কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ধুয়াগানকে যে স্তরে পৌঁছে দিলেন — ভারতচন্দ্র এসে সেটাই পূর্ণতর হয়ে গেটা এক-একটি গান বা কবিতায় রূপ নিল। ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কাব্যে একশ' বছর কোনো কবি নেই — সবাই কবিওয়ালা। এই কবিওয়ালাদের কেউ কেউ যে শ্রেষ্ঠত্বের নীতিকবিতা রচনা করেছিলেন — তা ভারতচন্দ্রেরই উত্তরাধিকার রূপে, — যে ভারতচন্দ্র আবার তা অর্জন করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী ধারার ফল থেকেই। ক্রমেই দেখা যাবে, এক একজন কবি এসেছেন বিশেষত মুকুন্দ ভারতচন্দ্রের মতো শক্তিধর কবিগণ—তাঁরাই পূর্ববর্তী ধারা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজ নিজ প্রতিভা মিশিয়ে এক-পা এক-পা করে ওই ধুয়াগান ও গানকে নীতিকাব্যের স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দের বিষ্ণুপদ নামকরণের মধ্যে কেবল বৈষ্ণবতার আক্ষরিক প্রতিধ্বনিই নেই, 'বিষ্ণুপদ'গুলি যেন 'গৌরচন্দ্রিকা'র নামান্তর হয়ে উঠেছে। এই নিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল, মুকুন্দ 'বিষ্ণুপদ' নাম ব্যবহার করেন নি। কালকেতুর উপাখ্যানে একবার মাত্র কবি পয়ারপদকে 'ধুয়া' নামে উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুপদ অভিধা নেই বলেই যে মুকুন্দের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব নেই, একথাও বলা যায় না। আমার নিজের গণনায় কালকেতুর উপাখ্যানে 'অপূর্ণ ত্রিপদী' ছন্দে মোট আঠারোটি ধুয়াবৎ পদ আছে। অবশ্য তার মধ্যে একটি সন্দেহজনক। আমার মতে, 'অপূর্ণ ত্রিপদী'তে রচিত ধুয়াবৎ পদগুলি সাক্ষাৎভাবে বৈষ্ণবতার ফল — ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যা লক্ষ্য করেন নি।

অপূর্ণ ত্রিপদীতে কালকেতুর উপাখ্যানে যে ধুয়াবৎ পদগুলি আছে তা এই — ১ 'শুকদেব বন্দনা'র আরম্ভে, ২ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের আরম্ভে, ৩ গৌরীর রূপ বর্ণনার প্রারম্ভে, ৪ নারদাগমনের প্রারম্ভে, ৫ নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ অংশের প্রারম্ভে, ৬ সাধভক্ষণ এর প্রারম্ভে, ৭ কালকেতুর বালক্রীড়া অংশের প্রথমে, ৮ চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ নিবেদন এর প্রথমে, ৯ চণ্ডীর পরিচয় দান অংশের দ্বিতীয় স্তবকে, ১০ ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর রূপবর্ণনা অংশের প্রথমে, ১১ বনে বাঘ্রভীতি অংশের প্রথমে, ১২ বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু অংশের প্রথমে, ১৩ রাজ সমীপে হস্তিবিয়াগানল আবেদন অংশের প্রথমে, ১৪ কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ অংশের প্রথমে, ১৫ কালকেতুর খেদ-অংশের প্রারম্ভে, ১৬ গুজরাট আগমনোৎসব অংশের প্রথমে, ১৭ ভাঁড়ুর প্রতিভাকের প্রথমে।

আর দুই পঙ্‌ক্তির পয়ারধর্মী ধুয়াবৎ পদ পাই দুটি মাত্র — ১ কালকেতুর যুদ্ধ অংশের প্রথমে, ২ সৃষ্টিপ্রকরণ অংশের প্রথমে এবং মুকুন্দ কর্তৃক 'ধুয়া' রূপে একমাত্র চিহ্নিত পদ।

'অপূর্ণ ত্রিপদী' ছন্দে যে সতেরোটি ধুয়াবৎ স্তবক পাওয়া গেছে, লক্ষ্য করবার

বিষয় কেবল একটি ক্ষেত্রে (চণ্ডীর পরিচয় দান অংশে) এই পদ দ্বিতীয় স্তবকে গ্রথিত হয়েছে বাকী সবই ষোলোটি ক্ষেত্রে বর্ণিতব্য বিষয়ের প্রথমে স্থান পেয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর 'ধুয়া' পদের প্রথমে মেলে বটে কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকেই বেশী যা গীতগোবিন্দে দেখা গেছে অথচ মুকুন্দ সতেরোটি ক্ষেত্রেই সেগুলিকে প্রথমে স্থান দিয়েছেন বিষয়ের দিক থেকে দুঃখ আনন্দ আবেগ বিক্ষোভ প্রশ্ন বিস্ময় প্রভৃতি বোঝাতেই এই গীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে —যা *Objective* সাহিত্যের মধ্যে *Subjectivity*র সুর লাগিয়েছে। এখানেই ধুয়ার সঙ্গে গীতিকবিতার যোগ আমরা আবিষ্কার করতে পারি

আমাদের আগের একটি অনুমান ছিল 'অপূর্ণ ত্রিপদী'তে রচিত ধুয়াপদ বৈষ্ণব পদাবলীর অন্য দুই পঙ্‌ক্তিতে রচিত ধুয়া পদ আমাদের পড়ানি করেছে। এই অনুমান সঠিক হয় মুকুন্দের প্রয়োগ থেকে একমাত্র 'দৃষ্টিপ্রকরণ' অংশের দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়াকেই তিনি ধুয়া বলেছেন কুত্রাপি তা আর বলেন নি। মুকুন্দের ধুয়াগুলি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে —তাঁর 'অপূর্ণ ত্রিপদী'র ধুয়াগুলি অনেকবেশী আবেগপ্রবণ, এমন কি *Subjective* দিকের আভাস তাতে আছে কিন্তু দুই পঙ্‌ক্তির ধুয়াগুলিতে *Objective* দিক বেশী এই অপূর্ণ ত্রিপদী গুলিই পরবর্তীকালে গীতিকারের উদ্ভবের মূলে সক্রিয় হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এসে দেখা গেল এত ধুয়া পদ ও গান মিলিয়ে মোট ৮০টি রচনা আছে ধুয়াপদের এই আধিক্যই সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাসত্ত্ব মধ্যযুগীয় কোনো মঙ্গল কাব্যেই এত অধিক সংখ্যায় ধুয়াপদ ব্যবহৃত হয়নি স্বভাবতই মনে হয় পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় ভারতচন্দ্র অনেক বেশী গীতিপ্রাণ কবি, যে গীতিপ্রাণতা তাঁকে একজন সমগ্র গীতিকবিরূপে প্রমাণিত করে ভারতচন্দ্র যে গীতিকবিতার অত্যন্ত কাছাকাছি এসে গেছেন এ তারই প্রমাণ ভারতচন্দ্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, কোনো কোনো বিশেষ দুঃখ আবেগ আনন্দ উল্লাসের ক্ষণে এই ধুয়াপদগুলিকে কেবল দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আথায়া অন্তরা সঞ্চারী আভোগের সন্নিবেশ করেন মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গান সৃষ্টি করা মনে রাখতে হবে, মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিদের ধুয়া রচনার যে ঐতিহ্যময় ধারাটি ছিল (অর্থাৎ দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া) তিনি তাকে অবাহত রেখেই ধুয়াকে পূর্ণাঙ্গ এক-একটি গান কবিতায় রূপ দিয়ে ছিলেন অর্থাৎ একদিকে তিনি যেমন ঐতিহ্যানুসারী দুই বা তিন পঙ্‌ক্তির ধুয়া রচনা করেছেন অন্য দিকে তেমনি কোনো কোনো ধুয়াকে পূর্ণাঙ্গ গান কবিতার মর্যাদা দিয়েছেন ভারত প্রতিভার এই দিকটি সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

অন্নদামঙ্গলের সর্বপ্রথম যে ধুয়াবহ পদটি আছে, তা গণেশ বন্দনা অংশের দ্বিতীয় স্তবকে, একেবারে জয়দেবীয় পদ্ধতিতে

বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ

পূজা হোম যোগযাগে তোমার অর্চনা আগে,

তব নামে সিদ্ধ সর্ব রাজকাজ।।

অতঃপর 'শিববন্দনা', 'সূর্যবন্দনা', 'দেবিকী বন্দনা' প্রভৃতি বন্দনা অংশে এই একই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। তেমনি কোনো কোনো বন্দনা অংশে আবার নেমেও নি। প্রথম যে ধুয়াটি একটি পূর্ণাঙ্গ গানরূপে মেলে সেটি 'সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ' অংশটি। তেমনি 'পীঠমালা'র প্রারম্ভে এক পঙ্‌ক্তির ধুয়া—"ভব সংসার ভিতরে ভুলভুবানী বিহরে।" 'শিব বিবাহের সম্বন্ধ' অংশের পূর্বে সরাসরি 'নারদের গান' নামে একটি গান আছে যাতে কালী দুর্গা-চণ্ডীর স্তুতি গাওয়া হয়েছে। 'শিবনিবাহ' এবং 'কন্দল ও শিবনিন্দা' নামে যে দুটি পূর্ণাঙ্গ গান আছে পরবর্তী গানে বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতকে' এবং তারও পরে রবীন্দ্রনাথের গানে সেই ছাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে। তুলনার জন্য প্রসঙ্গটিকে বিশদ করা যায়।

'শিবনিবাহ' নামে গানটির প্রারম্ভিক দুটি স্তবক এই

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
কবিবিলসিত নিশিত পরশু
অভয় বর কৃবঙ্গিয়া।।
ঝক ঝক ফনী জটাধিবাজ
তক তক তক রজনিবাজ
ঠক ঠক ঠক দহনসাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।।[৯]

প্রারম্ভিক স্তবকটি তিন পঙ্‌ক্তির যা মধ্যযুগীয় ধুয়াগানের মূল রচনারীতির অনুসারী—এটির মধ্যে তাই আলোচনা করবার নতুন কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবক বা অন্তরার পর পর তিনটি মিল পরবর্তী কালের বাঙালী গীতিকারগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে পাই,—

ক. তবু যে পরান মাঝে
গোপনে বেদনা বাজে—
এবার সেবার কাজে।
ডেকে নাও সন্ধ্যাকালে।।

খ কত যে গিরি কত যে নদী তীরে
পেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।।
আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব

নজরুলের গানে

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

আমরা ঘুচাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।।

'কন্দল ও শিব নিন্দা'র গানটিতে যে অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয়েছে, বাঙলার গান বলতে সেই মিলটিই সর্বাধিক গৃহীত হয়, — রবীন্দ্রনাথও সর্বাধিক এই মিলটিই অনুসরণ করেছেন—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো ।
উমার কেনা চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা
তাই বেড়িয়া ঠোকায় কেনা, / দেখে আসে ঘর লো।।

কখনো ভারতচন্দ্র প্রথমেই একটি পয়ার দিয়ে পরে ত্রিপদী ছন্দে গানটি আরম্ভ করে দেন যেমন,

ক সিদ্ধিঘোটন

বড় আনন্দ উদয়,
বহু দিনে ভগবতী আইলা আলয়। এর পর ত্রিপদী।

খ সিদ্ধি ভক্ষণ

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধিশুদ্ধি হৈল ভুল।।' এর পর ত্রিপদী।

'হরগৌরীর বিবাদসূচনা' অংশে প্রথমে একটি পয়ার পদের পর, পর পর তিনের মিল রক্ষিত হয়েছে,—

বিধি মোরে লাগিল হর বাদে
বিধি যার বিবাদী কি সাধ তার সাধে।।
এ বড় বিষম ধন্দ
যত করি ছন্দ বন্ধ
ভাল ভাবি হয় মন্দ
পড়িনু প্রমাদে।

'অন্নদার বরদান' অংশে বৈষ্ণব পদাবলীর তিন পঙ্‌ক্তির পরিচিত ধুয়া মেলে

ভবানী বাণী বল একবার
ভবানী ভবানী সুমধুর বাণী
ভবানী ভবের সার।।

...৫...

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিগণও তাঁদের আখ্যানকাব্যটির প্রয়োজন ও ঐতিহ্য অনুসারে ধুয়া ব্যবহার করেছেন এবং সে বিষয়ে তাঁদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মোটামুটি মধ্যভাগের, রোসাঙ্গ রাজসভার কবি দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী' আখ্যান কাব্যটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে

দৌলত এটি শেষ করে যেতে পারেন নি। মধ্যযুগের অপর শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি সৈয়দ আলাওল তা সম্পূর্ণ করেন। দুই শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিকে একই রচনার মধ্যে পাওয়া যায় বলে রচনাটিকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা বলে গ্রহণ করা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা কেবল দৌলত কাজী র রচিত অংশটুকুকেই উদাহরণের জন্য নির্বাচন করে নিচ্ছি।

'সতীময়না এবং লোর চন্দ্রানী' কাব্যের মধ্যে দেখা যায় যেখানেই দুঃখ বেদনা করুণা-নিচ্ছেদের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই 'ধুয়া' গানের প্রয়োগ করেছেন দৌলত। ধুয়াগুলির রচনারীতিতেও ঐতিহ্যানুসারিতাকেই দেখা যায়। হয় মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্যের নিজস্ব রীতিতে দু পঙক্তির ধুয়া গান। নয় তো বৈষ্ণব পদাবলীর ধারায় রচিত তিন পঙক্তির অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে রচিত ধুয়া। এ ছাড়া খুব তীব্র ও তীক্ষ্ণ দুঃখবেদনার ক্ষেত্রে পরে একটি গোটা গানই দেওয়া হয়েছে— পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যার পূর্ণতর রূপ মেলে। ভারতচন্দ্রের গানগুলি আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ অংশে পর পর চারটি অভিন্ন অন্ত্যমিল যোজনা করে গানকে আরো ঘন ও জমাট করে তুলেছেন। দৌলত কাজীর গানে তখনো তা পূর্ণতা অর্জন করেনি।

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত দু পঙক্তির ধুয়া গানগুলি প্রয়োগের দিক থেকে 'ভূমিকা' ধর্মী —অর্থাৎ যে ঘটনা এখনো ঘটে নি, কিন্তু এখনি ঘটবে সেই ঘটিতব্য ঘটনার ভূমিকা রূপে ধুয়াগুলি যোজিত। ফলে এগুলি গৌরচন্দ্রিকা পদের নামান্তর হয়ে উঠেছে। গৌরচন্দ্রিকা যেমন চৈতন্যদেবের জীবনের বাস্তবভূমির আলোকে মহাজনদের রচিত পদের ভূমিকা। ঠিক তেমনি। এই হিসেবে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের প্রভাব ধুয়া গানে দুলক্ষ্য ভাবে দেখা যেতে পারে। রচনাগত দিক থেকে যথা তা তিন পঙক্তির আর প্রয়োগগত দিক থেকে, যখন তা দু পঙক্তির রচনা হয়েও গৌরচন্দ্রিকার নামান্তর রূপে ব্যবহৃত।

যেমন, 'লোরের বিলাপ' অংশে, তখনো চন্দ্রানীকে সাপ দংশন করেনি কিন্তু প্রসঙ্গ টির সূচনা হয়েছে, কাজেই ভবিতব্য ঘটনার সূচক হিসেবে ধুয়া গান পাওয়া গেল,

কালরূপে নাগেতে দংশিল চন্দ্রানী
রাজার কুমারী বালা মোহর পরানী।

প্রয়োগের দিক থেকে এতে নতুনত্ব কিছু মাত্র নেই। আর যে কোন দু-পাঁচটি মধ্যযুগীয় আখ্যানকাব্যে যা করা হয়, এখানেই তাই করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনোটিতেই কেবল আর একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য থাকে যা বিশেষভাবে নজর কাড়ে — যা এখানেও আছে। তা হল—একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশক রূপে ঘটনাটিকে ব্যক্ত করা। *Narratology*-র দিক থেকে মধ্যযুগীয় সাহিত্য মাত্রই *Objective* দৃষ্টি থেকে উপস্থাপিত, — কিন্তু এখানে, এই ধুয়া নামটিতে প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা হচ্ছে লোরের ব্যক্তিগত দুঃখ বেদনা রূপে। কবি এখানে নেপথ্যে সরে গেছেন। কালনাগিনী চন্দ্রানীকে দংশন করেছে, সেই 'বালা' হল 'মোহর পরানী',—'আমার পরান'। শুধু ওই 'মোহর' শব্দটিই এখানে একটি নীতিকাব্যের আভাস জড়িয়ে দিল। অবশ্য এমন ব্যাপার খুব কমই

ঘটেছে, এবং সে কারণেই এগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান। এর পরবর্তী 'ময়নার বিলাপ' অংশে কিন্তু এই ব্যক্তিগত দুঃখানুভূতির দিকটি নেই। এখানে কবিই যেন বিশেষ কোনো উপদেশ-পরামর্শরূপে ময়নাকে উদ্দেশ করে বলেছেন—

ময়না, মিল না রে।
জাতিনের সঙ্গে ময়না, মিল না রে।।

পদের প্রারম্ভে যোজিত 'ময়নার' উদ্দেশে কৃত কবির এই মন্তব্য স্পষ্টতই পদের শেষে যোজিত চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর ভনিতাকে স্মরণ করায়। এর মধ্যে দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত মুসলমান কবিগণ চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভনিতার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করেন নি। ভনিতার দিক থেকে মুসলমান কবিগণ চৈতন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভাবধারাকে এক এবং অভিন্নই দেখেছেন। দ্বিতীয়তঃ ভনিতার শেষের বক্তব্য ধ্রুবাকারে প্রথম বক্তব্যে পরিণত হয়েছে।

ধ্রুবাগান এবং পেটাগানের প্রয়োগের ফলে দৌলতের কাব্যের বারমাস্যা বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তাহাই মনোযোগ্য কারণ যা একটি বিরল দৃষ্ট প্রসঙ্গ। বারমাস্যা গানের দুটি প্রধান সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই। প্রথমত, তা দুঃখবিরহ বেদনাকে প্রকাশ করবার জন্যই তা প্রযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত সচরাচর তা বছরের এক জায়গা থেকে শুরু হয়ে, আবর্তিত ধারায়, বাকি হতে থাকবে। দৌলতের কাব্যে কিন্তু বারমাস্যা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়নি। আষাঢ় মাস থেকে এখানে ময়নার বারমাস্যা শুরু হয়েছে এবং প্রতি মাসের দুঃখ ব্যক্ত করবার পর একবার করে 'মালিনীর মিনতি' ব্যক্ত হয়েছে, ফলে বারমাস্যা অংশ ময়না মালিনীর উক্তি প্রত্যুক্তিতে পরিণত হয়েছে যা উত্তর বঙ্গের 'ঢালার বারমাস্যা'তেও দেখা যায়। এই উত্তর প্রত্যুক্তি একদিকে যেমন লোকনাট্যের ঈষৎ বৈশিষ্ট্যের ধারক, অপর দিকে তেমনি ময়নার নিজস্ব উক্তির মধ্যে তাঁর একক হৃদয়বেগও প্রকাশ যা নীতিকারের ইঙ্গিত বহন করে। এরকমই অর্থাৎ একক ভাবে একান্ত ভাবে ময়নার হৃদয় বেদনার সূচক হয়ে ওঠবার জন্যই দৌলত এই অংশে এক-একটি গোটা গান জুড়ে দিয়েছেন। আষাঢ় মাস থেকে ময়নার বারমাস্যা শুরু করবারও একটি বিশেষ কারণ আছে। দেখা গেছে সব বারমাস্যাতেই বর্ষাকালকে একটু বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য মাস সম্পর্কে একটি শ্লোক থাকলে অনেক সময়ই বর্ষাকাল সম্পর্কে থাকে একের অধিক শ্লোক। এর অন্য যে কোন কারণই থাক, একটি কারণ হল,—বর্ষাকালকে বিরহের মাস রূপে মনে করা। বিদ্যাপতির রাধা অন্য সব মাসকে বাদ রেখে 'ভরা ভাদর মাহ'কেই তার বিরহের তীক্ষ্ণতম স্তর বলে মনে করেছিলেন। বর্ষাকালীন এই বিরহবোধই ময়নার সাধারণ বিরহের সঙ্গে বাড়তি আরো একমাত্রা যোগ করে ব্যক্তিগত ভাবটিকে গভীরতর করে তুলেছে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস প্রসঙ্গে ময়নার যে দুটি ধ্রুবা গান আছে, দুটিই অপূর্ণ ত্রিপদী ছন্দে এবং আশ্চর্যের কথা তাহাতে ব্রজবুলির স্পর্শ লেগেছে। এতে এই বিশেষ ছন্দের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর যে ভাবানুষঙ্গের কথা আমরা অনুমান করেছি, তা দৃঢ়তর হয়।

যেমন—

ভাদ্র প্রসঙ্গে :

(আরে মালিনি) হাম বড় দুঃখী অভাগী রে

যে দুঃখ মোহর পরে পাতুঁক সতিনী শিরে

চন্দ্রানী হইল মোর বাদীরে।। ধুয়া।।

আশ্বিন প্রসঙ্গে স্পষ্টতই রাধার কথা এসেছে এখানে

মালিনি, কি এ তুই ভোলাও সি বই

যেই সিংহাসন খঞ্জন খেলন

তাত তুই কাক সোয়াও সি অই ধুয়া।

আশ্চর্যের কথা এই, মগনার দুঃখের পাঁচালি শুনতে শুনতে কখন 'আনমনে' মালিনীরও মনের মধ্যে ব্যক্তিগত বেদনাবোধ জেগে উঠেছে। মাঘ মাসের বিরহ কথার প্রাককালে মালিনীর ব্যক্তিগত জ্বালাতে অপূর্ব ত্রিপদী ছন্দে এই ধুয়া মেলে

কি হৈল জঞ্জাল রে

যৌবন জঞ্জাল জাল ধর্ম্ম হৈল মোর কাল

কি মোর জীবন রে।। ধুয়া।।

৬

শেষ কথা

খুবই সংক্ষেপে মধ্যযুগের বাঙলা কাব্য পরিক্রমা করে আসা গেল। সব কবির কাব্যের উল্লেখ প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত হলেও স্বাভাবিক কারণেই তাদের নামোল্লেখ করা যায়নি। তবে যাঁদের কাব্যের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরাই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদেরই কাব্যধারার মাধ্যমে ধুয়া গানের বিশেষত্বটিকে ধরতে চেয়েছি।

এই পরিক্রমাকালে আমাদের বারবার মনে হয়েছে, চৈতন্য দেবের অনুভব উপলব্ধির ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে যেখানে তা একটি সাহিত্যিক রীতি হয়ে উঠেছে এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল সংবেদনশীল কবি সেটিকে এক ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের উপায় রূপে দেখেছেন যেখানে—সেখানেই এই ধুয়াগানের মূল সার্থকতা নিহিত আছে। চৈতন্যদেবের সাংস্কৃতিক অবদানের এই পরোক্ষ দিকটি এতদিন অনালোচিত এবং প্রায় অনাবিষ্কৃত ছিল। এই ভাবাবেদন মূলক ব্যক্তিগত অনুভূতির চিরকালীন দিকই পরবর্তী কালে কবি টপ্পা গানের মধ্য দিয়ে আধুনিক গীতিকবিতার রূপসম্পদ রচনা করেছে। সকলেরই জানা আছে, মধ্যযুগের *Objective* বিষয় এবং সেই ধরনেরই তার উপস্থাপন রীতি *Subjective* গীতিকবিতার পরিপোষক ছিল না। ইউরোপীয় এবং পাশ্চাত্য প্রভাবই বাঙালীর গীতি কবিতার মূল উৎস—এ কথা শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। বিবিধ প্রবন্ধে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : ফিরে দেখা

শক্তিনাথ ঝা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কবি' সাধক কবির শাক্তে "লুন মেলে না" শিল্পরূপের উদ্ভাবনে নিছিল একজন গঙ্গাধর দত্ত আর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিচিত্র ছবি।

সেকালে কৃষক খাজনা দিতে অর্থাভাবে ফসল বেচে দিত। জমিদারেরা খাজনার পরিবর্তে ফসল নিত। জগৎ শেঠের মতো বড় মহাজন করতো খাদ্যশস্যের ব্যবসা। পরে ইংরেজ কোম্পানী এবং তার কর্মচারীরা খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসায় কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি করে বিপুল মুনাফা করতো। ১৭১১ এর দুর্ভিক্ষে কয়েক হাজার লোক মারা যায়। মুর্শিদকুলি খাদ্যশস্যের রপ্তানী বন্ধ করে এবং গুদামজাত শস্য উদ্ধার করে অবস্থা সামাল দিয়েছিলেন। বাংলাসাহিত্যে "শস্যবোনা" এ দুর্দিনের জন্য যে আকস্মিক খাদ্য ভাণ্ডার করতো সে প্রথা লুপ্ত হয়। সৈন্যদের জন্য খাদ্যশস্য সংগৃহীত হতো। নবগঠিত শহরগুলির জন্য যেমন কলকাতা, চন্দননগর, হুগলি, খাদ্যমজুত করার রীতি ছিল। অন্নমঙ্গলে নবগঠিত কলকাতার সমস্যা। অনাবৃষ্টি ছিল বাস সকলের অন্নাশা, মানসিংহ কাহাঙ্গীরের খোদ দিল্লির সম্মুখে খাদ্যসমস্যা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং নগরের ধনীরা খাদ্য মজুত করতো। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শস্য হানির ফলে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতো। ১৭৩৭ এ বন্যার পরে এবং ১৭৫২ ৭৩ এর বর্গীর আক্রমণ বিশেষত খাদ্য সমস্যা প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, সরবরাহ করেছিলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। এ সূত্রেই তার সাঁওতাল, কিরাত, কুরমি, কাঠুরিয়ার ব্যবসায়, ছিলেন। সৈন্যদের সহায়তায় তাদের ফসল কেড়ে নিয়ে বিদেশীদের তুষ্ট করেন। কবি এবং শিল্পীরা তুচ্ছ, প্রভু ভৈরবেরা খাদ্য চিনিয়া নিত। (অন্নমঙ্গল) এরা সৈন্য যাতায়াত অঞ্চলকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলেও হতে পারে। ব্যাসের মত ভারতচন্দ্রও ক্ষমতাবানদের নেতিবাচক দিকের পরিচয় উহাই রেখেছেন।

এ সময়ের কবিগণ দেশের সমস্যা বিশেষতঃ দারিদ্র্য সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। সমুদ্রের পাশে সর্বনিম্ন ক্রয়ক্ষমতা ইংলতাই রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য। একদিকে সমৃদ্ধ জমিদার। তাই সমাস্তরালে "আমার শাকে লুন মেলে না"। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হল খাদ্যবস্তুর অভাব। দেবী বন্দনায় তার উক্তি 'দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ'। তিনি প্রার্থনা করেছেন, "অন্নপূর্ণা অন্নে পূর্ণ কর।"

অন্নদামঙ্গলে পদ্মিনী বস্ত্রাভাবে পদ্ম পাতায় লজ্জা নিবারণ করে। "অন্নবিনা কলেবর অস্থিচর্ম সার। ভূমিহীন জাত বৃত্তিহীন তার স্বামী কাঠ মুটে সংগ্রহ করে। তিনি "অন্ন বিনা পান তাপ।" দেবী কৃপায় সন্তান পেলেও পদ্মিনী, অন্নবিনা মরে। দেবী পুত্র হরিহোড় বলে "অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ"।

শতচ্ছিন্ন কাপড়ে পিঠ দিয়ে অনাথা এক গ্রামবৃদ্ধা রোগশোকে জীর্ণ "অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্ম সার।"

এসময়ে খাদ্যাভাবে গায়েন বাদকেরা নির্জীব হয়ে প্রার্থনা জানায়, "অন্নে পূর্ণ কর

যব, কাঠে দেহ স্থব '' ভারতচন্দ্রের মত 'মহাকবি'দের অবস্থা পরিনিন্দা থেকে উদ্ধার করি—

''মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন পেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে (অন্নদামঙ্গল)

বহু গ্রন্থকার স্বনাম ধন্য ব্যাস দীক্ষা, যজ্ঞ, পূজা বিচার বিতর্ক থেকে সশিষ্য অন্নবস্ত্র জুটিয়ে নেন ক্ষমতাবানের রোষে এবং অন্নাভাবে সশিষ্য তার দুর্দশার বিস্তৃত বর্ণনা পাই অন্নদামঙ্গলে ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈল উতরোল শিষ্যেরা অন্নাভাবে হল মৃতপ্রায় তিনদিন পেটের জ্বালায় জ্বলে অবশেষে অন্নদার দয়ায় কান্না পেলেন পরোক্ষে অন্নকে, অন্নদাকেই তিনি ব্রহ্ম হিসাবে শ্রদ্ধা জানালেন।

শিব পার্বতীর কৈলাসেও ছিল অন্নাভাব ভিক্ষান্নে পেট ভরে না শিবের, কাপে ক্ষুধায় দেহ তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ''খাইতে না পানু কড় পুরিয়া উদর '' অর্থনৈতিক উৎপাদনে তার সক্রিয় ভূমিকা নেই তিনি সাপের বাসা দেখান জটাধারী জটা থেকে চাল নিষ্কাশন করে, ত্রিশূলের কপালে অনল শিঙ্গা ও গাল বাজিয়ে আনন্দ দেন মানুষকে, পার্বতীর তেল সিঁদুর শাঁখাবাড়ি নেই সদা কুবেরের বাটীতে দুর্গতিনাশ দিয়ে মান মাত্রার ধান করতে। অভাব থেকেই শিব পার্বতীর অবিরল কলহ শিবের ভিক্ষা প্রার্থনায় গ্রাম্যজন বলে,

''অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া (অন্নদামঙ্গল)

এমনকি অন্নপূর্ণা চণ্ডীর ঘরেও খাদ্যাভাব ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

''অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।।'' (ঐ)

এ সময়ে হস্তশিল্পিদের গুরুত্ব ছিল ব্যাস বিশ্বকর্মাকে তোমাকে করে বলেছে ''তুমি বিশ্ব গড়তেই বিশ্ব বড়''। তিনি তো বিশ্বকর্মাকে ব্রহ্মপদ দিয়ে নতুন পুরাণ রচতে চেয়েছিলেন তখন কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েরাও সুতো কাটতো কিন্তু ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের যুগে শ্রমিকদের বেগার খাটতে হতো 'গুণদল যত কর্মিগণ তন্তুর পুরুষী বেগার ব্যাসের এই অভিশাপ বাস্তবায়িত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গের হস্তশিল্পের সুপরিকল্পিত ধ্বংসসাধন অর্থনৈতিক ইতিহাসের অতিপরিচিত এক অধ্যায় এই তো ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সামাজিক চালচিত্র।

সে সময়কার ঈশ্বরী পাটনীরা পেটভরা ভাতের সঙ্গে শ্রমশক্তি বজায় রাখার জন্য সামান্য দুধও চাইতো বর্ধমান, কৃষ্ণনগরের রাজসিক খাদ্য ছিল না তাদের প্রার্থিত জমি সোনার প্রতিও তাদের লোভ ছিল না। তখন সম্পদের অবিরল হস্তান্তর ঘটে চলেছিল নয়াঅর্থনীতির কার্যকারণ সূত্র মানুষের মনে হতো দৈবী মায়া অনুগ্রহ এবং নিগ্রহের কারণ স্পষ্ট ছিল না হরিহোড় অন্নদার কৃপা পেল, কিন্তু অকারণে কৌশলে তিনি তাকে ছেড়ে

গেলেন। হরিহোড়ের মৃত্যু মাত্র, দেখতে ধন ধান উড়ে যায়" যায় কোথায়? সে দুর্দিনে কুবেরের গৃহ ছিল অন্ন পূর্ণ অন্নদা যেতেন সেখানে ধার করতে অন্নদার অভিশাপ পেলেও তার অনুচর, সন্তানের অন্নাভাব ছিল না জয়বিজয়ার ভবিষ্যৎ বাণীর সূত্রে' অন্নদার পূজা মর্তে করেছে কুবের পূজা প্রচার করেছে তার অনুচর বসুন্ধর এবং পুত্র নলকুবের বজ্রকবচী নাটকে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর সঙ্গে কুবেরের পার্থক্য নির্ণয় করে কুবেরকে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের দেবতা বলেছেন নয়া অর্থনীতিতে মূলধনের মালিকেরা অদৃশ্য থেকে পণ্য সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং লাভজনক মূল্য সরবরাহ করেন পলাশীর যুদ্ধের আগে ও পরে জগৎশেঠের মত বড় ব্যবসায়ীরা বাদশাহের মত পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করেন ইংরেজ শাসকেরা এ ব্যবসায় একচেটিয়া সংগ্রহ, কৃত্রিম অভাব এবং অধিকতর মুনাফা করতেন ফরাসডাঙ্গার ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং গুলবাজারের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে দেবীপুত্র জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রও ঋণের প্রয়োজনে গতায়াত করতেন।

হিন্দু ঐতিহ্যে লক্ষ্মী ছিলেন ধনধান্যের উৎপাদনের দেবী নতুন দেবী অন্নদা হলেন, কুবেরের সংগ্রহক্রমে অন্নাদির নিয়ন্ত্রক দেবী কৌলিন্য সবুজ খেতে তার আসন পাতা নয়। চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে, যখন ধান এবং চৈত্রালি ফসল উঠে গোলাজাত গুদামজাত হয়, তখনই অন্নদার পূজার আসন বসে ঈশ্বর গুপ্ত ইঙ্গিতে পরিবেশনা করে ভারতচন্দ্র বলেছেন,

"দরিদ্রতা সঙ্কটের বাস তাহার অধিক চাস
রাজসেবা কত খচমচ। * *
* * *
ভিক্ষা মাগা কৈল কৈল চ (অন্নদামঙ্গল শিবের ভিক্ষা যাত্রা)

সাধক রামপ্রসাদ বা মহাভক্ত ভারতচন্দ্র রায় কোথাও দরিদ্রের গুণকীর্তন বা ভিক্ষার মহিমা ঘোষণা করেন নি ভারতীয় সন্ন্যাস এবং শুচিতা ধর্মীয় ঐতিহ্যের গুণগ্রাহী ছিলেন না ইসলাম বা কালাপাহাড় বৌদ্ধ জৈনের ঐতিহ্যের অনুসরণ জমির মালিক সামন্তযুগে ছিল সর্বোচ্চ মানের পাত্র কোনো সমাজে শ্রাদ্ধেয় ছিলেন না কিন্তু ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিতে কৃষি খুব লাভজনক নয় সরকারী কর্ম জটিল, ব্যবসা বাণিজ্য ঝামেলা। বণিকের মানদণ্ড তখন রাজদণ্ড পরিণত হচ্ছে। পণ্যের ব্যবসায়ে ধন উৎপাদন এবং সে ধন দিয়ে রাজক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সঙ্গে অন্নদার সম্পর্ক আছে। তার কৃপায় ঘোষাল সৈন্যকে বিপদে খাদ্যাদি সরবরাহ করে ভবানন্দের ভাগ্য ফিরে যায় এ সময় অর্থই সমাজের চালিকা শক্তি। হীরামালিনী স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছে, "কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।" টাকা পেয়ে ঘটকেরা আকুলীন হরিহোড়কে মহাকুলীন বলে প্রচার করে তিন কুলীন কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তারপর সংগৃহীত হয়েছে চতুর্থ পত্নী ধনশালী নলকুবের দেবী ও ধর্মাচারকে বাঙ্গ করেছিল ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে যান ভারতচন্দ্র ঘুষ দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন সুন্দর।

সেই বিপর্যস্ত যুগের এক কুলীন কন্যা পারিবারিক কলহে পিতৃগৃহে যেতে উদ্যত হলে সখী জয়া তাকে নিরস্ত করে। অন্নাভাবের কারণে পিতামাতা ভাইয়ের কাছে বিবাহিত

কলা সমাদৃত হবে না। অর্থনৈতিক সুস্থিরতা [illegible] ভোজবাজির মত। ভোজনাটা জমাতেন শিব। অন্নদাও [illegible] কত ভাত সোনা হয়।' (হরিহোড়ের উক্তি)। এই ঘটনাকে সোনা করে দিয়ে কিন্তু হরিহোড়ের মনে হয়েছে, "জাগিতে স্বপন কি বা বাউল অনুমতি"। তিনি কবিত্বের অঙ্গনা করে নিজের পসরা বাড়ান। লোহার সেই টুকরো দল সোনা করে। সম্ভবত কারণেই রামপ্রসাদ বলেছেন,

"তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা"।

মধ্যযুগের কবিসাহিত্যে [illegible] অন্ন বস্তুকে সোনায় পরিণত করতেন গুপ্ত বিদ্যায় বা কৌশলে। শিব পরিবারের [illegible] এ কৌশল ব্যবহার করে এক কমকাণ্ড শুরু করেছিলেন।

'তিন ভুমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে।
কৈলাশ শিখর অন্নে পূর্ণ কর
ভারতের অন্ন হরে। (ভারত উপাখ্যান অন্নদামঙ্গল)

তখন অন্নের সামগ্রিক চুরিতা শুরু। সব [illegible] অন্নাভাবে পীড়িত। কৈলাসে শিবালয়ের নিবিষ্ট [illegible] খাদ্যাভাব দেখা দিবে, তাই [illegible] অন্ন [illegible] দেবতারা এবং মানুষেরা অন্নের জন্যই [illegible] ভারতচন্দ্র [illegible] অন্নাভাবে এ ভাবেই অন্নদার ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছেন। কৈলাসের অন্নের [illegible] সর্বত্র খাদ্য চিরিয়া নিচ্ছিল তখন। একদিকে [illegible] সৃষ্টি [illegible] এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের এ কৌশল চিরাচরিত মধ্যযুগের মধ্যবিত্তের [illegible]

দেশের দারিদ্র্য এবং অন্নাভাবের [illegible] ভারতচন্দ্র বহু বাস্তবিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বিদ্যাসুন্দরে বর্ধমানের রাজা কোটালকে বলেছে—

আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্বস্ব হর
• • •
লুটিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল কেহ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।।

সেকালের নগরপাল চুরি এবং ডাকাতি করতো এ তথ্য রাজা হঠাৎ জানেন নি। রামপ্রসাদের সমসময় এ ভৎসনা করেন।

সাধারণ রাজকর্মচারী "সাক্ষোয়াল কৈল সুচন সর্বভক্ষ।" রাম দেবনাগ/সুজানের মতো অনেকেই প্রজাসাধারণের সর্বস্ব গ্রাস করে। ইঁরা নগরপালের বিরুদ্ধে অন্য অভিযোগ এনেছিল,— "লোকের কি বউ লয়ে সদা থাকে মত্ত হয়।

তখন দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে চলেছে বর্গীদের লুটপাট। গঙ্গারাম দত্ত বলেছেন যে তারা

[illegible]

"লুটিয়া লৈল ধন বিভূতি কড়ি'। কবীরা
[illegible]

[illegible]

"বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পদকর্তা নরচন্দ্র তাই বলেই ফেলেন,

"থাকলে আসি দেখা দিতো
সর্বনাশী বেঁচে নাই।"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পুরুষের [illegible] ছিল সুন্দরের মতই [illegible] স্ত্রী 'অন্নদা মঙ্গলে' শিবের প্রেম নিবেদনে অন্নদা বলেছেন

"সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।"

[illegible] উৎফুল্ল হননি।

[illegible]

"[illegible] অঙ্ক বাহন ছিলেন না এ কবিরা।

[illegible]

[illegible]

তথ্যসূত্র :—

(১) ১৯২৯ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত বঙ্গ [illegible] ৩৮ ৪০০ ০০০ পাউণ্ড।

তখন বাংলার [illegible] কোম্পানি বে [illegible] কর্মচারীদের কুক্ষিগত ছিল।

(২) [illegible]

(৩) [illegible] পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৬—১০২

(৪) [illegible] (প্রমদা মঙ্গল, মলকুবারে শাপ)

৭ [illegible]

বাংলার লোকসাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা

মানস মজুমদার

[illegible] উদ্ভব হয়েছে, লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব পরে।

[illegible] সঙ্গে এ সাহিত্যের ওতপ্রোত যোগ।

[illegible]

[illegible] লোকসাহিত্য প্রতিবাদের অস্ত্রও হয়ে ওঠে।

[illegible] সমাজ ও সাহিত্য তত বেশি সচল জীবন্ত।

....২...

প্রতিবাদ [illegible]

[illegible] (thesis) প্রতিবাদ (antithesis) সমন্বয় (synthesis) এর মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে। [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] — ঈশ্বর [illegible]:

চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো,
[illegible]

বাপ মা [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] স্মরণীয়।

—৩—

[illegible] একটি প্রথা ছিলো সতীদাহ প্রথা। নারীর সতীত্ব প্রমাণের এক নির্মম ব্যবস্থা। মৃত স্বামীর চিতায় [illegible] সতীত্বের পরীক্ষা হতো [illegible] এই [illegible] স্ত্রী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত [illegible] সমাজ সতী নারীর প্রশংসা করতো।

জীবিতা স্ত্রী বীর দুঃখে কষ্ট সহ্য জ্বালা [illegible] করতে না। বীভৎস অমানবিক এক প্রথা শতাব্দী পরম্পরায় আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রথাটি অবশ্য চালু ছিল উচ্চ বর্ণ সমাজে। রামমোহন রায় এক যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললেন। সহমরণ প্রথা বন্ধের অনুকূলে জনমত তৈরি করলেন। বিধবাদের সহমরণ বিষয়ক প্রবন্ধের নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) বইয়ে তাঁর যুক্তি ব্যক্ত হলো। লর্ড বেন্টিঙ্কের আনুকূল্যে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সহমরণ প্রথা বন্ধ হলো। অর্থাৎ, সহমরণ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলো।

রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এ প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন কীর্তিমান তিনি, কিন্তু তিনি যে জনসমর্থন পেয়েছিলেন, তার কারণ সমাজের অনেকের মধ্যেই প্রথাটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি পুঞ্জীভূত ছিল। ছিল যে তার প্রমাণ এই চড়াটি :

বুড়াইয়া [illegible]
[illegible]
কন্যারে ডাকা না আর আম গাছের ডালে,
বুড়াইয়া [illegible]

বৃদ্ধ জামাতা কন্যার [illegible] কন্যার [illegible] তিনি [illegible]। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ স্বামীর [illegible] কন্যার সহমরণও [illegible]। অর্থাৎ, তার অকালমৃত্যু অবধারিত। তাই এ অভিলাষ [illegible]। সেকালে সহমরণ যারা [illegible] বা সহমরণ [illegible] একটি আমের শাখা [illegible]। ঐ আমের শাখাটিই [illegible] প্রকাশ করত। সদ্য বিধবার পক্ষে জনে জনে [illegible] অভিপ্রায় জ্ঞাপন সম্ভব ছিল না। আমের শাখাটি সংকেতের কাজ করত। 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে' প্রবাদবাক্যে এই প্রথার সমর্থন [illegible]। প্রসঙ্গত সেকথা স্মরণযোগ্য। সে যাই হোক, উদ্ধৃত ছড়াটিতে কন্যার জননীর প্রতিবাদ প্রকাশিতই যে প্রকাশ ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। নিমিত্ত হয়েছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি।

৪

বলতে হয় পণ প্রথার কথাও। পণপ্রথা আমাদের সমাজ জীবনে এক অভিশাপ। বয়কালাগত এই প্রথাটির উচ্ছেদই কাম্য। কিন্তু উচ্ছেদ সহজ নয়। এক শ্রেণীর মানুষের অপরিসীম লোভ ও হৃদয়হীনতা প্রথাটিকে সচল রেখেছে। লোকসাহিত্যে নানাভাবে প্রথাটির বিরোধিতা করা হয়েছে। পণ লিপ্সীদের প্রতি বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হয়েছে। তাতে প্রতিবাদী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বেহালা বাদনের বা পাঁচালিতে কন্যার পিতার কাষ্ঠে ধ্বনিত আক্ষেপে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি অত গয়না কোথায় পাব?

মাটির নয় যে গড়িয়ে দেব।[illegible]

পাত্রপাত্রীর দাবি [illegible] পিতার পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব না। ব্যঙ্গমিশ্রিত প্রতিবাদ তাই তাঁর কণ্ঠে

একটি কবিতায় বিবাহ কন্যার পিতার বিপরীতে পাত্রের পিতাকে স্থাপন করে পাত্রের নাকাবাবাশ পিতাকে কথায় ও কাজে তুলে ধরেছেন

(দেখো) কনের বাপের ঘাড়ে ঝুলি

বরের বাপের লম্বা বুলি।[illegible]

সহানুভূতি ও প্রত্যাশা কন্যার পিতার প্রতি [illegible] পিতার সীমাহীন [illegible] দিয়ে চুক্তিতে [illegible] বুঝিয়ে দিয়ে [illegible] নাকাবাবাশ [illegible] পিতার [illegible] বর্ষিত হয়ে [illegible] উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট

[illegible]

একটি প্রবাদে [illegible] পিতার [illegible] আপিত

কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।

বরের বাপ বসে আছে পাঁচশ টাকার আশে।[illegible]

[illegible] পিতৃদুর্বলতার [illegible] প্রবাদটি প্রতিধ্বনিত।

পাত্র [illegible] পাত্রের [illegible] পাত্রপক্ষ [illegible] ভূমিকা [illegible] সোকনাটে [illegible] পিতা ও [illegible] দুই বাক্যে [illegible] করা হয় :

পিতা — [illegible]

[illegible]

কন্যা — [illegible]

[illegible]

পিতা — [illegible]

বি-এ এম-এ হলে ছেলে অর্থ পিয়াসী

ধিক উচ্চশিক্ষা [illegible] টাকার মোহে

কন্যা — বেচবে কেন [illegible] বেচবে কেন [illegible]

[illegible]

[illegible] ও কলার [illegible] প্রতিটি শব্দের বিরুদ্ধ বিদ্রোহের রূপ নেয়।

[illegible]

পরিণতিতে :

মাগো কান্যা পাটে ধৈরা
ছিলিগে মা ওগো মাগে
মাগো, কান্যা মানুষ কৈথ্যা
ছিলিগে মা ওগো মাগে
মাগো, কান্যা সন্তান কৈন্যা
ছিলিগে মা ওগো মাগে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] মারেনি কেন? [illegible] হয় না।

২

[illegible] যায়:

বাপ- মড়াটার মুখত লইজ্জা নাই,
ডাহি মড়াটার মুখত পড়ুক ছাই।।
বিহোর বাঁস মোর চলিয়া যাঁছে
ব্যাচয়া খালেক নাই।
বাপ মড়া, তোক ভাত আন্দিয়া দিম
দনো হাত খইস,
এক লোটা জলের বাদে
মোক যদি ডাকইস —
ও মুই শুনিয়া শুনিবা না হও
বাপ-মড়া, অধিক ডাকালে
টোটোয়ালা ধরিম টিপিয়া।।[illegible]

[illegible] চিত্তজ্বালাটুকু প্রকাশ করে :

তোর টাকা খাইয়া মুখত
বাঘিনী ডাঙলাও তোর গে আই,

এমন বেসালেন জাওই
আর মুলুকত্ বর কি পালেন নাই।।
ও আই, টাকার লোভত্ বুড়াক দিলেন —
আর মুলুকত্ বর নাই পালেন,
মোক কি শবাইসে গে বুড়ী আই।।
সোগায় ক'ছে 'জোঠাই-বুড়াই',
কাহো ক'ছে, 'বুড়া আই, বুড়ী আই।'
নদারী ক'বার গে মানুষি নাই।।
অ আই, সাঙ্গি বুড়ার গুয়া-পান
বুড়া বরের ফাদেলান,
গুয়া ভুকাইতে কি যাবে জান।।[২]

[illegible]

৬

[illegible]

খায় দায়, গান গায়, তাইরে নাইরে না।
সুবুদ্ধি [illegible] দুর্বুদ্ধি [illegible]
[illegible]

একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা
আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি,
সেখানে [illegible]
হুগলীর শহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই,
সেখান থেকে এল ব্যাঙ — সনাতন সিপাই।
সুতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণির হাটে,
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ আগুলিল পথে।
[illegible]
না মার, না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই

[illegible]

...৭...

[illegible]

১ [illegible]
২ [illegible]
[illegible]
৩ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বাস্তুঘাটি হাসপাতাল [illegible] প্রতিবাদ না করে উপায় [illegible] প্রতিবাদ উচ্চারিত হোক।

[illegible]

[illegible] উদ্দেশে তাদের অভিযোগ পেশ করেছে :

রিলিফের মাটি কাটি ভরে নাক পেট।
দিনের শেষে ফিরে এসে মাথা করি হেঁট।।
আখায় আছে আগুন শুধু হাঁড়ি ভরা জল।
বো-পুতের চক্ষে পানি করে টলমল।।
ছোট বাটা কেঁদে বলে আমায় খেতে দাও।
[illegible]
ক্ষেতে এবার ধরেনি ফল কেবল পাতানি।
[illegible]

[illegible]

[illegible]

।। উল্লেখপঞ্জি।।

১ [illegible] শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৬৮৫
২ [illegible] ১৯[illegible] পৃ. [illegible]
৩ [illegible] পৃ. ১১
৫ [illegible] পৃ. ২৭১
৭. সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, ১৩৯২, পৃ. ৩৭
৮ প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি [illegible] পৃ. [illegible]
৯ [illegible] পৃ. [illegible]
১০ [illegible] পৃ ১৩১ ৩২
১১ [illegible] পৃ. [illegible]
১২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, [illegible] পৃ. [illegible]
১৩ [illegible] ১৯৫৩ পৃ. ১২

শোষণ পীড়নের প্রেক্ষিতে গীতিকা-সাহিত্য

বরুণকুমার চক্রবর্তী

[illegible]

বিশেষে পার্থক্য ঘটেছে মাত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] *Professional Interest* [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সুবাদেই

[illegible]

সে দেখা দিল শোককরূপে। বনিয়াচক্রের প্রজাদের উদ্বেগকে সে দুর্বিষহ করে তুলেছিল—

হাহাকারে কান্দে সবে বড় দুক্ষু মন।।

এবারে প্রজাদের দুঃখিত হবার কারণগুলি কি কি ছিল দেখা যাক—

দুরমন দুলাল খাঁ দেখ কোন কাজ করে
পরস্ত্রীর অর্থিতা যত বে ইজ্জত করে
বিবাহের লাগিয়া কার কারে কাটে স গলায়
তাওয়াই বইল সজ্জা না পায় আছান।।
শিকের পাগাড়ে [illegible] বান্ধিয়া
মরিচের ধুমা দেয় দাড়িতে সঙ্কিয়া।
আওরাত জননী সবে বে-ইজ্জত করে
দুক্ষু পাইয়া [illegible] লোক বাট্টা ঘরে ছাড়ে

প্রজাদেরই শুধু বেইজ্জত করা হত না, বেইজ্জতের হাত থেকে মেয়েই ছিল না মহিলাদেরও। আলোচ্য [illegible] প্রজাদের [illegible] না দুলাল খাঁর দুলালের অত্যাচারে সমগ্র বনিয়াচক্র [illegible] প্রাপ্ত হত। [illegible] সেই কাল প্রজাদের [illegible] করে শাস্তি দেওয়া হত। প্রজাদের [illegible] পুড়িয়ে উড়ে কুমিরে শাস্তি প্রদান করা হত। অর্থাৎ শাস্তি দানের কত বিচিত্র পন্থাই না অনুসৃত হত।

দুরবাজ কন্যা [illegible] জামালের [illegible] হয়, তার প্রতি প্রণয় নিবেদন করলে জামাল বৃদ্ধ উজিরকে [illegible] সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। যেহেতু জামাল মুসলমান, তাই হিন্দুরাজা দুরবাজ বৃদ্ধ উজিরকে বিবাহের প্রস্তাব আনয়নের জন্য অমানুষিক শাস্তি দিয়েছেন—

জাহুর ডাকিয়া সবা কোন কাম করে।
শতদিন রাখে সবা অন্ধ কারাগারে।।
বুকেতে পাষাণ দিয়া করিল বন্দনা।
পিপড়া বান্ধাইল সব বইল বিছানা।।
দাড়ি উপাড়িয়া তার যাবে বেড়া পাক।
এক কান কাটিয়া তার করিল বিপাক
লোহা পুড়াইয়া তার অঙ্গে দাগ দিল।
গদ্দানা ধরিয়া তারে বাজার বাহির কৈল।।

আমরা জানি দূত অবধ্য। কিন্তু বৃদ্ধ উজিরের ক্ষেত্রে দুরবাজ যে আচরণ করেছেন তা কূটনীতি বহির্ভূত। জামালের প্রেরিত বিবাহ প্রস্তাব তাঁর কাছে অকল্পনীয় ধৃষ্টতা বলে মনে হয়েছে। তাই সেই ধৃষ্টতার জবাব দিয়েছেন তিনি উজিরকে নির্যাতিত করে।

কথায় বলে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'। এখানেও দেখি আলাল খাঁ পুত্রশোকে অগ্নিশর্মা হয়ে আদেশ করে বসেন বাহিরমধ্যে যেন দুরবাজকে বেঁধে আনা হয়, সেইসঙ্গে

দক্ষিণ বাগ্ন সহর ডুবা আগুন লাগাও
গর্দান কাটিয়া সবে সায়রে ভাসাও।।
[illegible]

ফেনিও হুকুম তামিল করল নির্দেশমত

[illegible] সহিস কেবামুল্লার সঙ্গে [illegible]

আমার ঘোড়ার সহিস কেবামুল্লা হয়।।
অধুয়ারে বিয়া দিয়াম তাহার সহিতে
আমার মনের দুঃখ রহিবে তাহাতে।
কেশে ধরা অধুয়ারে বাহির করিল।।

[illegible]

একদিন ফতেমা যে কুয়াবে দেখিল
পুনু মাসীর কান্ যেন ফুলেতে লইল।।

[illegible]

রূপেতে অইব পুত্র ছুরৎ জামাল
বাপের চমান বেটা বংশের দুলাল।।

[illegible]

হইবে তুমার পুত্র ছাহা হেকান্দর।।
[illegible]
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড় ছোক।
বাজার যতেক লোক যে দেখে তাহারে
[illegible]

[illegible] এক পুরী নির্মাণ করে [illegible]

[illegible]
কুড়ি বছরের [illegible]
এক বান্দী সঙ্গে [illegible]

নির্বাসিত ফতেমা নিজের করুণ জীবন [illegible] লোককবি দিয়েছেন তাতেই বোঝা যায় তার জীবন কতখানি বিপর্যস্ত ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। লোককবিও হতভাগিনী ফতেমার প্রতি যে সহানুভূতিশীল ছিলেন তার প্রমাণ তার [illegible] লেখা

সোনার পালঙ্কে যেবা শুইয়া নিদ্রাযায়।
কপালের দোষে সেই মাটিতে ঘুমায়।
[illegible]
[illegible]
এক মাত্র বান্দী আছে সাথের সঙ্গিনী
খিদায় জুগায় খানা পিয়াসেতে পানি।
[illegible]
[illegible]
গণক গণিল গনা না জানি কেমন।।

[illegible] ৮ [illegible] বলাই বাহুল্য।

[illegible] করতে হয়েছে

[illegible] তার জীবন প্রবাহিত হল।

[illegible]

এই ছুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পারে।
[illegible]
* * * * * *
ভিন্ দেশী দুষমন সেই যাদুমন্ত্র জানে।
বইক্ষেতে হানিয়া ছুরি মারহ পরানে।।
[illegible]
দুষমন [illegible] ছুরি [illegible]

এ মানসিক [illegible] প্রেমিকাকে [illegible] নিদর্শন।

[illegible] অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে—

[illegible]
সূতের হেওলা হইয়া ভাইস্যা বেড়াই।।
[illegible]
[illegible]

[illegible] উপাদান তাকে [illegible] [illegible] এইরূপে—

[illegible]
কিমনে বধিব তোমায় নাহি লয় চিত্তে।।
[illegible]
ছাড়িয়া বাঁয়ের বাতি যু দিয়া নিবাই
[illegible]
পাষাণ বইয়া দাও বাপে বধিল আমারে।।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] নিদ্রাভিভূত [illegible] [illegible] নূতন [illegible] [illegible] চলে যেতে [illegible] [illegible] তাদের [illegible]

প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
[illegible]
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি
পাকা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।

[illegible] বলেছে :

[illegible]

দুটকালে মা-বাপের কুল শূন্য করি।

[illegible]

[illegible] আকাঙ্খার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিবাহ [illegible] ব্যবহার। মোনাইর ভাষায়—

[illegible]

বাউগ্র হয় জমি লইয়া সুখে বসা খায়।

[illegible] মুক্তিপ্রাপ্ত [illegible] বলেছে :

শুন বধু তুমি যদি কিরপা নাইসে কর।
[illegible]
দুরন্ত দুর্জন [illegible] পরতিজ্ঞা যে করে

তোমারে পাইলে ছাইড়া দিব মাধবেরে।।
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই

পুরুষশাসিত সমাজ বলেই সোনাইয়ের শ্বশুর তাকে দেওয়ান জানানের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে মাধবকে মুক্ত করার কথা বলতে পেরেছে। এর থেকে বড় শোষণ আর কি হতে পারে? জেনে শুনে মনহরা বধূটিকে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়ার প্রবোচনাকে আর কি বলা যাবে? সোনাই শেষ পর্যন্ত মাধবকে উদ্ধার করে নিজে বিষপানে আত্মহত্যা করে- সতীত্বের পরাকাষ্ঠা হয়েছে।

এইভাবে পঁচিশটিতে শোষণ পীড়নের জীবন্ত চিত্র সকল সংযোজিত হয়েছে। প্রচণ্ড পেষণের ফলে ইক্ষু যেমন যে রস নিষ্কাশিত হয় অমৃত তার স্বাদ গ্রহণ তৃপ্ত হই লাভ করি রামপ্রসাদ অনুরূপ নানা পঁচিশটির যে সব চরিত্র ত্যাগ তিতিক্ষায় আত্মবিসর্জনে চরম কৃচ্ছ্রসাধনে উজ্জ্বলা লাভ করেছে, সেই দীপ্তি সেই উজ্জ্বলা এসেছে নানা শোষণ পীড়নের কারণেই। স্বাভাবিক অবস্থাতেই এই চরিত্রগুলি এমনকার মত দীপ্তি লাভ করত না কখনই।

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যবিচার এক দিক

জ্যোতির্ময় ঘোষ

[illegible]

[illegible] পেয়ে সৌভাগ্য লাভ করবেন, এই আশায়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলাকুশলী :

[illegible]

অথবা,

লক্ষ্মী মেয়ে ছিল যারা
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া।

[illegible]

[illegible]

পক্ষান্তরে,

[illegible]

[illegible]

উদ্ধৃত এই গদ্যাংশের বক্তব্যও সুস্পষ্ট।

পুনরপি,

[illegible]

তবু তো [illegible] ও [illegible] সেই [illegible]

হয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাঁসে চেলে
টেবিল পাতে খানা খাবে
এরা বেদকোরাণের ভেদ জানে না
বেদ করে আর কে বোঝাবে।।
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
জুতো-পায়ে দেবতে পাবে
হলো কর্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড
হিঁদুয়ানি কিসে রবে।।

[illegible]

[illegible]

শুধু তাই নয় কবিতায় তিনি সিপাহী যুদ্ধ, সিখ যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ প্রভৃতি বর্ণনায় উল্লাসিত হয়ে ইংরেজদের জয়বার্তা [illegible] এবং দেশীয় শক্তির পরাভব কামনা করেছেন। দেশীয় শক্তির পরাজয় হলে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ঝাঁসির রানী, নানা সাহেব ও লক্ষ্মীবাঈকে অসংযত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এমন কী রানী ভিক্টোরিয়াকে আশ্বস্ত করে দিয়েছেন

[illegible]
[illegible]

[illegible]

ব্রিটিশের জয় জয় বলো সব ভাইরে।
[illegible]

[illegible] বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন—

[illegible] এবং প্রয়াস করিয়াছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
শিখিলি লিং কাঁকালো
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,

আমরা ভুসি খেলেই খুশি হব

ঘুসি খেলে বাঁচব না।

[illegible]

[illegible] আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই।"

[illegible] করতে পারছি না।

[illegible]

১। কবিওয়ালা

২। নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পা রচয়িতারা

• [illegible]

৪। ভারতচন্দ্রের উত্তর সাধকেরা

• [illegible] রঘুনন্দন গোস্বামী ও অন্যান্য।

৬। পাঁচালী ও যাত্রা-কারেরা

৭। বিবিধ সঙ্গীত রচয়িতারা

[illegible] *Bengali Literature in Nineteenth Century* [illegible]

১৮৩১ সালে [illegible] পুরাতন [illegible] পুরাতন [illegible] দিয়েই নতুন ধ্যানধারণার পদধ্বনি।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে [illegible] *time appear [illegible] temporal the people [illegible] new [illegible] W [illegible]*

[illegible] ছিল [illegible] ও [illegible] *like Ramdulal De. We are [illegible] with English [illegible] and writers and [illegible]*

খ্রিস্টাব্দ উপর [illegible] সাহিত্য [illegible] ধারণা [illegible] পদধ্বনি [illegible] পাঠক [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৯৬৬ [illegible]

কিন্তু [illegible] *The Future Results of the British Rule in India* [illegible] 'From the Indian natives reluctantly and sparingly educated at Calcutta under English Superintendence a fresh class is springing up endowed with the requirements for the Govt. and imbued with European Science'

এবং 'The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British bourgeoisie till in Great Britain itself the now ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindoos themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether'

[illegible] Empire of the Nawabs গ্রন্থে [illegible] সুবিধা [illegible] শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে [illegible]

জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তিনটি উপস্থাপিত ভারতের সমাজে এখন সমুপস্থিত

১। বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের পুঁজিবাদি চিন্তার ও [illegible] নিজস্ব শিল্পবিকাশের ঘোরতর বিরোধী একটি স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার

২। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি, এবং

৩। উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক কারণে নিরাসক্তভাবে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

এই ভাবে দেশের জাতীয় আন্দোলনের [illegible] প্রস্তুত হলো [illegible] বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় নিপীড়নের [illegible] কাজ [illegible] অগ্রণী হলেন।

মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখের কাব্যে [illegible] দেখতে হবে গণচেতনাগত ঐক্যের সমাজ [illegible] দেখা গিয়ে [illegible] মধুসূদনের কাব্যে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতাকে [illegible] মধুসূদনের কাব্য কবিতার মধ্যে [illegible] ছন্দ [illegible] ভাবে বিকশিত [illegible] হেমচন্দ্রের ভাব [illegible] কারণে [illegible] সম্পূর্ণ হয়ে না, [illegible] খণ্ড কবিতাবলীও—

[illegible]

করাজে বাজিয়াৎ

হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলীর [illegible] কবিতায়।

নবীনচন্দ্রের [illegible] মহাকাব্য [illegible] চলবে না [illegible] খণ্ড কবিতাগুলি [illegible]

মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে যা [illegible] প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত [illegible] কাব্যসাধনার মধ্যে তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে

মধুসূদন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীদের কাব্য সাধনা পর্যন্ত *Continuity* ও *form* এর বিকাশের ধারা প্রকরণের ছন্দের বিকাশটির দিকে বিকাশধারার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই আমরা পূর্বাপর পূর্বপ্রবণতার বন্দিকেও অনুভব করতে পারি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একই সঙ্গে ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ এবং ঘোষিতভাবে রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে পাই। শিক্ষা [illegible] রবীন্দ্রনাথকেও পাই তাঁর জাতীয় ভারতের মর্মমূল প্রকাশের [illegible] মূল দিক

সমকালীন নবীনকবিদের কাব্যকবিতায় এই দ্বন্দ্বটি কম পরিস্ফুট নয়। কেননা নবীনকবিরা প্রায়শ তাৎক্ষণিকতা বা সমকালীনতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যান পক্ষান্তরে, মুখ্য কবিরা তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার গৌরবেই সমকালকে বহুলাংশে অতিক্রম

[illegible]

[illegible] পশ্চাদগামিতায় অবসিত হয়েছিল।

[illegible] পাস্তি গ্রহণ করেছিলেন।

[illegible]

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে সব দুর্বলতা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য উপন্যাসের উপসংহারে প্রবীণ, পুত্রবিয়োগের দুঃখ ক্ষত নিয়ে, এই পাত্রপাত্রীর চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। সংকীর্ণ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তাদের মানবতাবাদী চিন্তাধারার অভ্যুদয় দেখা যায়। তারা চরিত্র আমাদেরই সমকালের নির্ভুল প্রতিফলন, আমাদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন চিন্তার সংকট ও তাকে নিরসন চেষ্টারও পরিচয় এই চরিত্র নির্মাণের মাধ্যমে বহুলাংশে ধরা পড়েছে।

এই ধরনের সামগ্রিক পিছুটান এবং দ্বিধা সংকট কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিরাজি এই বৈশিষ্ট্য তাই উনবিংশ শতকেরও অর্ধবিস্তৃত চরিত্র লক্ষণ। সর্বত্রই তার প্রভাব তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না। সমকালীন কোনো কবির পক্ষেও এই ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুপ্ত থাকে রবীন্দ্রনাথ কেউ ব্রুটিপূর্ণ মনে করেন, তাদের স্বভাবতই এই বৈশিষ্ট্যের সঠিক চরিত্র ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্যে বাইরের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সম্ভব নয়। তাই ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বঙ্গীয় কবি সমাজ যখন একদিকে প্রবৃত্তি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সূত্রের উদ্ধৃত অবস্থান করতে পারেন না, তখন আমরা সব কবিরই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সংগ্রহ ও সাধনার ফল প্রকৃতি ও ফল পরিণামে পুরোপুরি একই রকম হতে পারবে না।

সর্বোপরি বলাই বাহুল্য সামগ্রিক বিচারে তাদের মধ্যে কালান্তরিত ক্ষেত্রে অসমান অবস্থান দেখা যায়। শুধু পরিমাণের প্রশ্ন নয়, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির ঐশ্বর্যও লক্ষণীয়। সামগ্রিক ত্রুটি ও মূর্খতা সত্ত্বেও তাদের ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অর্থাৎ প্রবলতাটা মূলত সামনের দিকেই। কিন্তু কোথায় থেকেই হয়ে একটা পিছুটান, কিছু পশ্চাদমুখী প্রবলতা। ফলে হাত ধরে পরিত্রাণ, সর্বত্র মুক্তিলাভ আর কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কাব্য

সৌমিত্র বসু

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাহিনীর চরিত্রদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

চাই

[illegible]

শুরু করেছেন [illegible]

মালিনীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

[illegible]

[illegible] পারে

[illegible] চটুলতাই হয়তো তৈরি হয় সেখানে

[illegible]

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মিথের প্রয়োগ

মীনাক্ষী সিংহ

হয়ে ওঠে পরম রমণীয়

মূলকথাই Myth ও legend

Collective Unconscious

The Waste Land

deep structure Deep structure Surface structure

A Richards Stock response Stock response

[illegible] Correlative [illegible] Where I and [illegible] Objective Correlative

Created by [illegible] Reproduce [illegible] We would rather think [illegible] not [illegible] when flows centrally

[illegible] Wordsworth will [illegible] not with deals [illegible]

সূরদাসের প্রার্থনা [illegible]

[illegible] অনুভূতিই প্রেমকে [illegible] পুরুষের [illegible] এই কামনামলিন নয়নকে তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা বিদ্ধ করে [illegible] এই প্রসঙ্গে [illegible] সুরদাসের [illegible] কবি যখন বলেন —

"আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মি সম
[illegible] বিঁধে দাও বাসনাসেঘন
এ কালো নয়ন মম"

[illegible] Surface structure [illegible] সুরদাসের [illegible]

"আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে"।

[illegible] বর্তমানের প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত করে তোলেন।

মেঘদূত [illegible] প্রথম দিবসে কালিদাস [illegible] মেঘদূত [illegible] এই চির অন্তরা [illegible] যক্ষ যক্ষপ্রিয়ার [illegible] সর্বজনীনের [illegible] তাঁর আকুল প্রশ্ন [illegible] অলকাপুরী [illegible] বর্তমান [illegible]

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?

এ ক্রন্দন [illegible] যক্ষ [illegible] হৃদয় বেদনাকে প্রকাশ করে কালিদাসের কাল [illegible] বর্তমান কালে [illegible] কালিদাসের মেঘদূত তখন Objective Co-relative এর সূত্রে বর্তমানের নব মেঘদূত হয়ে ওঠে

উর্বশী — রবীন্দ্রনাথের নিরাকার সৌন্দর্যতত্ত্ব [illegible] 'চিত্রা' কাব্যের 'উর্বশী'

কবিতায়। বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাই ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে কবির অন্তরে বিরাজিত সৌন্দর্যের অমল অনন্ত সত্তাকে সার্থক করে তুলেছে।

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে নাটকের সৌন্দর্যের প্রধান মাধুরী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উর্বশীকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছেন।

> 'নাটকের মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তাকেই প্রতীক [illegible] একে মানব [illegible] আত্মাভূতা সৌন্দর্যের [illegible], কিন্তু [illegible] অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য [illegible] আছে।"

নাটকের যে কথা সংসারের [illegible] আসক্তির অভিমানকে [illegible] উর্বশী [illegible]

> "এই মাটির [illegible] এই [illegible] কথাটা
> হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"

যে মুহূর্তে নন্দনবাসিনী [illegible] সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের [illegible] ভরে [illegible] ভরা। [illegible] উর্বশী [illegible] আকাঙ্ক্ষিত [illegible] ঘটে।

> [illegible] বসে রহে

এই প্রজ্ঞাপূর্ণ [illegible] পুরুষের [illegible] লাভ করে। কিন্তু তার [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] ও [illegible] দুই [illegible] চাইতে [illegible] কবিতা [illegible] প্রেম [illegible] এই বিবিধ কথাই [illegible] আভাসিত। এই [illegible] উর্বশীর [illegible] সৌন্দর্যসৃষ্টির [illegible] সত্তা। কবি স্বয়ং তাকে বলেছেন—

> "সে তো বস্তু নয়, সে একটা [illegible] যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে।"

তেমনই প্রেম একটা [illegible] যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। এমনই স্বর্গবাসিনী উর্বশীর প্রতিপ্রতিমা সমগ্র কবিতাটিকে ঘিরে আছে। নাটকের প্রারম্ভিক পর্যায়ের যে প্রকাশ ছবি আছে স্বর্গের উর্বশী [illegible] সেই নির্ঝরিণী নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ মিলেই উর্বশী কবিতার সৃষ্টি। সুরলোকের উর্বশীর নিছক রূপবর্ণনায় এভাবেই এমনভাবে পুরুষের মনোলোকে মুক্তি দিয়েছেন।

এভাবেই আমাদের ঐতিহ্যবাহিত ও পুরাকাহিনীর প্রতিনায়ক রবীন্দ্রনাথ বারবার কবিতার শরীরে যুক্ত করেন। নিছক অন্তরীণ প্রেরণার তার কাহিনী স্পর্শ করে আধুনিক

[illegible]

[illegible]

এজন্যই Richard Chase বলেছিলেন—

"Myth is not a [illegible] it is a live reality."

[illegible]

"Primitive priest of metaphysical thought

[illegible] Mythological poetry [illegible] কবিতা হয়ে ওঠে অনন্য।

রবীন্দ্র কাব্য—প্রাক গীতাঞ্জলি পর্ব

প্রশান্ত কুমার পাল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মশেল মাখিয়া দিয়া তাতে"

[illegible]

— "হুপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,

পিপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

[illegible]

[illegible] তুলেছেন।

[illegible]

প্রভাত সংগীত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সাহায্যে ক্ষণশাশ্বতীর বন্দনা করেছেন।

[illegible]

(অনুলেখিকা—শ্রাবণী মিত্র)

ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান ঃ রবীন্দ্রকাব্যের কপিবুক পর্যায়

বিশ্বনাথ রায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কত গভীরভাবে সত্য।

[illegible]

[illegible] রামায়ণ মহাভারতের [illegible] কাব্যের [illegible] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহায়ক হয়েছিল [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] প্রমুখ [illegible] ছড়া [illegible] সম্পর্কেও অবহিত হতে পারি আমরা।

১ [illegible] সম্ভব মনীষীর [illegible] সম্ভব হইয়াছিল [illegible] পড়িয়া গিয়াছে [illegible] তিনি সাহস [illegible] কবিগণের [illegible] সেই অভাব [illegible] করিতেছি

২ [illegible] বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম [illegible] পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ [illegible] পড়িতে বসিতাম [illegible] করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই।[৭]

৩ [illegible] সুযোগ পাইনি [illegible] গ্রহণ করবার সুযোগ [illegible] আমি [illegible] করতুম

॥ দুই ॥

[illegible] (১ম খণ্ড) 'ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ [illegible] 'অকম অনুকরণের দ্বারা [illegible] 'অসম্পূর্ণ অপরিপক্ক রচনাগুলিকে [illegible] 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' [illegible] স্বীকার করে [illegible] কবিতা বলার কারণ [illegible] এই সময় থেকেই [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] অপরিণত রচনাগুলির [illegible] তা তিনি ভাল করেই জানতেন। [illegible] তা [illegible] 'অকম অনুকরণ' বলেছেন [illegible] তা প্রতিভার অনুরূপ [illegible] বা পূর্বসূরি [illegible] যেহেতু সেই প্রভাবকে আপন [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] পারেননি সেই জন্যই তা 'অনুকরণ' বলে অভিহিত হয়েছে [illegible] এক [illegible] প্রভাব।

পদ্য রচনায় [illegible] ছড়া এবং বাংলা রামায়ণ [illegible] ভাষা ও ছন্দের [illegible] হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে [illegible] আট

বছর বয়সে 'কবিতা রচনারম্ভ'র ব্যাপারে ভগিনীপতি জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯১৯) ছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগুরু। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"একদিন দুপুর বেলায় তাঁহার (জ্যোতিঃপ্রকাশ) ঘরে ডাকিয়া লইয়া কেমন করিয়া চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা লিখিতে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন এবং আমার হাতে একটা স্লেট দিয়া বলিলেন পয়ারে উপর একটা কবিতা রচনা কর। তাহার পূর্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যছন্দ আমার কানে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়া ফেলিলাম।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ছন্দের অনুসরণে স্লেটে যার সূচনা জমিদারী সেরেস্তার এক কর্মচারীর অনুগ্রহে পাওয়া নীলকণ্ঠাক্ষর ফুলস্ক্যাপ খাতায় সাধু পয়ার ছন্দে সেই কাব্যচর্চা অব্যাহত থাকে। এই সময়ে রচিত দুটি পদ্যাংশ ('নীরবতা হীন হয়ে ছিল সরোবরে' এবং 'অন্নসত্ত্ব দুগ্ধ যেন') 'জীবনস্মৃতি'র 'কাব্য রচনাচর্চা' অধ্যায়ে 'দলিলভুক্ত' করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আরম্ভের আগে যখন আরম্ভ আছে, তেমনি 'পদ্মার উপরে' রচিত আদিতম কবিতার পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ে নির্ভেজাল ছড়ার ছন্দে রচিত একটি পদ্যের উল্লেখ 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে পাওয়া যায়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চার। কাঠের সিঙ্গিকে বলি দিতে গিয়ে মন্ত্রও বানিয়েছিলেন—

সিঙ্গি মামা কাটুম,
সন্দিবোসের বাটুম,
উলকুট ঢুলকুট ঢামকুড় কুড়
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এর মধ্যে প্রায় সবকথাই ধার করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের।' শিশু কবি কোথা থেকে এই ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে ১৩০১-২ সালে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত তিনটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার উল্লেখ করে লিখেছেন—'চিরন্তন শিশু শাস্ত্র থেকে এই শিশু পুরোহিত তার পূজোর মন্ত্রর উদ্ধার করেছিলেন'। ছড়া তিনটির প্রাসঙ্গিক পংক্তিগুলি হল (ক) 'তাল গাছ কাটুম বোসের বাটুম কৌবী এল ঝি' (খ) উলকুট ধুলকুট নলের বাঁশি (গ) ঢাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙার ঘর।

শিশুকালে শোনা ছড়া পাঁচালির ছন্দ ঝংকারে গঠিত শিশুকবির মনে যে মন্ত্রর রচিত হয়েছিল তা নিতান্ত দেশী পদ্ধতিতে। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে (অধ্যায়-১৪) রবীন্দ্রনাথের সেই স্বীকারোক্তি আছে—"যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি।" চোদ্দ বছর বয়সে দেশী ছড়ার লৌকিক ছন্দ এবং ভাষারীতিকে প্রথম ব্যবহার করেন তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকের 'ডাকিনী' অংশ অনুবাদ

করতে গিয়ে।' পরবর্তী কালে কেবল ছড়ার ছন্দই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেমন ছড়া রচনা করেছেন, তেমনি ছড়ার প্রসঙ্গ নানাভাবে এসে পড়েছে তাঁর রচনায়

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত অল্পবয়সী রবীন্দ্রনাথের মনে যে দাগ কেটে গিয়েছিল, তারই ছায়াপাত দেখতে পাই 'আদি কৈশোরক' (১৮৭৩ ৭৬) পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ (১৮৭৪) ও স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'হিন্দু মেলায় উপহার' (১৮৭৫)-এ হেমচন্দ্রের ভাব ভাষা-ছন্দের প্রভাব থাকলেও মানুষের উচ্চাভিলাষের ক্ষতির দিক, কিংবা পরাধীন জাতিকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় দিনগুলির স্মরণে রামায়ণ মহাভারতের যে সব কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা বাল্যকালে কৃত্তিবাস কাশীরামদাস পাঠের প্রত্যক্ষ ফল মানুষের উচ্চাভিলাষকে ধিক্কার দিয়ে কিশোর কবি লিখেছিলেন :—

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ।
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিল বনবাস,
কাড়িয়া লইল দশরথের জীবন
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।
* * * * *
দুর্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালিদিলে

(অভিলাষ /স্তবক ৩৩-৩৪)

কিংবা 'হিন্দু মেলায় উপহার'-এ স্বদেশের গৌরবময় দিনগুলির স্মরণে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী উল্লেখ :—

" ...রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে,
কবিতার স্রোক বীণার ভারতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা।

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে।

শ্রীরথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী আবিষ্কৃত ' 'হোক ভারতের জয়' (বান্ধব, মাঘ ১২৮১)

কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশী হিতৈষী' হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করে 'যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্মবীর'দের এবং 'আদি সম্রাট' রামচন্দ্রের নামকেও স্মরণ করেছেন অন্যপক্ষে 'অস্তা কৈশোরক' (১৮৭৬-৮৩) পর্যায়ে গাথাকাব্যের আধিক্য থাকলেও কোন কোন গীতিকবিতাতেও মহাভারতের প্রভাবজনিত রেশ থেকে গেছে দেখতে পাই। হিন্দু মেলায় পঠিত 'দিল্লী দরবার' (১৮৭৭) কবিতায় আছে :—

"তুমি শুনিয়াছ হে গিরি অমল অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডস্বর
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে।"

ইতিমধ্যে (অস্তা কৈশোরে) বৈষ্ণব পদাবলী ও রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়ার গানে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ ঘটায় কোন কোন কবিতায় কমবেশি তার প্রভাব পড়তে থাকে। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় ১২৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছে কিংবা 'বনফুল' গাথাকাব্যে সমসাময়িক বড় কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও বৈষ্ণব কবিতার ছায়াপাত ঘটেছে মাঝে মধ্যেই। এই সময়ে বৈষ্ণব কবিদের রচনা রবীন্দ্রনাথকে যে বিশেষভাবে উত্তেজিত করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক ১২৮৩) তাঁর প্রথম গ্রন্থ সমালোচনা 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী'তে তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন 'অক্ষয় সরকার মহাশয় যখন বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম প্রকাশ করলেন লুকিয়ে পড়লাম। পরে জানলাম যে কাব্যকলা ব'লে একটি জিনিষ বাংলা প্রাচীন কালেও আছে সেদিন সাহিত্য রসের উদ্দীপনা সহজে প্রাণে পৌঁছল। তাঁর প্রথম প্রবর্তনায় অন্তত আমার সাহিত্য অধ্যবসায়কে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।"[১১]

'প্রলাপ'-এ রবীন্দ্রনাথকে যখন লিখতে দেখা যায়—

'হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরাণ হয়েছে পাগলপারা (প্রলাপ ২)

কিংবা 'বনফুলে'—

নিভৃত যমুনাতীরে বসিয়া রয়েছে কিবা
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞান হত নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে। (চতুর্থ সর্গ)

তখন মনে হয় বৈষ্ণব পদাবলীর আবেগ আকুলতা নবীন কবির কলমের ডগায় অনিবার্য ভাবেই চলে এসেছে বৈষ্ণব সাহিত্যের লালিত্য যে 'বনফুলের' সর্বাঙ্গে বিরাজিত সমসাময়িক সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি তা 'সাধারণী'[১২] পত্রিকায় লেখা হয়— 'বনফুল' অতি সুন্দর। জয়দেবের লালিত্য বনফুলের ছত্রে ছত্রে পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে'। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ' এই কাব্যটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা বিরহার্তি যেন নতুন ভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

" তুই নদীতীরে কাঁদগে লো ধীরে
যমুনারে কহি মরম জ্বালা।
* * * * *
লভেছি জনম কবিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোর। (তৃতীয় সর্গ)

তাছাড়া ষষ্ঠ সর্গের কোন কোন ছত্রে চণ্ডীদাসের পদের প্রত্যক্ষ অনুসরণ লক্ষ্য করা গেছে—

"অস্ফুট বাঁশীর মৃদুরব—
সুদূরে পশিয়া কানে শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব।

এর সঙ্গে মেলানো যাক চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদ :

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

সমগ্র কাব্যটিতে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই পদানুকরণ সম্পর্কে কবি নিজেই জীবন স্মৃতিতে স্বীকার করেছেন—আলোচ্য পর্বের প্রায় সব রচনাতেই আবেগের ফেনিলতা তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে সে অন্য কবিদের অনুকরণ।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাস থেকে 'ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশিত হতে শুরু করলে রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে অজস্রধারায় বিচিত্র বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য হলেও তা 'ভারতী'তেই আগে মুদ্রিত হয় (১২৮৪ পৌষ চৈত্র)। তাছাড়া 'শৈশবসঙ্গীত (মে ১৮৮৪) ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র (জুলাই ১৮৮৪) কবিতাগুলি 'ভারতী'র প্রথম বর্ষ থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 'কবিকাহিনী' ও শৈশব সঙ্গীতের 'গাথা' কবিতাগুলিতে প্রেমভাবালুতার অনুষঙ্গে অস্ফুট হলেও অন্তরিত্বের বৈষ্ণবপদাবলীর ছায়াসম্পাত ঘটেছে—

শুধু ভালবাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার দিয়াছি তোমার চরণে
তাহাতে তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?

(কবিকাহিনী / দ্বিতীয় সর্গ / সঙ্গীত)

অন্যপক্ষে 'ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) 'গীতিকাব্যে' 'শেলি বায়রণের কাব্য কবিতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হলেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতির রোমান্টিক ব্যাকুলতা কবির হৃদয়াবেগ মন্থনে যথেষ্ট

সহায়ক হয়েছিল। রবীন্দ্ররচনাবলী'র 'অচলিতসংগ্রহে' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত না হলেও 'ভগ্নহৃদয়ের কোন কোন অংশ মুক্ত কবিতা' রূপে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) 'কৈশোরক' ভাগে সংকলিত হয়েছিল। কবিতাগুলির বিন্যাসপদ্ধতি এবং কোন কোনটির শীর্ষনাম লীলাচিত্রণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল কাব্য থেকে কিছু নমুনা দিলে বৈষ্ণব কবিতার অনুসৃতি ঠিক কোথায় তা বোঝা যাবে।

'প্রণয়ীর নাম রসনার, সখি
সাধের খেলেনা মত,
উলটি পালটি সে নাম লইয়া
রসনা খেলায় কত

• • • • •

ফুলের মালায় কুসুম আখরে
লিখি দিব সেই নাম
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন, করিবি,
হৃদয় উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুম দাম।

• • • • •

সারা জগতের বিশাল আখরে
পরিবি তাহারি নাম। (প্রথম সর্গ)

আধুনিক কবির কলমে এ যেন রাধার পূর্বরাগের চিত্র। সপ্তম সর্গে 'অভিসারে'র ছবিও আছে :—

দেখিস রাধে না যেন চরণ লতায়—
আঁচল না ছিঁড়ে যায় গাছের কাঁটায়।
চমকি উঠিল কেন? কিছু নাই ভয়
বাতাসের শব্দ শুধু, আর কিছু নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর 'প্রেম বৈচিত্র্যে'র প্রভাবও কাব্যের কোন কোন পংক্তিতে লক্ষ্য করা গেছে—

তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়
পড়িবে উভয়ের ছায়া উভয়ের গায়

• • • •

কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ।
দুজনার মাঝে কেন এত ব্যবধান? (একাদশ সর্গ)

এছাড়াও 'ভগ্নহৃদয়ে'র প্রথম ছয় সর্গে চপলার মুখে 'পদাবলীর উপজীব্য পরকীয়া প্রেমের মর্মকথা' এবং ষড়বিংশ সর্গের কোন কোন পংক্তিতে গোবিন্দদাসের পদের প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন ড. বিমান বিহারী মজুমদার[৫]।

'ভগ্নহৃদয়'র দু একটি 'স্বগত' ভাষণে শাক্তপদাবলীর আত্মনিবেদনের স্বরও ধ্বনিত হয়েছে—

দেখি গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মা গো— কোথা গিয়ে কাঁদি।
দুর্বল এমন যে মা পাষাণেতে বিঁধি।

অবশ্য ইতিপূর্বেই 'ভারতী' (আশ্বিন ১২৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত 'আগমনী' কবিতায় শাক্ত গীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'জীবনস্মৃতি'র 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায় থেকে জানা গেছে অক্ষয় চৌধুরীর সাহচর্যে 'শ্যামাবিষয়ক গানের' সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিশোর কবি। পরবর্তী কালে 'আগমনী ও বিজয়া'কে 'বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান' বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি[৬]। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের রচনার সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত কবিতার খুব বেশি অমিল নেই—

'হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী
চুমিয়া উমার অধর খানি,
আয় মা জননী আয় মা কোলে
আজ বরষের পরে।'

উমা মেনকার আনন্দ বেদনার অশ্রুজলে বিধৃত আগমনী বিজয়ার গানের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পরিণত রচনাতেও লক্ষ্য করা গেছে—'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে, বিচিত্র প্রবন্ধের 'শরৎ' শীর্ষক রচনাটিতে কিংবা 'শারদোৎসব' নাটকে 'শারদা দেবীর ধ্যানে' 'কৈলোরক' পর্যায়ের রচনায় 'শ্যামা বিষয়ক গানের' প্রভাব আলোচনায় 'শিশুর সঙ্গীতে'র 'হরহৃদে কালিকা' (কে তুই গো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে) কবিতাটিও স্মরণীয়।

। ৪ ।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের (১২৮৪) যে সংখ্যায় (আশ্বিন) 'আগমনী' কবিতাটি মুদ্রিত হয় 'ভানুসিংহের' কবিতা প্রকাশের সূচনা হয় সেই একই সংখ্যায়—'মল্লার' সুর নির্দেশিত 'সজনী গো— / আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা'[৭] পদাবলীর পাদটীকায় জানানো হয়—'এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতিমধুর হয় না—প্রত্যুত হাস্য-জনক হইয়া পড়ে'। পাদটীকায় কয়েকটি অপ্রচলিত শব্দের অর্থনির্দেশ করাও হয়েছিল।

যেভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে 'ভানুসিংহের কবিতা' রচিত হয়েছিল,

সেই তুলনায় বলতে হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পূর্ব কৈশোরক পর্যায়ের অন্যান্য কবিতায় বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার স্পষ্ট অনুকরণ, ভাষা ও রূপে সম্পূর্ণত বটেই, ভাবের ব্রহ্মিবঙ্গ দিক থেকেও হয়তো কিছুটা। আর সেই জন্যই বিভিন্ন সময়ে এই পদগুলি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করতে দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথকে ,— কখনও বলেছেন 'মেকি' 'সস্তা অর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র', কখনও বলেছেন পদাবলীর জালিয়াতি', কিংবা 'মা সরস্বতী চোরাই মাল , আবার কখনো বা 'একে সাহিত্যের একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য' করেছেন। তা সত্ত্বেও ভানুসিংহের কবিতা একটা প্রশ্রয় মিশ্রিত 'ছাড়পত্র সবসময়েই পেয়েছে তাঁর কাছে,— যার জন্য প্রথম প্রকাশের পর নব নব সংস্করণে তা যেমন মুদ্রিত হয়েছে, তেমনি এর বেশিরভাগ পদ কৈশোরক পর্বের রচনা হয়েও রবীন্দ্রনাথের পরিণত লেখার পাশে স্থান করে নিতে পেরেছে। কবির দিক থেকে সম্ভবত এর একটাই কারণ, 'ভানুসিংহের কবিতা'র সাঙ্গীতিক গুণ এবং সাফল্য "। অন্য কারণও আছে। পদগুলি পরাণুকরণ হলেও এর মধ্যে 'ভাবের অস্ফুটতা ভাষা ও রচনাশৈলীর পরিণতির অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে।[১৯]"

গ্রন্থাকারে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ' ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও, আমরা পূর্বেই বলেছি 'ভারতী' পত্রিকায় তার মুদ্রণ শুরু হয় অনেক আগেই ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পদগুলির রচনাকাল সম্পর্কে জানিয়েছেন— "ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫ ১৬ বৎসর বয়সে লেখা —আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্তী কালের লেখাও আছে "[২০] 'পরবর্তী কাল' বলতে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছর বয়সের পরে নয় কেননা ভানুসিংহের শেষ পদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯২ ৯৩ সালে।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের কবিতা রচনা মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যথাক্রমে প্রকাশিত 'প্রাচীনকাব্যসংগ্রহের' বৈষ্ণব পদগুলি পাঠ করে। শব্দতত্ত্বের প্রতি স্বভাব কৌতূহলী কবির পক্ষে বিদ্যাপতির মৈথিলী মিশ্রিত ভাষার রহস্যময় দুর্বিগম্যতা অতিক্রম করতে অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়েছিল প্রাচীন পদকর্তাদের অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার থেকে এক একটি কাব্যরত্ন উদ্ধার করতে পারার আনন্দেই উৎসাহিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে ব্রজবুলি কবিতার ভাষা, ছন্দ, ধ্বনিমাধুর্যে মোহিত হয়েই এগুলি অনুসরণ করার অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা তাঁর মনে জেগেছিল রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন "এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে "[২১]

ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণে 'ভানুসিংহে'র প্রথম পদ 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে / মৃদুল মধুর বংশি বাজে'। আসলে এই কবিতায় গোবিন্দ দাস কবিরাজের 'শারদচন্দপবনমন্দ'

ইত্যাদি পদের ছন্দ শব্দালঙ্কার ও সুরধ্বনি ধরা পড়েছে বিদ্যাপতির প্রভাবের চেয়ে বেশি। পরবর্তী কালে ভানুসিংহের অন্যান্য কবিতায় দুরূহ অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের চেষ্টাকৃত যে আড়ম্বর তা থেকে মুক্ত ছিল বলেই এটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাল্যকালে অর্থ না বুঝে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ 'শব্দ ও ছন্দগ্রন্থির' আবিষ্কারের কিশোর কবির মন যেমন হর্ষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল ভানুসিংহেও অনেকটা সেই ধরণের পরীক্ষা নীরিক্ষা এবং নতুন আবিষ্কারের আনন্দ ফলে বিদ্যাপতি-গোবিন্দ দাসের ব্রজবুলি ছাড়া জয়দেবের ছন্দের ছোঁয়াও পদগুলিতে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী (পৃ ৮) কিংবা চল সখি কুঞ্জ সতিমিরপুঞ্জং (পৃ ১১) ইত্যাদির শ্লোক ভানু সিংহের পদে ছন্দ সৌন্দর্যের ঝঙ্কার তুলেছে। ধ্বনির স্পষ্ট অনুরণন আছে নবম পদটিতে —

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূণ্য নিকুঞ্জ অরণ্য
কুসুমিত মালতী সুবিজন নিলয়
বালা বিরহ বিষণ্ণ।

পাশাপাশি মেলানো যাক গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের দশম শ্লোকটি—

পতত্রে পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্

ভানুসিংহের

বসন্ত আওল রে
মধুকর গুণ গুণ অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।

গ্রন্থের প্রথম পদটিতেই বিদ্যাপতির

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিমগিরিবসি ধাবল
লিয়া নিজ দেশ না আওইরে। ইত্যাদি পদের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পদটির (হৃদয় সাধ মিশাওল হৃদয়ে/ কণ্ঠে বিলিনমালা) সঙ্গেও জয়দেবের 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী' ইত্যাদি শ্লোকের ছন্দের আদল লক্ষণীয়। পদগুলির শেষে ভানুসিংহের ভণিতা দেওয়ার ব্যাপারেও বৈষ্ণব কবিদের যথাযথ অনুসরণ

করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মঞ্জরী ভাবের ভণিতা গোবিন্দ দাসের পদেই বেশি দেখা যায়, ভানুসিংহেও আছে—

নদী-মগন মহী, ভয় তব কিছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ। (সপ্তম পদ)

বৈষ্ণব কবিদের প্রত্যক্ষ অনুকরণ অনুসরণের দৃষ্টান্ত আর বাড়াতে চাই না। তবে একথা বলতেই হয় বৈষ্ণব ব্রজবুলি কবিতার সঙ্গে ভানুসিংহের পদের বহিরঙ্গের মিল বেশ গভীর। ওপর ওপর পড়লে উভয়ের পার্থক্য সহজে ধরাও যায় না। পদ গুলির রচনার প্রবাহিত পরেই গ্রন্থটি সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর রিপোর্টে অনেকটা এই ধরনের মন্তব্যই করেছিলেন ——"*The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better versifier the imitator Bhanusimha Thakur or his model the great Baisnaba poet.*"[৬৭]

যেহেতু ব্রজবুলি একটা কৃত্রিম ভাষা, তাই প্রাচীন পদকর্তার বা'লে ভানুসিংহের কবিতার চলাফেরাও চলিত, অন্যথা অসম্ভব নয়। একথা স্বীকার করেও পদগুলির ভাবের গভীরতা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম [illegible] সুর। [illegible] বীতরাগ বাহ্যকলাবাদের উৎকর্ষে ভানুসিংহের পদাবলী সমসাময়িক কালে রচিত আর সব রবীন্দ্রকবিতার চেয়ে অনেক উঁচুদরের। শুদ্ধসত্ত্ব নিজে লিখেছেন—"প্রভাতসঙ্গীত ও 'ছবি ও গান' কবির পরিণত কাব্যকে যেন দিয়ে [illegible] পরবর্তীদের সাহায্যছাড়া কোনো পাঠক তাহাদিগকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহের পক্ষে এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আপনাতে আপনি নিভৃত ও সম্পূর্ণ।" এই নিঃসম্পর্ক "আধুনিক কবির মনোধর্মদ্যোতক" কবিতাগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহতীব্রতা অপেক্ষা 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়ে'র মত রোমান্টিক কৈশোর উচ্ছ্বাসই প্রবল। যার জন্য পদগুলি হয়েছে দীর্ঘ। বৈষ্ণবপদাবলীর ফেনায়িত রূপ। ভাষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন কবি। ভানুসিংহের কবিতা মধ্যযুগের ব্রজবুলি ভাষার হুবহু অনুকরণ নয়। এক ধরনের ছদ্মবেশী বাঙালী বাগরীতি তাঁর মধ্যে সব সময়েই ছিল। 'তৃষিত নয়নে বন পথপানে / নিরখে ব্যাকুল বালা' এ [illegible] বাংলা। কিংবা 'হাসিবার তব সঙ্গ মিলে যদি, কাঁদিবার কো নাই'— মধ্যযুগের কোন প্রথমশ্রেণীর কবির হাত দিয়ে ব্রজবুলির এমন অদ্ভুত প্রয়োগ ঘটত কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকৃতি বলে কেউ যদি ভানুসিংহের মধ্যে বৈষ্ণবীয়তা বুঝতে যান তা হলে বৃথা। শশিভূষণ দাসগুপ্ত খুব সুন্দর করে বলেছেন—"ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির যে সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিতার সহিত 'ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সম্পর্ক তাহা হইতে কিছু বেশী নহে।"[৬৮]

বস্তুত ভানুসিংহের কবিতায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবণতাই ধরা পড়েছে, যেখানে পূর্বতন কবিদের অনুকরণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই নিজের স্বাভাবিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। আর সেই জন্যই পদগুলি নির্গুণ বা অসার্থক নয় মোটেই। হয়তো তাতে পরিমার্জনার অভাব ছিল, অপরিণত কবি স্বভাবের কাছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিতা যদি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে এবং নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় তবে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র শিল্পাঙ্গে আদৌ মেকিত্ব নেই তা উচ্চাঙ্গের কাব্য —এমন স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যের সুসমালোচক ।[৮]

তা হলেও একথা স্বীকার করতেই হয় রাধাকৃষ্ণলীলার রসতত্ত্বের আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ না করেও বৈষ্ণব ভাবপ্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছিলেন স্বাভাবিক প্রবণতায় নিজের কবিকল্পনায় উপনিষদ এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। এখানে শুধু বলার কথা এইটুকুই বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় ভাবাদর্শকে পরিহার করে তার প্রেমভাবনার পরিশ্রুত মহিমাকেই নতুন জীবনানুভাব গ্রহণ করে নিতে পেরেছিলেন তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে তার অস্ফুট সূচনা পরবর্তীকালের রবীন্দ্র কবিতার দেহে মনে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে ভাবেই হোকনা কেন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ভাব সুর ছন্দ রূপকল্প নানা প্রকরণে মিশে যেতে পেরেছে—আজীবন শুধু সচেতন মনেই নয়, অবচেতনাতেও বৈষ্ণবভাবুকতাকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিহার করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, বৈষ্ণব কবিরা রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব ' [৯] 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে তারই মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য :—

১ বুদ্ধদেব বসু : সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩) পৃ ১৫১ ১৬২।

২ দ্র জীবনস্মৃতি, 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়।

৩ প্রসঙ্গকথা সাধনা আষাঢ় ১৩০০, পৃ ১৯৬।

৪ দ্র প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠি, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৬, পৃ ৩০ ৩১।

৫ প্রশান্ত কুমার পাল : রবিজীবনী ১ম খণ্ড (২য় সং পৌষ ১৪০০) পৃ ৮৮ ৮৯ থেকে উদ্ধৃত।

৬ পরবর্তীকালে 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে 'পথহারা' কবিতায় পুনরায় 'সিঙ্গি মামার ডাক' এর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ

৭ ছেলেবেলা, রবীন্দ্ররচনাবলী (শতবার্ষিক সং) ১০ম খণ্ড পৃ ১৩৪

৮. দ্র. দেশ ২১ বৈশাখ,১৩৫৮ পৃ ১১।

৯. দ্র সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী আশ্বিন ১২৮৭, পৃ ২৯২ ৯৩।

১০ রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা দেশ ২৯ মে ১৯৭৬ পৃ ৩০৯

১১ দ্র ঈ বী হ্যাভেল, প্রবাসী মাঘ ১৩৪৫, পৃ ৪৯৪

১২. প্রাবণ ১২৮৬ পৃ. ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

১৩ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, পৃ ৬৭ ৬৮।

১৪ ছেলে ভুলানো ছড়া লোকসাহিত্য (১৯৭১ মুদ্রণ) পৃ ৩৫

১৫ পদটি গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় 'আকারে ও রূপে' অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছিল গ্রন্থে (১৩ নং) পদটির কয়েকটি পংক্তি বর্জিত হয় প্রথম পংক্তিটি হল 'সজনী গো — / শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা' ভানুসিংহের অধিকাংশ কবিতাই প্রথম 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনেক পদের বহু পংক্তি যেমন বর্জিত হয়েছে তেমনি পরিবর্তন সাধনও হয়েছে অনেক দ্র ১৩৭৬ সালের 'পাঠান্তর সংবলিত' সংস্করণ।

১৬ প্রথম প্রকাশের সময় ভানুসিংহের সবকটি পদের সুর নির্দেশিত হলেও, মাত্র ন'টি সুর এখন পাওয়া যায় দ্র স্বরবিতান ২১.

১৭ ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৮২ সং) পৃ ৩০৬

১৮ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সংখ্যার দিক থেকে মোট ২২টি এর মধ্যে ১৩টি 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে প্রকাশিত ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পদছিল ২১টি। আর একটি পদ (কোতুহ বোলবি মোয়) পরে ১২৯২ ৯৩ সালে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১২৯৩ এ 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে সংকলিত হয় সেটি সর্বসাকুল্যে এই ২২টি পদের মধ্যে কুড়িটি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বর্তমান থাকে— প্রথম সংস্করণ থেকে দুটি পদ ('সখিরে—পিরীত বুঝবে কে' এবং 'হম সখি দারিদ নারী') বর্জিত হয়। ১৩৭৬ সালের 'পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণে' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ১ম খণ্ডে (১৯৮০ সং) সংযোজন হিসাবে পদ দুটি পুনরায় গৃহীত হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২২টি পদের মধ্যে আটটি পদ কোন পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়ে সরাসরি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে

১৯ দ্র ভূমিকা, কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)

২০ জীবনস্মৃতি, ভানুসিংহের কবিতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২১ দ্র বিমান বিহারী মজুমদার : রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান পৃ ২২ ২৩।

২২ ভানুসিংহের পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্র বৈষ্ণব কবি গোষ্ঠীর উত্তর সাধক রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী কার্তিক ১৩৬৯ পৃ. ১২-২০।

২৩ রবিজীবনী ২য় খণ্ড (১ম সং) পৃ ২৭৬ পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত

২৪ রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (নবম মুদ্রণ) পৃ ৪১

২৫ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (পাঠ্যেতু সংবলিত সং ১৩৭৬) গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য

২৬ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা (১ম খণ্ড) পৃ ৩১-৩৬।

২৭ বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ পৃ ৭৩

২৮ প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, পৃ ৪০ ৪১।

২৯ রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক দেশ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ পৃ ১৯৪ দ্রষ্টব্য

নজরুলের কবিতা 'বিদ্রোহী ঃ শৈলীগত বিশ্লেষণ

অভিজিৎ মজুমদার

১০ নজরুলের কবিতা এবং 'বিদ্রোহী' ঃ

কবির অভিপ্রায় এবং কবিতার সংগঠন — এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে এক সুগভীর যোগসূত্র। সে সম্পর্ক কখনো কবি সচেতনভাবে গড়ে তোলেন, কখনো আবার তা গড়ে ওঠে কবির অজান্তে। শৈলীবিজ্ঞানের (Stylistics) লক্ষ্য হলো, সম্পর্কের সেই গূঢ় বিন্যাস আবিষ্কার করা এবং সূত্রায়িত করা।

সমাজ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিম্বা ব্যক্তিগত জীবনবোধের প্রেক্ষাপটে নজরুলের কবিতার বিচার ও বিশ্লেষণে কোনো আপত্তি নেই। কারণ আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যকৃতিকে এ ভাবে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি স্বীকৃত এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয়ও বটে। কিন্তু এরই পাশাপাশি কবিতার শব্দময় শরীর নিয়ে কবিকে চিনে নেওয়াটাও সমান জরুরি। কবিতার বিষয় (content) নিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা যতটা প্রয়োজনীয়, গঠনের (form) দিক থেকে তাঁর অভিনবত্বের ধরনটি বুঝে নেওয়াও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বর্তমান আলোচনায় নজরুলের বহুপঠিত এবং সমালোচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমরা বেছে নিয়েছি। এ কবিতা অন্যান্য পরিচিত কবিতাগুলির থেকে ভাবে একটু আলাদা। কবি এখানে অতিমাত্রায় সিরিয়াস, কবির মধ্যে কাজ করে এক ধরণের টেনশন। তা থেকে মুক্তি পেতে কোমল ও মধুর পৃথিবীর আশ্রয়েও তিনি ছুটে যান। স্বর্গীয় 'আমার কৈফিয়ৎ' এ এর বিপরীত চিত্র। গোটা কবিতায় মহাদার ভঙ্গিতে সমালোচকদের আক্রমণ করতে করতে একেবারে শেষ চার স্তবকে তিনি নিরাবেগ হয়ে ওঠেন। পরিবেশন রীতির দিক থেকেও 'বিদ্রোহী' কবিতা স্বতন্ত্র। 'আমার কৈফিয়ৎ' এর সংলাপ প্রধান কথা চাল অথবা 'সাম্যবাদী' ব 'মানুষ' কবিতার মতো নাটকীয় আখ্যানের ধাঁচ আলোচ্য কবিতাটিতে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র 'আমি' কে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের চিত্রপরম্পরা সাজিয়ে তোলেন কবি এখানে। কাজেই এ কবিতা আদ্যন্তই আত্মকথনমূলক আঙ্গিকে গড়া।

'বিদ্রোহী' কবিতার মূল উপজীব্যই হ'লো শৃঙ্খলাহীন উত্তেজনা আর উল্লাসে সমস্ত প্রতিকূলতাকে বিপরীত আবেগের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া। কবি এ কবিতায় শুধু যে ভাবের জগতেই বিদ্রোহ করেন তা নয়, কবিতার ভাষা নিয়ে গড়া শরীরেও এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটান। কবিতার নিজস্ব গড়নেই আমরা পেয়ে যাই এক শৃঙ্খলাহীন সমগ্রতার সন্ধান। কবিতার স্তবক সংখ্যার প্রথাগত রীতি ভাঙেন কবি। স্তবকগুলি অসমান, অন্ত্যানুপ্রাসে নেই কোনো ধরাবাঁধা প্যাটার্ন।

অথচ লক্ষণীয়, 'সঞ্চিতা' সমগ্রের দ্বিতীয় কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' রচনা

ভাবের দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সমধর্মী। কবি এখানেও [illegible] অনুভব করেন। কিন্তু ভাবের দিক থেকে শৃঙ্খলাহীন উত্তেজনার বাহক হলেও ভাষার দিক থেকে এ কবিতা সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। 'আজ জাগল সাগর, হাসল মরু, কাঁপল ভূধর কানন তরু' জাতীয় সজ্জায় একই ধরণের ক্রিয়া আর বাক্যের আবর্তন এক সমতে ছন্দোলয়ের (*rhythm*) সৃষ্টি করে। ভাব ও ভাষার এই বিপ্রতীপতা 'বিদ্রোহী' কবিতায় নেই। ভাব আর ভাষা দু'দিক থেকেই কবির বিদ্রোহ। ফলে ভাব এবং ভাষা কবিতাটিতে সমান্তরাল পথের যাত্রী হয়ে উঠেছে।[৭]

১.১ 'বিদ্রোহী' কবিতার অভিপ্রায় (*intent*) বিচার :

সাহিত্য সমালোচকের সুগভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটির বিচার করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবিতার সন্দর্ভে (*discourse*) পাঁচটি মোটিফ আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথমত, সমগ্র কবিতা কবিচিত্তের চরম উত্তেজনার অনুরণন। কবিতার মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন কবি।

১ ক) 'আমি দুর্বার, আমি এভেঙে করি সব চুরমার' (২য় স্তবক)

খ) 'আমি ধূর্জটি, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল' (৭ম স্তবক)

দ্বিতীয়ত, কবির অন্তরে জমাট বেঁধে থাকে এক অবরুদ্ধ আবেগ। হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে সে আবেগ কখনো কখনো পাঠকের কাছে প্রবাহিত হতে চায়। ফলে রুদ্ধ প্রাণ আর মুক্ত আবেগের দ্বন্দ্ব কবিতার শরীর জুড়ে বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ কবির রুদ্ধ আবেগ যেমন 'আমি' সত্তার অন্তরালে বন্দী থাকে — 'আমি চিরদুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস', তেমনি এই 'আমি'ই সক্রিয় হয়ে উঠে কবি আত্মার অবরুদ্ধ অর্গল খুলে দেয় — 'আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমি কম্প, ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'। প্রকৃতীয় কবিতার সংগঠনে ক্রিয়া উহ্য বাক্যে রুদ্ধ আবেগ প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে আবেগের মুক্তি ঘটে। যেমন

২ ক) 'আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, আমি আপনার তালে নেচে যাই' (৩য় স্তবক)

খ) 'আমি চঞ্চল, আমি ধূর্জটি, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল' (৭ম স্তবক)

তৃতীয়ত, সমগ্র কবিতায় কবি যেন নিজেকে শনাক্ত করতে চান। পাঠকের কাছে নিজের আইডেনটিটি তুলে ধরার অভিলাষী তিনি। বলাবাহুল্য কবির এই আইডেনটিটি সর্বদাই দ্বিধাবিভক্ত। কখনো কমনীয় লাবণ্যে তার পরিচয়

৩ ক) 'আমি উচ্ছল জল ছল ছল' (৫ম স্তবক)

খ) 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী' (৮ম স্তবক)

কখনো আবার অমঙ্গলকারী কবিসত্তার উদ্বোধন

৪ ক) 'আমি দাবানল — দাহ, দাহন করিব বিশ্ব' (৫ম স্তবক)

খ) 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ' (২য় স্তবক)

চতুর্থত, কঠোর, কোমল, মঙ্গল-অমঙ্গল দু'য়ের এক দ্বন্দ্ব তুলে ধরা কবির অন্যতম অভিপ্রায়, যদিও এরূপ দ্বন্দ্বকে কল্যাণময় পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে দেওয়া তাঁর লক্ষ্য নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে ছড়িয়ে থাকা চরণে যেমন কবির দ্বিধান্বিত আত্মপরিচয় মেলে, তেমনি একই স্তবকের চরণ বিন্যাসে এ দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ —

৫ ক) 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস' (৪র্থ স্তবক)

খ) 'আমি উত্থান, আমি পতন' (৭ম স্তবক)

বস্তুত, এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই কবির অভ্রভেদী সামগ্রিক মহিমান্বিত 'আমি' র অনুভব।

পঞ্চমত, কবিতার নামকরণ কবির আরেক অভিপ্রায় স্পষ্ট করে তোলে, তা হ'লো প্রচলিত প্রথা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে গৌরবদীপ্ত 'আমি'-র উজ্জীবন।

৬ ক) 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' (২য় স্তবক)

খ) 'আমি মানিনাকো কোনো আইন' (২য় স্তবক)

গ) 'আমি চির বিদ্রোহী বীর' — (শেষ স্তবক)

বলা বাহুল্য, কবির এই অনুভব কবিতার গঠনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়, সে প্রশ্ন শৈলীবিজ্ঞানীর। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে বিচার করার চেষ্টা করবো, নজরুলের ভাষাশৈলীতে কীভাবে তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায়গুলির প্রতিফলন ঘটেছে

১.২ শৈলীগত কৌশল : পুনরুক্তি এবং সমান্তরতা :

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির মূলধন উত্তেজনা ও আবেগ ভাষার জগতে অনেক সময়ই যার প্রতিফলন ঘটে পুনরুক্তির *(repetition)* মাধ্যমে। ধ্বনি বা দলের *(syllable)*, শব্দ বা শব্দগুচ্ছের, এমনকি বাক্যাংশ বা পুরো বাক্যের পুনরুক্তি কাব্য বা কবিতার এক বিশেষ কৌশল। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে এধরণের পুনরুক্তি সমান্তরতার *(parallelism)* সূচক। অবশ্য যে কোনো পুনরুক্তিই সমান্তরতা পদবাচ্য নয় পুনরুক্তি যখন সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, তখনই তাকে সমান্তরতা বলা যায়, নচেৎ পুনরুক্তি কেবলমাত্র *mechanical* বা যান্ত্রিক হিসেবে পরিগণিত হতে বাধ্য।

কবির আবেগ ও উত্তেজনা প্রকাশ করতে পুনরুক্তি এবং সমান্তরতা যে একটি শৈলীগত কৌশল, তা ভাষাবিজ্ঞানী *Leech*-এর বক্তব্যতে প্রমাণিত* — *'By underlining rather than elaborating the message it presents a simple emotion with force It may further suggest a suppressed intensity of feeling for which there is no outlet but a repeated hammering at the confining walls of language'* B R Lewis তাঁর *'Creative poetry'* গ্রন্থে লিখেছেন আদিম মানুষ *"if strongly aroused and if his emotion was sustained must have repeated the same sequence of sounds (Princeton Encyclopaedia of poetry and poetics Alex Preminger [ed] p 529*

আপাতদৃষ্টিতে নজরুলের কবিতায় এজাতীয় পুনরুক্তির প্রাচুর্য দেখে মনে হতে পারে,

এ নিছকই কবির ভাষা-প্রয়োগের সেলা। কিন্তু বস্তুবে পুনরুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কবির রুদ্ধ আবেগের সরল বহিঃপ্রকাশে ঘটে। আরও লক্ষণীয় কবি 'বিদ্রোহী' কবিতায় নিজের সত্তাকে তুলে ধরতে চান। ক্রাইভ বেলের ভাষায় *Because I wish to be understood I repeat myself*। নিজের পরিচয় পাঠকের কাছে নিশ্চিত করে তোলার জন্যই পুনরুক্তি এবং সমান্তরতার প্রয়োগ ঘটে কবিতায়।

১.৩ কবিতার দ্বন্দ্ব : মিল ও অমিলের বৈপরীত্য :

'বিদ্রোহী' কবিতায় উদ্ধৃত আবেগের পাশাপাশি কবির মনে একধরণের দ্বন্দ্বও কাজ করে। কবিতার ভাষাতেও তার ছাপ পড়ে যায়। পুনরুক্তি এবং সমান্তরতার কবিতার শরীরে এক মিলন জন্ম দেয়। ফলে কবিতা হয়ে ওঠে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিটোল। কিন্তু কবি এই সুসমঞ্জস পৃথিবীর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চান না। মিলের প্রত্যাশা ভাঙে অমিলের প্রত্যাশাকেও তিনি গড়ে তোলেন। শৈলীগত বিচারে মিল ও অমিলের বৈপরীত্য অবশ্যই কবির মুন্সিয়ানা। যা অনেক সময়ই কবির সচেতন অথবা অবচেতন মনের প্রতিফলন। এই দ্বন্দ্বের শৈলীগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক তাই বলেন — মিল প্রয়োগের কলার মধ্যে একটি বিপরীত তার টানাপোড়েন চলেছে। প্রত্যাশিত যদি আসে অনিবার্যতার পথে তাহলে তার চমৎকৃতি কোথায়? অপ্রত্যাশিত পথে যখন প্রত্যাশার পূরণ হয় তখনই তাকে সুন্দর মিল বলে গ্রহণ করি। একদিকে মিলের অবধারিত আহ্বান মধুর প্রলোভন অন্যদিকে কবির সংযম মিলকে শাসন। ভাষা বিজ্ঞানী *Leech* এ কারণে বলেন, '*In any parallelistic pattern there must be an element of identity and contrast*।'

বলা বাহুল্য প্রত্যাশার সুসংহত বাঁধন থেকে অপ্রত্যাশার শৃঙ্খলার মধ্যে এক ধরণের বিদ্রোহ আছে। জীবনের ক্ষেত্রে প্রধানত তার কেবল ছেড়া বিদ্রোহ ভাষার ক্ষেত্রেও প্রভাবিত করে। কবি মিলের আহ্বানকে যেমন মেনে নেন তেমনি অমিলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ ঘটান।

কাজেই উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে সমগ্র কবিতায় কবির ভাবগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় ভাষারূপে পুনরুক্তি এবং মিল অমিলের দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমান্তরতা মাধ্যমে।

এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার লেখকের ভাষাপ্রয়োগে মিল-অমিলের সাংবদ্ধতা এক জটিল সম্পর্কের শাসনে নিয়ন্ত্রিত। মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব ধ্বনি, শব্দ পদগুচ্ছ, বাক্য ও চরণের গঠন, এমনকি অর্থের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অনুশাসিত।

১.৪ ধ্বনিমিলের প্রযুক্তি এবং 'বিদ্রোহী' :

নজরুলের আলোচ্য কবিতায় ধ্বনি, শব্দ এবং বাক্যের স্তরে মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রযুক্তিগত এক টেকনিকে পরিণত হয়, তা খুঁজে বার করতে কবিতার একেবারে প্রথম স্তবকটিকে বেছে নিতে পারি। অবশ্য প্রয়োজনবোধে মূল বিষয়ের বিশদীকরণের স্বার্থে

[illegible]

'বল বীর —

বল উন্নত মম শির

[illegible]

উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর'

[illegible]

প্রচিত্ত করবে।

[illegible]

দ্বিতীয় চরণ।

[illegible]

বৈচিত্র্য তৈরী হয় নানা ভাবে।

[illegible]

আরো স্পষ্ট করে তোলে।

[illegible]

'হিমাদ্রির' প্রভৃতি শব্দে।

[illegible]

ফিরে এসে এক ধরনের অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করে।

[illegible]

	চরণান্ত মিলের অন্ত্যাক্ষর	চরণ
ঘ (ক)	ে	১
		২
	↓	৩
	ই	৪
	↓	৫
(খ)	ুল	৬
		৭
		৮

[illegible]

[illegible]

১৫ শব্দের পদান্তরগমন এবং অর্থসংহতি :

[illegible] *effect)* ঘটায়।

[illegible] পূর্বপদ পরাক্রান্ত

[illegible]

৮ [illegible]

সূত্র : (a) (a)

খ) চরণের অন্ত্যপদ পূর্বপদ হিসেবে পুনরুক্ত।

সূত্র : (a) (a)

গ) সমাসবদ্ধ গঠনে পূর্বপদের মিল

সূত্র : (ab) (ab)

ঘ) সমাসবদ্ধ গঠনে অন্ত্যপদের মিল

সূত্র : (a b) (a b)

[illegible]

সূত্র : (a-ab)

চ) একই চরণে একই পদ পুনরুক্ত।

সূত্র : (a a)

[illegible]

সূত্র : (ab) ... (ab)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্তরে মিল-অমিলের ছন্দ তাৎপর্যপূর্ণ।

[illegible] x [illegible]

৯. ক) x → কর্তা *(subject)* [১ম চরণ]

খ) x → কর্ম *(Object)* [২য় চরণ]

গ x → কর্ম, [illegible] *(Object)* [৩য় চরণ]

[illegible] x [illegible]

এমন চরণগুলির তুলনায় এ ছন্দ [illegible]

বল বাঁধ ৫৮
বল উন্নত মন শিল্প ৫৮
বল বাঁধ ৫৮
বল বিশ্বজীব ৫৮
১ উঠিয়াছি (বিশ্বজীব) [illegible]

'উঠিয়াছি' ক্রিয়ার অপভ্রংশ

শিব ছাড়া দাঁড়ায়।

ঘ) 'মোদের আসন 'আরশ' ছেনিয়া' ঃ কর্ম, ক্রিয়া,

[illegible]

লক্ষ্য করা যেতে পারে

[illegible]

শব্দের বৈচিত্র্য

[illegible]

বিরাজমান

[illegible]

গঠনের পুনরাবর্তন ছিলেন জন্য দায়ী

[illegible]

উপসংহার ঃ

[illegible]

ঃ নির্দেশিকা ঃ

১ [illegible]

[illegible] /কবি প্যাটার্নের আভাস

[illegible]

১৯৯৭, পৃ ১০)

সমগ্র ভাষা তিন দিক' (পৃ ৯)

পৃ ৪.১০

৭ *Leech*-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচনা ; *p* 65)

করেন।

from linguistic

'কল্লোলযুগ' ও বাংলা কবিতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

[illegible]

[illegible] যাবে না।

দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

সেখানে মোটেই বৌদ্ধ নয়

[illegible]

[illegible]

হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। —

এ মোর অহঙ্কার নয়, এ মোর যথার্থ অভিলাষ
[illegible]
কারেও ডরি না কভু সুকঠোর ভবের সংসার,
[illegible]

পশ্চাতে শত্রুর শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকেন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—
[illegible]

[illegible] মাত্রাটা একটু বেশি এই যা

[illegible]

যাপিলাম কত শশকতন্তু রজনী নিদ্রাহীন

(প্রথম যখন দেখা হয়েছিল : অমাবস্যা)

দেহের ধূর্পতি হতে জ্বলে ওঠে বাসনার ধূপ

('প্রিয়া ও পৃথিবী' : অচিন্ত্যকুমার)

খ এসো কাছে, পৃথিবীর সকল সুগন্ধী

('মোহমুক্ত' : মৃণালেন)

গ যে অরণ্য বন্দী হোলো সুন্দর তনুতে
তারে আমি বেসেছিনু, চেয়েছিনু হাত,
চুমিতে চেয়েছি।

ক নশ্বর মৃত্তিকা দেহে
জর্জর তৃষিত দীন যত নরনারী,
ধূলার মলিন অঙ্কে ধূলিশয্যা শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি,
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা অভিশাপ
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, ক্ষুধা, ক্রন্দন,

কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ
সযত্নে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বপন।
সেই নমস্কার,

('নমস্কার', বিজলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

মণির বিহনে যালা জুড়াইল কামনার কাচ

[illegible]

অন্য কারণে

একবিংশ শতাব্দীর কোনো সপ্তদশী

[illegible]

সাতাশের তারা

[illegible]

জ্বালা, ছাও কুট!

[illegible]

কবিতাটা দেখি —

[illegible]

এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—

[illegible]

[illegible] রোমাঞ্চ হয়ে আছে।

মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয় প্রেম নয়—ফেলো এক শেষ কাজ কার

[illegible] কাব্যাচর্চাতেই তার স্পষ্ট ছায়া পেয়ে গেছে।

[illegible]

ইতিহাসের মুখোমুখি : যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

শুধু সাহিত্য [illegible] [illegible] যায়।

কবি সাহিত্যিক [illegible] ইতিহাসের [illegible] বিপুলতা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

কবিতার সঙ্গীতধর্ম একেবারে অমোঘ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যতীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরাও অনেকক্ষণ [illegible]দের মনে জাগরূক থাকে

[illegible]

[illegible] পারেন [illegible] তো ইতিহাসের সদ্য [illegible] কিন্তু সম্পর্কে নয়, এই লাইনে বোধ হয় শতকরা নিরানব্বই জনের।

[illegible]

স্বাধীনতা পরবর্তী কবিতা : উৎস ও বিবর্তন

গৌরিকা ঘোষ

[illegible]

নিত্যকালের দরবারে নিতান্ত ছোট্ট কবিতার প্রাণবস্তু [illegible]

[illegible] বটে। কিন্তু যিনি কাব্য তিনি একই [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মায়ের সামনে, নিতে পারল না যমজ-ভরা মায়ের [illegible]

[illegible] হতে থাকে দুর্নীতি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আইডেন্টিটি

[illegible] **প্রজ্ঞাদ্বেদ কবিতায়।**

[illegible] **চেয়ে আর কি নরক স্বাধীন স্বদেশে।"**

স্বাধীনতা [illegible]

[illegible]

ও আত্মায় জ্বলে ওঠে শাশ্বতিক আলো।

[illegible]

বিশ্বের টোপর নিয়ে।" (যমুনাবতী)

[illegible]

মর্মকথা

[illegible]

(ভ্রূভাঙ্গের সাথি)

[illegible]

উপরে (অঞ্জলি)।

[illegible]

সমাধান তৃতীয় ভুবন (ভূমসাসাগর)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারত বেশী (খানি)

[illegible]

নিষ্ক

[illegible]

বইটিতে আর তেত্রিশ [illegible] উপাসনা ও

[illegible] এক অবলম্বন [illegible] বলে — "অবনী বাড়ী আছে?

[illegible] সুনীল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম।

[illegible] শুধু [illegible] সম্ভবত [illegible] জটিল [illegible] ও [illegible] দিন।

সুনীলের [illegible] করলো [illegible] মৃত্যু হয় না।"

সুনীলের [illegible] সুনীলের [illegible] এইভাবে [illegible] পেতে চান [illegible] মানুষ [illegible] সম্পর্ক [illegible] ও আনন্দ [illegible] চিরমুহূর্ত— [illegible] সময় [illegible] থেমে আছে। [illegible] এখনও [illegible] ও [illegible] নারী [illegible] সুন্দর দেহসৌষ্ঠব [illegible] নারী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তোমার পাশে হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ানোর।"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অস্থির এক জ্বালা। রাজনীতির চাতুরী, [illegible], তরুণ হৃদয়ের মাথা তৈরী করেছিল [illegible] **আন্দোলনের ঘোষিত** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সেজ নয় যে তিভিং লাগাবে। (মা কি ডাকাত)

[illegible]

বিদায় বন্ধুগণ, গমগানে খাঁচের মধ্যে
শুয়ে, এই শিখার কমাল নাড়া নিভে গেলে
[illegible]

[illegible]

"ছাই মেটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা"।

পঞ্চাশের দশকের মহিলা কবি

সুতপা ভট্টাচার্য

[illegible]

যথাযথভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

[illegible]

অনুসন্ধানের মন্ত্রণাময় পথ কবিতাকার সুচনাতে [illegible] পঞ্চাশের মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই [illegible]

পুরুষতন্ত্র মেয়েদের [illegible] ভূমিকায় [illegible] করতে চায়। [illegible] ভূমিকা [illegible] মেয়েদের স্বভাব বলে [illegible] ঈশ্বর কখনো [illegible] কবিতা পঞ্চাশের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] শিল্প [illegible] মুগ্ধ সুরে [illegible] স্বর [illegible] যন্ত্রণাতে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

'নারীর যন্ত্রণা' কবিতাটিতে [illegible] পরকীয়া কালে [illegible] মধুর কল্পনায় / নিমগ্ন আমার প্রেম [illegible] এই প্রেমের কবিতাটির [illegible] এ কবিতায় সংস্কারবদ্ধ সে যুগের [illegible] আসঙ্গে নির্ভীক নই [illegible]

প্রলয় [illegible]

[illegible]

[illegible]

করে শিপ্রা যখন লেখেন

[illegible]

কবিতার পংক্তিগুলি এরকম—

[illegible]

[illegible]

সে যন্ত্রণা প্রকাশ করা সম্ভব?

[illegible]

পেয়েছি চমক জাগানো [illegible]

[illegible]

[illegible]

তাঁদের সম্পূর্ণ কবিকর্মসূচি [illegible]

এইটুকু মাটি

[illegible] কাল হোলে তবে সব ক্ষতি এই
যদি আমি মেনে নিই তবে নিশ্চয়ই
আমার 'আমি'ও যাবে। তাই জানি, জানি
এরা নয় সত্য, শুধু সত্য মোর বাণী।'

কবিতা পত্রিকায় [illegible] কবিতা সংখ্যা [illegible] ঘরের মধ্যে আর বাইরের [illegible] উপভূমিকা ও কবিতায়, [illegible] ধারে [illegible] পথের সবকেই [illegible] ঠোঁটে [illegible] আরো কবিতা [illegible]

[illegible] স্থান পর্যন্ত যদিও [illegible] স্বীকৃতি আছে তার প্রবন্ধ [illegible]

[illegible]

কিন্তু সেইসঙ্গে প্রথম থেকেই [illegible] কবিতাতেও বিশেষ [illegible]

সে প্রজন্ম [illegible] সে প্রজন্ম [illegible] আমি
তবু কি চেনেনি চোখে গর্ভিনী ভাষা
ভূমিষ্ঠ হতে হয়তো অনেক বাকি
অধৈর্য হয়ে হত্যা কোরো না আশা।'

নবনীতার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নের [illegible] এবং কবিতায় [illegible] রূপ নিয়েছে অভিজ্ঞতা, মাতৃত্বের মতো [illegible] আরো দেখি [illegible] পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে [illegible] 'নিরালম্ব নিষ্কলঙ্ক, পরিচয়হীন দীনতায় ডুব দিয়ে উঠে / আবার বিস্ময়ে পড়ে কি [illegible] পরিচয় অন্বেষণের পথে এই কবি 'দর্পণ' এবং সত্যকে গ্রহণ করেন, সে সত্য আমাদের সমাজের যে কোনো নারীর পক্ষেই সত্য [illegible] জাত যে নিস্তব্ধ, অকারণ ভয় ভাব / বাঁচাতে ফিরে যেতে রাজি সে সুতরাং। কিন্তু এই সত্য স্বীকার করেও তো [illegible] আত্মপরিচয় এবং 'প্রাপ্তি'র কথা বলতে হয়, যা আগের যুগের কবির কবিতায় পাইনি

এবার নিজেকে খোলো .
[illegible]
এবারে নিজের ঘর কাড়ো।
এখন নিজের হাতে নিজেকে নির্মাণ—
সদর্পে হরণ করো নিয়তির শাড়ি।

[illegible]

(২)

[illegible] আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।"

[illegible]

করে আসছে সমাজ, তার মিথ্যাত্ব এই

কবি উপলব্ধি করেন :

'হাত থেকে পড়ে গেছে সাধের ঈশ্বর।

খণ্ডগুলি অর্থহীন, অঙ্গুরুল [illegible] না

শ্রান্তিহীন বক্ত ঝরে আর কত ক্রমাগত ধরে?

এই অসহায়ে কত আর এই [illegible]

যদি এ অমৃত [illegible] ফুল [illegible]

বোলো না প্রতিমা নয়, মৃত্তিকার [illegible] তুলনা

এবং যেটুকু প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে [illegible]

এ কারণ সত্য হয় [illegible] সে [illegible]

আজ আবিষ্কারের [illegible] কবিতা [illegible] তুলা কিন্তু [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] প্রতিষ্ঠান ভাঙা নারীর কথা বলেন [illegible] নারীকে তার মধ্যে বসে থাকতে হয়।

চক্ষু [illegible] অন্ধকার অন্ধকার

ভেসে যায় হৃদয় বাগেজ।

নাকি চক্ষু [illegible]

নাকি এই মৃত্যু সন্নিধান অন্ধতায়,

চক্ষু [illegible] প্রেম [illegible]

'কৃত্তিবাস' [illegible] কবিতা [illegible] দেখেছি 'ধ্রুপদী' [illegible] কিন্তু [illegible] কবিতা [illegible] কৃত্তিবাস [illegible] কবিতা দেখেছি [illegible] কাগজ [illegible] প্রকাশ [illegible] বই বার হয় নি। অথচ তাঁর [illegible] কবিতা [illegible] মনে পড়ে, কবিতার [illegible] তাঁর [illegible] প্রয়োজন কেবল নিঃশব্দে সেই কবিতা [illegible] যা [illegible] আস্বাদ নয় যা গোপন [illegible] কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গেই [illegible] কবিতার আন্দোলনের [illegible] কবিতা [illegible] তাই ধ্রুপদী' বা কবিতায় তাঁর [illegible] না [illegible] তিনি।

তিনিই তো সৃষ্টি করলেন [illegible] কবিতা আসলে যা প্রশ্নহীনতার কবিতা। 'আমি কাল রাত্রে কি যে [illegible] বিরহের [illegible] বৃথাই বৃথাই

[illegible] প্রত্যক্ষ করেছি [illegible] নিজের আমূল এই প্রেমহীনতায় (কালরাত্রে [illegible]) কিন্তু [illegible] প্রথমপ্রতিমা নারীকে আজ প্রেমহীন করে হয় [illegible] পুরুষতান্ত্রিক প্রেম তার যে অবস্থান [illegible] সে আজ আর নিছক বিষয় নয় [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] তাই তাকে আজ বলতে হয় 'আমার [illegible] তুমি [illegible] না কাটামুণ্ড [illegible] অসুখ [illegible] অন্ধকার আছে [illegible] চুম্বনের দুই [illegible] তুমি [illegible] তখনো [illegible] পুতুল [illegible] তাই [illegible] নারীর দুঃখ-কথাই থাকে

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

[illegible] নারী [illegible] হিসেবে [illegible] তাই পুরুষালি [illegible] প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যাখ্যান করে পুরুষতন্ত্র [illegible] সে সন্ধান করে [illegible] সে সন্ধান [illegible] নারী হিসেবে, [illegible] হিসেবে [illegible] হিসেবে [illegible] হিসেবে [illegible] কবিতায় [illegible] প্রথম [illegible] পুরুষতান্ত্রিক [illegible] ঐতিহ্য

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> সংসার সমাজ থাকে নিয়ে মাস জনমের ভাতারকে।

অকালে নিহত মাতৃত্বই 'জননীর বহ্নি কণ্ঠ' — সেই দুঃখ, সেই বোধ, সেই নীল অমাবস্যার বঞ্চনা' যে মেয়েকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে তো অন্য ঐতিহ্যের কথা ভাবতেই হয়, ভাবতেই হয় অন্যতার কথা। অন্যতার বোধ সেই অহংকার দেয় যার থেকে ঈশ্বরকে ইভ বলে 'আমিই প্রথম। [illegible] উত্থান যা [illegible] তারই [illegible], অধঃপতন।' অন্যতার বোধ থেকেই কালীর সঙ্গে ঐক্যবোধ হতে পারে [illegible] 'মন্দিরে যামিনী নারী দেখেনি সে অবিরল / তারই [illegible] মগ্ন কালো [illegible] প্রতিমার / অদ্ভুত বিশাল / এলো চুলে কাল স্তব+ খড়্গ জ্বলে লাল।' অন্যতার বোধ থেকেই 'ডাকিনী যামু'র গর্ব 'দুই বাহু

আন্দোলিত জানি হে সমুদ্র দুলে ওঠে [illegible] বাসনার কুটিলতে ভাঙিয়া দিও [illegible]

সেই অনাবৃত্তে মান নিয়েই নারীর নিজস্ব শরীর অভিজ্ঞতাগুলিকে এই কবি কবিতায় তুলে আনলেন। পুরুষদৃষ্টি যৌনতার নারী দেহ হবে নগ্নতা শুধু ভোগসামগ্রী মাত্র। সেই যৌনতা থেকেই তার শিল্প [illegible] কিন্তু নারীর যৌনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এমনকি তার নগ্নতাও তার নিজের অর্জন করা চাই। পুরুষের ভোগ থেকে যা পৃথক

> [illegible] বিলাস হয় [illegible] কি আমার সাধিকা
> [illegible] মন্দিরের [illegible] সর্পিত ভঙ্গিমা নয়
> বা [illegible]
> অভাবে মোহিনী সেই বাসনা [illegible]
> [illegible] কুটিলা নগ্নতা নয়
> নগ্নতার আচ্ছাদন নয়
> [illegible] [illegible] দুলার [illegible] [illegible]
> [illegible] নিজের নিকটে
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নারীর শরীর অভিজ্ঞতা পুরুষের [illegible] তার শ্রেষ্ঠত্বের [illegible] নারী কবি ব্যক্ত করলেন, সেই সঙ্গে [illegible] নারীকে [illegible] পুরুষদৃষ্টি ভাষায় :

> কিন্তু পুরুষ দেখ, 'অসতী' নামক শব্দ [illegible]
> এবং 'বেশ্যা' শব্দ, এবং 'ছিনাল!'
> এভাবে চামড়া রাখো, স্নেহের, চোখের।
>
> [illegible] [illegible] [illegible] শুক্রের গুচ্ছ
> অপ্রতিরোধ্য বেগ [illegible] বিন্দুর উকুত নষ্ট
> মধু ও কৈটভ।
> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
> পথপার্শ্বে ইউরিনালে [illegible] [illegible] এ
> তুমি কি জানবে নারী কি ভাবে শরীরে তার
> ঘোরায় সিন্দুর স্রোত, [illegible] [illegible] দিন?
> নির্মুত বানায়ে ভাণ্ড, নিজের সুস্থিত প্রাণ নিজ অভ্যন্তরে

এই আত্মসচেতন নারী যৌনতার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের নৈকট্য নয় সবকিছুই দেখে

> 'বীজাধানের লাগো [illegible] বলে যায় অন্ধপুরুষ
> অন্ধ প্রহর থেকে মুক্তিকা মোচন করে বীজের ভবন

শুধুই পুরুষ থেকে সম্মানে বরেছে রমনী
যেমন প্রেমের থেকে সম্মানে বরেছে পুরুষ

এই নারীকে কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সহ্য করে? তার গুণকে কি মান দেয়? কবিতা সিংহ কি কোনো উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন? ক্ষুদ্রাত্ত আন্দোলনের শক্তির কথা যাঁরা আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কি কবিতা সিংহ কবিতা নিয়ে কখনো আলোচনা করেছেন? অথচ কবিতা তা নিজেই ভুল বলেন যে সাধারণত আমার লেখার উৎস ক্রোধ প্রতিবাদ না সম্মানে নয় অপমানই বুঝি আমার প্রেরণা। অপমানের জন্য বাসনার ভাবনা যিনি আসি পাপ বুঝে কবিতায় দিন কলঙ্কের অন্যায় বুকের আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে। যদি কলঙ্কিত হতেই হয় অপমানই ঈশ্বর হাত উঠুক— অভিশাপ নিয়েও হাত তুলুক। নারী কবির কাছে ঈশ্বর সেই ঈশ্বর আগুন তিনি তো ভূমণ্ডল শ্রেষ্ঠ শিল্পী তিনি। তাঁর অপমান মুক্তা নির্মাণ করতে পারেন মানুষ / দুহাতে নিলাম চিরনির্বাসন।

অপমানিত হয়ে নারীর সঙ্গে সমাজ নির্যাতিত হয়ে নারীর সঙ্গেই তাই এই কবি ঐকান্তিক অনুভব করেন। সেইজন্যই তিনি কখনো আবার স্বরূপটি তুলে এনে নিজেদের সঙ্গে জুড়ে দেন পুরুষের দিকে :

উড়োনো চুমু ছুঁড়ে দে
শুধু তুই চুমু ছুঁড়ে দে
জ্বলছে হৃদয় দু হাজার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার

এই যদি তোর মনে ছিল
কেন মাইরি রং ঢ্যাঙালি
বেবিলির ওই ভারি বাজারে
ঝুমকো জোড়া হারিয়ে এলি।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালো মুখ ঢেকে দিলে না
বদলে তার বদলে / বক্তে প্রেমের দিব মিশালে?

তোমারি দিনই সারা প্রাণ
প্রাণ হে? কাঁচ পোকার তিলক
চলতে ফিরতে দিপের ঝিলিক
কামনে কাঁপে কার জনতুম?

সমাজ জীবনে, নারী পুরুষ সম্পর্কে মেয়েদের অবস্থান বিষয়ে কবিতা সিংহ তাঁর

ক্রোধ উপহার দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু শুধু তাঁকেই না, তিনি নতুন নারীকে আহ্বান করেছেন। অতীত কিংবা নতুনের সাক্ষ্য না থাকে তিনি ভবিষ্যৎ নারীর কল্পনা করে নিয়েছেন। সেই নারী যার জন্য কবির প্রার্থনা

অদ্ভুত একজন যার উন্মুক্ত মসৃণ চুলে টেউ খেলে
অদ্ভুত একজন যার বেণী খুলে ফেলে না পাকাটির
অদ্ভুত একজন যার বক্ষবিন্যাস খুলে দেয় [illegible]
অদ্ভুত একজন যার [illegible] টান করে [illegible] ঘাড় [illegible]
বিশ্বচক্র দলিতা ফণিনী।'

এ নারীর দুই চোখ [illegible] এর দুয়ারে [illegible] এ নারী [illegible] এই নারীই [illegible] নতুন যুগের নারী কবিতা [illegible]

সে যুগে খুব সহজ কথা নয়। সমাজের দিক থেকে [illegible] দিক থেকে [illegible] নারী হিসেবে সাফল্যের [illegible] স্বাভাবিক। [illegible] প্রতিপক্ষ। [illegible] বজায় রাখাই সাধারণভাবে কঠিন ছিল। [illegible] তাদের সহ্য করতে [illegible] নারী কবি হিসেবে [illegible] কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতেই চাইলেন। [illegible] বেড়ে চলেছে। কিন্তু নারীবাদের নারীত্বকে [illegible] কোনো ত্রুটি রাখেনি। [illegible]

প্রসঙ্গ ও প্রকরণ : বাংলা কবিতা : উনিশ ও বিশ শতক

সুমিতা চক্রবর্তী

প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — এই দুটি শব্দ কী বোঝাতে চাই তা স্পষ্ট করে নিতে হবে প্রথমেই। এক, যদিও আপাতদৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে, তবুও একবার বলে নিতে হবে কবিতা বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই অন্যথা যার সম্পর্ক সূত্র নির্ধারিত হবে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — এই দ্বিবিধ ধারণা।

কারণ, কী — এর উত্তর খুব সহজ বলে মনে হলেও আমরা অন্তত তিনটি উত্তরে পৌঁছতে পারি এবং একটি অপরটির সঙ্গে অস্বীকার না করলেও তাদের মধ্যে একটি নয়।

১ পাশ্চাত্য শিল্প ধারণার প্রথম পর্বে অ্যারিস্টটলের এই অনুসরণ করা যেতে পারে ভাষার সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির অনুকরণই কাব্য রূপে নির্দিষ্ট করা হয়। এই সংজ্ঞা মোটামুটি উপর একেবারে দ্বিধা অস্বীকার করতে পারে।

২ প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে সংজ্ঞা বলা হয়েছে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস হল উপলব্ধির চিত্তের অনুভব। আমার বিশ্বাস এমন কিছু থাকে যেটা যা বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত বস্তুতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের ব্যঞ্জনা উপলব্ধিকে আমাদের মধ্যেই কাব্য হয়। এই সংজ্ঞাটির অনুকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা নেই। আমার অ্যারিস্টটলের প্রদত্ত সংজ্ঞায় বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবু কবিতা সম্পর্কে এই দুটি ধারণাই সমাজতন্ত্রের অবস্থান করতে পারে। এরা একে অপরকে অস্বীকার না করেই।

৩ কবিতা কী — এর উত্তরে তৃতীয় সংজ্ঞাটির প্রবক্তা ওয়ার্ডস ওয়ার্থ। সম্ভবত এই সংজ্ঞাটি তিনি দিয়েছিলেন ১৮০০ সালে লিরিকাল ব্যালাডস নামক কবিতা সংকলনটির ভূমিকায় (সংকলনটি কোলরিজ ও ওয়ার্ডস ওয়ার্থ এর কবিতা নিয়ে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হলেও ভূমিকাটি সংযুক্ত হয় দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮০০ সালে)। তাঁর কথায় প্রবল আবেগের (পাওয়ারফুল ফীলিংস) স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারণই (স্পান্টেনিয়াস ওভার ফ্লো) হল কবিতা। সেই সঙ্গে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই আবেগ ঠিক তাৎক্ষণিক হলে চলবে না। মনের পাত্র পূর্ণ হবে আবেগের সঞ্চারে, সুস্থিত হবার অবকাশ দিতে হবে সেই আবেগকে তবেই তা কবিতার উৎস রূপে যথার্থ উপলব্ধি হয়ে উঠবে (ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি)।

এই তিনটি সংজ্ঞা থেকে 'কবিতা কাকে বলে' তার সবগুলি উত্তর যদি আমাদের মেনে হলে তাহলে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে কবিতা হল ভাষা দ্বারা নির্মিত এক শিল্পরূপ। দ্বিতীয়ত সেই শিল্পরূপ এমনভাবে কবি চিত্তের উপলব্ধি-নির্ভর যে তা পাঠক ও শ্রোতার চিত্তেও এমন অনুভূতির সঞ্চারে সক্ষম যা বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত।

এইখানে থেকে সহজেই আমরা চলে যাব কবিতার প্রকরণ ও প্রসঙ্গের ভাবনায়। 'প্রকরণ' হল কবিতার ঐ ভাগ নির্দিষ্ট শাব্দিক অন্বয়ের যাবতীয় কলা কৌশল। প্রসঙ্গ কী? 'প্রসঙ্গ' হল কবিতার বিষয়বস্তু ও কবি মানসের উপলব্ধির সমন্বয়। আরও একটি শব্দ আমরা পাব, সেটা হল 'বিষয়বস্তু'। এটা কি বিষয়বস্তু আর 'প্রসঙ্গ' একই কথা? না, তাও নয়। কবিতার বিষয়বস্তু আর প্রসঙ্গ সম্পর্কযুক্ত আর একটিও। কিন্তু আলাদা। বিষয়বস্তু হল বিশ্ব প্রকৃতির সেই সমস্ত উপাদান যুক্ত সংবেদনীকৃত ধারণা। অর্থাৎ, যা ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে রয়েছে। প্রসঙ্গ হল সেই উপাদান ও ধারণার সঙ্গে শিল্পী চিত্তের বিশেষ দৃষ্টিকোণের সংযোগের ফল। আর তার এক অনুভূতি ধারণা। উভয় মিলেই স্পষ্ট হবে ধরা যাক ফুল একটি বিষয়, এবং ফুলের সৌন্দর্য একটি ধারণা। একটি ধারণা সকল সমস্ত মানুষের মনেই এই বিষয়বোধ ও ধারণা সৃষ্টি হয়। ফুল নিয়ে লেখা তিনটি কবিতা নিয়ে তিনটি কবি—

রবীন্দ্রনাথ — ফুলের বাস মনে আসে যেই ভোরেই
লাগে ভালো

সুকান্ত চক্রবর্তী — [illegible]
মোতালে গন্ধ-বোঁটায়
ফুলকে লাব বোঁটায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় — ফুলকে [illegible]
মিথ্যে কথা বলার বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই
আমার টান নেই

এই তিনটি কবিতাংশেরই বিষয়বস্তু হল ফুল। বিশ্বের সেই প্রাণ্ডক্ত উপাদান যার অনুকরণকে শিল্প বলে নির্দেশ করেছিলেন অরিস্টটল। কিন্তু তিনটি কবিতার উপলব্ধি তিন রকম। প্রথমটিতে কবি হৃদয়ের আনন্দ মোহিত হয়েছে ফুলকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয়টিতে বিশেষভাবে ফুলের সংবেদনের বিষয়েই কবির উপলব্ধি। তৃতীয়টিতে, মানুষ-সমাজ সম্পর্কে কবির কিছু বিরূপ ও আহত সংবেদনের বোধকে ধারণ করেছে ফুলের চিত্রকল্প। এখানে বলব তিনটি কবিতাংশেরই 'বিষয়' এক কিন্তু প্রসঙ্গ আলাদা। প্রসঙ্গটি হল বিষয়ের সঙ্গে কবিমানসের সমন্বয়। বিষয় নৈর্ব্যক্তিক। প্রসঙ্গ কবির মনের উপলব্ধি নিহিত জীবনবোধ। ব্যক্তি-অনুভব সাপেক্ষ। এই অনুভবই বাচ্য অর্থকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জিত হয়। ছড়িয়ে যায় শ্রোতা ও পাঠকের মনে।

'স্বাধীনতা' সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে রচিত দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।

[illegible] — [illegible]

সোনার পাথরবাটি

[illegible] অনুভব [illegible] স্পর্শ

[illegible] দেশের [illegible] হয়েছিল।

[illegible] বেশি [illegible] সাধারণ মানুষ কোথাও কোথাও [illegible] রোমান্টিক যুগের (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ) [illegible] প্রসঙ্গ ও কাব্য প্রকরণ নিয়ে [illegible] প্রভাবেই [illegible] কিছুটা স্বীকার করা, কিছুটা অস্বীকার করা।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা

তাঁর মানব নিবিড় রোমান্টিকতার রোদের সঙ্গে গভীরভাবে নয়। [illegible] প্রয়োগে তাঁর যে দ্বিধা ছিল [illegible] শব্দ কবিতায় ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেন। [illegible] বিপন্নতা বৈজ্ঞানিকতার উপলব্ধি তাঁর [illegible] অভিজ্ঞতাতেই ছিল ভিন্ন। [illegible] লেখায় নয়।

রবীন্দ্র উত্তর আধুনিক কবিতা [illegible] সবগ্রাহিতা আধুনিক [illegible] থেকেই কিছুটা প্রতিষ্ঠিত [illegible] ইস্তাহারে (১৯১৫) [illegible] প্রসারের বাহন। [illegible] লিখিয়ানের উপলব্ধির [illegible] পরিচয়।

কবিতার ভাষা, বাংলা কবিতা

পবিত্র সরকার

[illegible]

[illegible] দেবার চেষ্টা করব।

[illegible] (*Roman Jakobson*) [illegible] ভাষাবিজ্ঞানী [illegible] ভাষাতত্ত্ব থেকে সূত্র গ্রহণ করে [illegible] কবিতার ভাষা [illegible] ভাবে প্রাসঙ্গিক [illegible] (ইত্যাদি [illegible]) ইত্যাদি [illegible] উপমা ইত্যাদি [illegible] যা সাধারণত [illegible] কথা ও লিখিত ভাষা [illegible] এটা হল ভাষার [illegible] বা *paradigmatic* [illegible] একদিকে [illegible] শব্দ, উপমা চিত্রকল্প ইত্যাদির [illegible] কবিতার জন্য বিশেষ [illegible] (ছন্দ ও স্তবকবন্ধও এর মধ্যে পড়ে [illegible] অনুপ্রাস ও অন্যান্য ধ্বনিসজ্জা), [illegible] শব্দ শব্দগুচ্ছ উপমা ইত্যাদি দ্বিতীয়ত কবির কবিতায় শব্দসজ্জা –চিত্র, পঙ্‌ক্তিগত, স্তবক শব্দগুলির পাশাপাশি সাজানোর ব্যাপারেও তাঁকে ভিন্নতা সন্ধান করতে হয় মুখের কথা বা লেখার গদ্য থেকে এটা ভাষার *syntagmatic* বা আন্বয়িক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

বলা বাহুল্য এ দুটো পর্যায়ভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল আমি অভিধান থেকে 'উজ্জ্বল' কথাটা নিলাম অনেক অন্য কথাকে বাদ দিয়ে কিন্তু 'উজ্জ্বল' এর পাশে 'গোধূলি' কথাটা খানিকটা কবিতার আভাস নিয়ে এল কিন্তু 'উজ্জ্বল উল্কার' আর একটু

যেন কবিতার [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible]

এই প্রসঙ্গে এমন কথা উঠতেই পারে যে [illegible] রবীন্দ্রনাথ ভাষা [illegible] না লিখিত [illegible] [illegible] কিন্তু এখন কি তা খুব বেশি আলাদা [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৩ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] তিনি [illegible] [illegible]

বলা বাহুল্য [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] কথাও এখানে স্মরণ করতে হবে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) রচনার [illegible] আগে ও পরে তিনি [illegible] [illegible] এবং [illegible] বিভিন্ন [illegible] ইত্যাদি নিয়ে চিঠিতে বক্তৃতায় রচনায় যে বিপুল [illegible] তুলেছিলেন তা আমাদের [illegible] জন্য। প্রবোধচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য অনুসারে ১৯৩২ এর জুলাই থেকে ১৯৩৩ এর ডিসেম্বর

[illegible]

[illegible] প্রকাশিত হয়।

[illegible]

পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

[illegible]

[illegible]

কোথায় আছি?"

(ঈশ্বর সকাশে)[১১]

[illegible]

২

[illegible]

মূলত দু ধরনের [illegible] স্পষ্ট [illegible] একই ধ্বনি বা স্বরের বা তার চেয়ে বড়ো ধ্বনি ইত্যাদির পুনরাবৃত্তির ফলে শ্রুতি সুখকরতার সৃষ্টি হয়। এ হল ধ্বনির সংগতিময় বিন্যাস যার পরিচিত উদাহরণ [illegible] চলচ্চলার চকিত চমকে কবিতা চরণ বিচরণ। কিংবা একাধিক ধ্বনির পুনরাবর্তন যেমনটি ঘটেছে উদাহরণ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেকার *melodious birds sing madrigals*। ধ্বনির সংগতিময় বিন্যাসও আছে। যেখানে পাশাপাশি নানা বিরামচিহ্নের ধ্বনিরূপ সংগতি ভাঙার সচেতন চেষ্টা থাকে [illegible] অনাবশ্যক [illegible] ও [illegible] শ্রুতিসমস্যার সৃষ্টি হয়। [illegible] (বিচিত্র প্রবন্ধ) [illegible] নিজেরাই [illegible] যে [illegible] ধ্বনি সংগতির [illegible] অনুপ্রাসের [illegible] ধ্বনি বিন্যাস [illegible] অনেক বেশি সম্ভ্রম দেয়।

[illegible] ভাষা নৈঃশব্দ্যকে [illegible] যে [illegible] সবচেয়ে [illegible] করে তার নাম [illegible] ধ্বনি বা উচ্চারণ পরিহার করে নৈঃশব্দ্যের একটা অস্তিত্বের [illegible] নৈঃশব্দ্যের দ্বারা [illegible] নিশ্চিত করে [illegible] তা এতই স্পষ্ট যে এ নিয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু ধ্বনির [illegible] ভাষা অনেক ভাবে মূলের ভাষার ধ্বনিকে [illegible] করে। এর একটা উপায় হল লোপ (*deletion*)। কবিতায় ব্যবহৃত হয় অনেক [illegible] (এর) কবিতায় [illegible] একটি বা দুটি ধ্বনি [illegible] যেমন ই [illegible] কবিতার [illegible] *over* হয় [illegible] *over* হয়ে যায় *ov'er*। *it is* হয় [illegible] *it's*। *there is* হয় *there's*। *lord* হয় *l'rd*। *return* হয় *rtn*। [illegible] 'আর' [illegible] 'আমি' দেখিয়া [illegible] 'দেখি' 'পড়িলি' [illegible] 'পড়লি', 'চিত্র' [illegible] 'চিন', 'মুখখানি' [illegible] 'মুখানি', 'বাদুর' [illegible] 'বাদুর' ইত্যাদি। অপরটি উপায় হল সংযোগ (*addition*)। যেমন ছন্দের প্রয়োজনে একটি শব্দের সঙ্গে কিছু ধ্বনি বা সিলেবল যোগ করে তাকে একটু টেনে লম্বা করা হয়। পুরোনো ধরনের বাংলা কবিতায় 'ছিল নাক' 'হল নাক' ইত্যাদি পুরোনো ইংরেজি কবিতার *stress* বা শ্বাসাঘাতের চিহ্ন দিয়ে অধুনা-বর্জিত উচ্চারণ পুনরুদ্ধার যেমন *hell-winnowed* (উচ্চারণ *winnow'd*) *wisped lark-charmed* ইত্যাদি। লম্বা কবিতায় যেমন 'গো' ইত্যাদি অতিরিক্ত শব্দ ভঙ্গ ব্যবহার নজরুল 'পৌর' কে ভেঙে পড়ে ও উম্ম করেছেন ছন্দের কারণে। আর তৃতীয় একটি প্রক্রিয়া হল রূপান্তরণ (*alternation*)। এতে ছন্দ বা মিলের বিশেষত মিলের অনুরোধে প্রচলিত উচ্চারণের হেরফের করা হয়। চলু ধ্বনিকে বদলে অন্য একটি ধ্বনির অবতারণা

[illegible]

৩

[illegible] শব্দের সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয় উপসর্গ [illegible] নাম পদ – [illegible] কবি তার [illegible] প্রয়োগগুলি লক্ষ করি—

সাকরণ গঠন	কারিক গঠন
গাহিতে [-ইতে]	গাহিবারে [ইবারে]
থামাইয়া [-ইয়া]	থামায়ে [-এ]
আসিলাম [-ইলাম]	আসিনু [-ইনু]
তলায় [-ইতে]	তলে [-এ]
তাকে [-কে]	তারে [-রে]
মুচকে [-এ]	মুচকিয়ে [-ইয়ে]

[illegible]

শুধু [illegible] কর্মণিতে [illegible] না বলে [illegible] [illegible] নিজ [illegible] [illegible] দিবাকরের [illegible] উপমা [illegible] নাম [illegible]

৪

[illegible] শব্দকে [illegible] (circuit) শব্দই [illegible] বা স্ট্যাণ্ডার্ড [illegible]

উদাহরণ।

[illegible] জোছনা [illegible] পূরব [illegible]

বিশেষণ [illegible] স্তব্ধ, মগন [illegible]

সর্বনাম আপনা [illegible]

[illegible] উত্তর জিজ্ঞাসা [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] মুদ্রা (= বোতাম) [illegible] (= [illegible] রূপ) উদ্দেশ্য, শিহরা, উচ্ছ্বসা

[illegible] = [illegible] = [illegible] = [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৭

[illegible]

	সাধারণ ক্রম	বিপর্যস্ত ক্রম
১	বিদ্যুৎলতা ; বিদ্যুৎলতা	বিদ্যুৎ বিদ্যুৎলতা
	তরুণী উষা	উষা তরুণী
	প্রচ্ছন্ন সুন্দর গ্রেমিক	পূর্ণিত প্রাচ্ছন্ন সুন্দর
	সেই ভালো কথা	সেই কথা ভালো
	কি-কিলকিলিকা বধূ	বধূ কিলকিলিকা
	মায়াবিনী আশা	আশা মায়াবিনী
২	কর্ম + ক্রিয়া	ক্রিয়া + কর্ম

	[illegible]	[illegible]
	উদ্ধার করি যে বাণী	যে-বাণী উদ্ধার করি
	[illegible]	[illegible]
	প্রাণনাথে পাব	পাব প্রাণনাথে
৩	কর্তা + ক্রিয়া	ক্রিয়া + কর্তা
	রঙপুর দেখা দিল	দেখা দিল রঙপুর
	[illegible]	[illegible]
	আমি নামে	নামি আমি
	এ চোর রামে ছলিল	ছলিল রামে এ চোর
৪	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
৫	[illegible]	
	[illegible]	
	নাহি জানি।	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শব্দ	অক্ষর সংখ্যা Syllable	১	২	৩	৪	৫
[illegible]			[illegible]			
			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			[illegible]			
	চাঁই		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] বলে [illegible] নেমে আসে না।

এই ২ সমান [illegible] মুখোমুখি *I am Mac* [illegible] [illegible] *norm* থেকে সরে যায় [illegible] স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই সেই *norm* [illegible] *the standard language is the horizontal axis* [illegible] *aesthetically unintentional distortion of the language components* [illegible] *of the standard* [illegible] *distortion* এর একটা মানচিত্রও মেটামুটি [illegible] কবিতার ভাষার স্বরূপ কী দাঁড়ায়? মুকারোভস্কি বলেন, কবিতার ভাষার কাজই হলো [illegible] কবিতার ভাষার কাজ হল

[illegible] মানোহাবিত্বে প্রথম ব্যাহত হয়।

[illegible] *Elias Schwartz* [illegible] *Sapphic in the Hearth* [illegible] *Whose words are these I think I know* [illegible]

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১ কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত

২ তাদের ৭০ পৃ

৩ তাদের ৭২ পৃ

৪ তাদের ৭৮ ৮১ পৃ

৫ তাদের ৭১ পৃ

৬ দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত), ১৯৭৬ কলকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ২৬২ ২৬৪ পৃষ্ঠার তালিকা।

৭ তাদের ২০২ ২০৩ পৃ

৮. তদেব ২২১ পৃ

৯. তদেব ১৭৭ পৃ

১০. তদেব ২২১-২২২ পৃ

১১. [illegible]

১২. [illegible]

১৩. [illegible] অবশাশাস্ত্র।

১৪. [illegible]

১৫. [illegible] *Rinehart and Winston Ltd.), pp. 40-56*

১৬. তদেব ৪২ পৃ

১৭. তদেব ৪৩ পৃ

১৮. *[illegible] sity Publications), pp. 20-28*

কবিতার ভাষাবিশ্ব ঃ নৈঃশব্দের গ্রন্থনা

তপোধীর ভট্টাচার্য

'আমরা এ পৃথিবীর কতদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
[illegible] অনাপন্ন বাচনের রীতি।
মানুষের সত্তা তবু অনুভূত হয় দেশ থেকে আরো
[illegible]
কালের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।'

[illegible]

[illegible]

হয়।

[illegible]

পুরনো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,

[illegible]

[illegible] লিখেছেন :

'[illegible] সক্রিয় কবিমন—কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে।'

(২)

[illegible] 'বাবরের প্রার্থনা' বা 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়' এবং বেশ কিছু কবিতায়, কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার মাছি খুন করেছি' বা 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' উৎপল কুমার বসুর 'আবার পুরী নির্বিত্ত' [illegible] 'উদ্ভিদের পরিক্রমা' এবং অন্যত্র পাঠকৃতিতে। সমাজ ও বস্তুবিশ্বের কিছু কিছু নতুন সত্য এই কবিরা উচ্চারণ করেছেন

[illegible]

[illegible] Variations have been found not only in register and shifts of narrative perspective but also shifts of experiential perspection [illegible]

এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝে নিতে পারি :

> 'বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল,
>
> [illegible]
>
> কোন্ ভূতে ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
>
> [illegible]
>
> এবং
>
> [illegible]
>
> কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
>
> [illegible]

এই দুটি [illegible] প্রকাশ করা সম্ভব [illegible] ব্যবধানবিধি বদলে যায় [illegible] বস্তু সম্বন্ধ অবিকৃত হয়ে [illegible]

[illegible] পরিসর [illegible] প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক

[illegible]

মায়া

[illegible]

মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু।

[illegible]

সময় নয়)

খ 'ঘর, বাড়ি, আঙিনা

সমস্ত সন্তর্পণে ছেড়ে দিয়ে মামিমা

[illegible]

গ [illegible] এবং

[illegible]

ঘ [illegible] পরিণত সমুদ্র একাকীত্বের কথা কিছু মনে করতে পারছি না [illegible] তুমি শ্মশানে আমার বন্ধু ছিলে একদিন তুমি [illegible] আমার দেহ [illegible] পরে [illegible] সন্ধানে তুমি [illegible] আমার [illegible] উর্ধ্বাকাশে আমার [illegible] থাকে চিরকাল প্রাণ্তরের শেষে শুধু বিস্ফারিত চোখ [illegible] বাব [illegible] অন্ধ ভালবাসা

[illegible]

[illegible]

[illegible] কবির ইঙ্গিত হতে পারে না।

(৩)

[illegible]

[illegible] এব্যাপারে প্রত্যেক সার্থক কবির পদ্ধতি যে আলাদা এবং অনন্য হওয়ার [illegible] সম্ভাবনার অনন্ত পরিসর তা প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তগুলির নিবিড় পাঠ থেকে বুঝে নিতে পারি অর্থাৎ 'কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার মধ্যদিয়ে গড়া কাঠিন্যের মূল্য নিশ্চিত

[illegible] বিধি জানতে হয়।

[illegible]

(রণজিৎ দাশ - আগুন ও ফলের কবিতা)

[illegible]

ছড়িয়ে থাকে সারা বিস্ময়

[illegible]

(রণজিৎ দাশ : অশ্রুহীন একুশদিন)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Pragmatic data [illegible] macro-micro textual connection (Dips [illegible]) [illegible] For the modern artistic consciousness the anxiety of artistic merit is established by the degree of each text's exclusion, preferably in terms of its macrotext with respect to the space conventionalized by typologies of preceding macro textual solutions ([illegible] ৮৪

(৪)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Privileged verbal structure [illegible] the inherent effect of poetic [illegible] takes shape through a privileged verbal structure which [illegible] cannot be reduced to any prior conventional one [illegible]

পাচ্ছি এভাবে :

[illegible]

[illegible]

তুর্কিরা বলে Poetica narative fictionality বলেন এখানে তার

[illegible] মহান তাঁর পরে আর সম্ভব হচ্ছে না।

[illegible] Poetically it suggests a cosmovision in the textual discourse [illegible] প্রিয় কবিদের রচনা পড়ি। নিজেদেরই বলি :

[illegible]

(জয় গোস্বামী : প্রসঙ্গকথন)

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ ভারতীয় প্রেক্ষিতে

বিপ্লব চক্রবর্তী

'বাঙালি ভোলে না' কভু কভু তার জন্মভূমির প্রতি — এ উক্তি বিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মনিয়া ভারতীর 'ভারতমাতার অমূল্য পতাকা' কবিতায় কবির এই উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতী নিজে ছিলেন জাতীয়তাবাদী কবি। উনিশ শতকের বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর ওপর পড়েছিল। শুধু ভারতী নন, উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিক বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, অনুপ্রাণিত বা আলোড়িত হয়েছেন বলা যায়।

আধুনিক ভারতীয় কবিতার উন্মেষ ঘটেছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। সে সময়ে বাঙালি কবিদের রচনা অন্যান্য প্রদেশের কবিদের প্রেরণা দান করেছিল। আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রেরণা ও অবদান অনস্বীকার্য। তথাপি ভারতীয় সাহিত্য তথা ভারতীয় কাব্যধারার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাষার কবি সাহিত্যিকদের সামগ্রিক সৃষ্টি প্রবাহে। তাই আধুনিক ভারতীয় কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতার যোগাযোগের স্বরূপ বোঝা প্রয়োজন।

উনিশ শতকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশে বাংলা, মারাঠি, গুজরাতি, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, কন্নড়, মালয়ালম প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার লেখকেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সে সময়ে ভারতীয় কবিতায় যেসব প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তা হল এইরকম ঃ

১. দেশের অতীত ইতিহাসের গৌরবগাথা রচনা।
২. বিদেশী শাসকের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ।
৩. পরাধীন জাতির দুঃখ দৈন্যের বর্ণনা।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনামূলক আখ্যান রচনা।
৫. জাতীয় মূল্য বোধের প্রতিফলন।
৬. জাতীয় বীর নায়ক চরিত্রের বর্ণনা।
৭. ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে আশাবাদী মনোভাব।

এই সব লক্ষণ সবভাষাতেই সমানভাবে প্রকাশ পায়নি। অনেকক্ষেত্রে বাঙালি কবিদের রচনা অন্যদের প্রেরণা দিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চেতনা উনিশশতকের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান স্বরূপলক্ষণ হয়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে অবশ্য তা ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা মাত্র। মূলত সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রেই এই ধরনের চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল। কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য সমাজ সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষ প্রেরণা হয়ে ওঠেনি। উদাহরণ

স্বকাল বলা যায় বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে যত উপন্যাস বা নাটক রচিত হয়েছিল কাব্যকবিতা তত নয়। কারণটাও খুব স্পষ্ট। প্রচার মূলক কাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহ ছিল না নিশ্চয়ই। তবে গুজরাতি কবি নর্মদের মত কোনো কোনো সংস্কারবাদী কবি অবশ্যই এ বিষয়ে সৃষ্টিশীল ছিলেন। এই বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, দয়ানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকদের প্রভাব সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত আধুনিক কবিতাতেও ছিল।

আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে। শুধু জাতীয়তাবাদ বা সমাজ সংস্কার নয়। কাব্যের প্রকাশ ও প্রকরণ নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্য অনেক ভারতীয় লেখককে অনুপ্রেরণা দান করেছিল। তার ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার মিশ্রণ ঘটেছিল স্বাভাবিক কারণে। কালক্রমে নীতিকবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতায় আধুনিক ভারতীয় কবিতার পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৮৮৭ সালে গুজরাতি কবি নরসিংহরাও ভোলানাথ দিবেদি 'কুসুমমালা' গীতিকাব্য সংকলনটি প্রকাশ করেন। আর কিছু দিনান্তরে পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তথাপি মহাকাব্য লেখার প্রবণতা কমে যায়নি। ভাইবীর সিংহ (পাঞ্জাবী), অঙ্গনলাল সিং (মৈথিলী), সুরেন্দ্র মোহন ঝা সুমন (মৈথিলী), বাঙ্গী প্রসাদ দেবকোটা (নেপালী), যদুনন্দন (ওড়িয়া) প্রমুখ কবিরা মহাকাব্য রচনায় আধুনিক ভারতীয় কবিতায় মর্যাদা দান।

দুই

অস্বীকার করা উপায় নেই যে মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্য রচনা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনেক কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নিচের তালিকার দিকে তাকালে তা বোঝা যাবে :

	কবি ও কাব্য	ভাষা ও প্রকাশকাল	মূল বাংলা রচনা	রচনার ধরণ
১	ভারতেন্দু 'ভারত ভিক্ষা'	হিন্দি (১৮৭২)	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভিক্ষা'	অনুপ্রাণিত রচনা
২	মাধবানুজ-এর মেঘনাদ বধ	মরাঠি (১৮৯৮)	মধুসূদনের মেঘনাদ বধকাব্য	অনুবাদ
৩	মাধবানুজ-এর সোম আমি তারা	মরাঠি (১৯০০)	মধুসূদনের সোমের প্রতি তারা	অনুবাদ
৪	মৌলহসাম খাঁ-র 'ইন্দ্রজিৎবধ'	গুজরাতি (১৮৮৫)	মধুসূদনের মেঘনাদবধ	অনুপ্রাণিত
৫	রমাকান্ত চৌধুরীর 'অভিমন্যু বধ'	অসমীয়া (১৮৮৮)	ঐ	অনুপ্রাণিত
৬.	ভোলানাথ দাসের 'রাবণবধ'	ঐ	ঐ	ঐ
৭.	রাধানাথ রায়-এর মহাযাত্রা	ওড়িয়া (১৮৯৯)	ঐ	ঐ
৮	উল্লুর-এর গুরুনাথন	মালয়ালম	রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'	অনুপ্রাণিত

প্রধানত দু ধরনের রচনা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত — অনুবাদ ও অনুপ্রাণিত রচনা দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিলেন মধুসূদনের মহাকাব্যিক শৈলী অনুসরণে অনুবাদ ও অনুপ্রাণিত দু ধরনের রচনা কম রচিত হয়নি তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও অনুসরণ আধুনিক ভারতীয় গীতি কবিতার পথ উন্মুক্ত করেছিল

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরবর্তীকালের ভারতীয় কবিদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল মালয়ালম কবি শঙ্কর কুরুপ ১৯৫৯ সালে 'গীতাঞ্জলি' র অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজমের গভীর প্রভাব পড়েছিল কুরুপের রচনায় মালয়ালম ভাষার আর একজন কবি উল্লুর পরমেশ্বরম অয়ারের নামও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তার 'গুরুনাথম কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার প্রভাব অনুভব করা যায়

প্রায় প্রতিটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই রবীন্দ্র প্রভাবিত কবির সন্ধান পাওয়া যায় নিচের ছকের দিকে তাকালে তা বোঝা যাবে:

	কবির নাম	ভাষা	মূল বাংলা রচনা
১	শঙ্কর কুরুপ	মালয়ালম	রবীন্দ্রনাথের মিস্টিসিজমের দ্বারা প্রভাবিত
২	উল্লুর পরমেশ্বরম	ঐ	জীবনদেবতার প্রভাব
৩.	বি. বি. ঠোকরকর	মরাঠি	গীতাঞ্জলি
৪.	বি. আর তম্বে	মরাঠি	ঐ
৫.	বি আরারাও	তেলুগু	গল্পকবিতা
৬	নিয়াজ হায়দেরী	উর্দু	গীতাঞ্জলি র অনুবাদ
৭.	ফারুক গোরখপুরী	ঐ	ঐ
৮	পান্ডি তেঙ্কটেশ জাইয়েঙ্গার	কন্নড	রবীন্দ্র শৈলী প্রভাব
৯	মধুসূদন রাও	ওড়িয়া	ঈশ্বরের প্রতি কবিতা

এই তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা সম্ভব। তবে তার পরিবর্তে এটুকু বললে আপাতত যথেষ্ট হবে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব ভারতীয় কবিতার বিচিত্র ও বহুমুখী হয়েছে

৩

শুধুমাত্র প্রভাবের পরিমাপ করলে বাংলা কবিতার ভারতীয় প্রেক্ষিত বিচার সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বাংলা কবিতার প্রভাব একটা সময় অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিদের ওপর পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আধুনিক কাব্য কবিতার ধারা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়েছে সব ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ও রূপ একরকম হয়নি। তবে বিশ শতকের কাব্য ধারার বিচারে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কাব্য কবিতায় কতকগুলো সাধারণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন ভাষার কাব্যধারার প্রধান প্রধান যুগগত বৈশিষ্ট্যগুলোর

তুলনামূলক আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে

উদাহরণ স্বরূপ হিন্দী কবিতার কথা বলা যায়। আধুনিক হিন্দী কবিতার ইতিহাসে ছায়াবাদ, প্রগতিবাদ, নই কবিতা ইত্যাদি নানা ভাগ দেখা যায়। ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে জয়শঙ্কর প্রসাদ, সুমিত্রানন্দন পন্থ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', মহাদেবী ভর্মা প্রমুখ কবিদের রচনা সর্বত্র এক ধরনের ছিল না। তবুও এঁদের রচনার কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ ছিল, যেমন -

১. নিয়ন্ত্রিত ছন্দ ও তালের ব্যবহার

২. একধরনের অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ

৩. খড়িবলি ভাষায় রচনা ও উৎকর্ষ

৪. বৃজভাষার সঙ্গীতময়তা ও সুরের ব্যবহার

৫. একাধিক অর্থগত স্তরের বিন্যাস

উল্লেখ করা চলে যে, ছায়াবাদী কবিরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও বোধের কবিতাকে প্রকাশ প্রবণতা সকল ক্ষেত্রে সমান ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর্যন্ত লক্ষ্যকেন্দ্রিক সমাজ হিন্দী এবং কোনো কোনো ভারতীয় ভাষার কবিগণ, প্রগতিবাদের ছোঁয়া লাগে। কন্নড় কবিতাকে যদি পূর্ব স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর দুটি যুগে ভাগ করা যায় তবে প্রগতিশীল কবিতার স্থান হল এ দুয়ের মাঝখানে। প্রাক্তন সীমান্তা যুগের কবিদাকে বলা নবোদয় কবিতার যুগ। এযুগের কবিতা রোমান্টিক কবিতার প্রধান। ঠিক যেমন হিন্দীতে ভারতেন্দু যুগ ঘটেছিল। প্রগতিশীল কবিরা তাতে নতুন সুর যোজনা করেন।

শুধু হিন্দী বা কন্নড় নয়, ভারতের অধিকাংশ ভাষার কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তিরিশ এবং পরবর্তীকালের কবিতায় প্রগতিবাদের প্রকাশ ঘটেছিল। অধিকাংশ কবিরাই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা, আশা ও সংগ্রামকে ব্যক্ত করেছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রগতিবাদী কবিদের কাব্যরচনায় প্রবুদ্ধ করেছিল।

প্রগতিবাদী কবিদের মধ্যে হিন্দীতে নাগার্জুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে প্রগতিবাদের প্রকাশ একই সময়ে ও সমভাবে ঘটেনি কিন্তু প্রগতিচিন্তার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল। প্রথম দিকে প্রগতিবাদী আন্দোলন সুসংগঠিত ছিল না। চল্লিশ পরবর্তী কালে ভারতীয় কবিতায় প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতা অবশ্য এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

'জয়ন্তী' (১৯৪৪) পত্রিকায় প্রকাশিত কমল নারায়ণ দেবের — প্রগতিবাদী কবিতার টেকনিক প্রবন্ধটি অসমীয়া প্রগতি কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। ভবানন্দ দত্তের 'রাজপথ', অমৃতা বরুয়ার 'কুকুর' প্রভৃতি কবিতায় ধনী দরিদ্রের ব্যবধান, ও শ্রেণী চেতনার প্রকাশ ছিল। পরবর্তীকালে হেম বরুয়া, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, হীরেন গোঁহা, প্রমুখ কবি লেখকরা সমৃদ্ধ করেছেন প্রগতিবাদী অসমীয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অনৈক্য — এসবই ছিল প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রধান বিষয়। সমাজ বাস্তবকে তুলে ধরাটাই ছিল লক্ষ্য। তার সঙ্গে মিশে ছিল আশা ও বিশ্বাস ও শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। চল্লিশের যুগে প্রগতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বহু বাঙালি ও অবাঙালি কবি সাহিত্যিক। IPTA, YCL প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর অবদান ও সুবিধাযোগ্য। ফলে চল্লিশের বাংলা কবিতায় নতুন সুর শোনা গিয়েছিল। শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত প্রগতিবাদী কবিরা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের জীবনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রগতিবাদী কবি ও কাব্যের নির্বাচিত তালিকার দিকে তাকালে তা দেখা যাবে :

	কবি ও কাব্য	বিশিষ্ট কাব্য	ভাষা	প্রকাশ
১.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিক	বাংলা	১৯৪০
	কুসুমাগ্রজ	বিশাখা	মরাঠি	১৯৪২
	বিষ্ণু করন্দিকর	যোগভঙ্গ	মরাঠি	১৯৪৪
	আন্নাভাউ সাঠে	শরীর	মরাঠি	১৯৪২ (?)
	দিনকর (রামধারি)	হুঙ্কার	হিন্দি	১৯৫০
	নাগার্জুন	আকাল	হিন্দি	১৯৪৪
	মুক্তিবোধ (গজানন)	ভার সপ্তক (সং)	হিন্দি	১৯৪৩
	[illegible] মিশ্র	মুক্তিমন্ত্রী	[illegible]	[illegible]
	দাশরথি	অগ্নিধারা	তেলুগু	১৯৪৯
	শরচ্চন্দ্র মুক্তিবোধ	'আত্মিক'	মরাঠি	১৯৫৭
	শ্রীশ্রী	কন্যা	তেলুগু	১৯৭৩

বলাবাহুল্য, এই তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাত্র কয়েকটি ভাষার কয়েকজন নির্বাচিত কবির কাব্যেরই উল্লেখ করা হল। তবে শেষোক্ত কাব্যটি একটা সাম্প্রদায়িক তেলুগু কবিতার সংকলন। প্রগতিবাদী কবিতা আন্দোলন যে কোন মাত্রায় তা নতুন ভাবে ও ভাবনায় বিকশিত হয়ে চলেছে এ সংকলন তারই প্রমাণ। এমন সংকলনের অনেক উদাহরণ পরবর্তীকালে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলোতেও পাওয়া যায়।

৪

স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতীয় কবিতার ইতিহাসে 'নতুন কবিতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে এই নতুন কবিতা বর্ণিত। কন্নড় ভাষায় এর নাম 'নব্য কবিতা'। ওড়িয়া ভাষায় 'নতুন কবিতা' আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫৫ সালে গুরুপ্রসাদ মহান্তি ও ভানুজী রাও সংকলিত 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হবার পর। পরবর্তীকালে গুরুপ্রসাদ মহান্তি, রমাকান্ত

রথ নতুন কবিতাকে সমৃদ্ধ করেন।

তামিল ভাষায় ১৯৫৯ সালে এনুট্টু পত্রিকা প্রকাশিত হলে নতুন কবিতা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কবিতাকে বলা হয়েছে 'পুদুক্' বা পুদুককুবলকব (নতুন গব)। কে এস সুব্রহ্মণ্যম, বেনু গোপালন, সুন্দর রামস্বামী প্রমুখ কবিরা নতুন কবিতার বর্ণময় শিল্পী। মালয়ালম ভাষাতে নরোদয় কবিতার বহু বিতর্ক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিভিন্ন ভাষায় যে নতুন কবিতা লেখা হয়েছিল তা নিছক অকারণ নয়। বরং পূর্ববর্তী ধারার কবিতাকে অস্বীকার করে নতুন কিছু সৃষ্টির প্রবণতাই নতুন কবিতার মূলে। হিন্দীতে নয়ি কবিতা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। প্রগতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সম্ভবত নতুন কবিতা লেখা শুরু হয়। গিরিজা কুমার মাথুর, ধর্মবীর ভারতী, মদন বাত্সায়ন কুলওয়ার নারায়ণ প্রমুখ কবিরা নয়ি কবিতা আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেন।

১৯৬৩ সালে 'তসরা সপ্তক' পত্রিকাটি নেপালি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবি বৈরাগী কানহিল ও গল্পকার ঈশ্বর বল্লভ ও ইন্দ্রবাহাদুর রাই এ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। প্রথম সংখ্যায় বৈরাগী নিজে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। 'মতে কো মনছে কো ভাষণ' নিজের মনের কথা লিখে এই কবি সেদিন নেপালী নতুন কবিতার সূচনা করেন।

কি ছিল এই নতুন কবিতায়? ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার নতুন কবিতা কি একটিই আন্দোলন? তার কাব্যিক প্রকাশও একই রকম? এই সব নানা প্রশ্ন উঠতে পারে নতুন কবিতা সম্পর্কে উঠলেই। আরও প্রশ্ন হতে পারে বাংলা নতুন কবিতা বলে কিছু আছে নাকি?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে বাংলা কবিতার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যগুলো বোঝা দরকার। প্রথমে দেখা যাক নতুন কবিতা বইতে বিভিন্ন ভাষায় কী বোঝানো হয়েছে। দু একটি উদাহরণ দেব।

ওড়িয়া কবিতার ক্ষেত্রে সত্যযুগ, সবুজযুগ ও নবযুগ পেরিয়ে নতুন কবিতার সূচনা। সত্যযুগের জাতীয়তাবাদী কবি ছিলেন পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস। তাঁর বন্দীর আত্মকথা (১৯২৩), কারা কবিতা (১৯২৮) ওড়িয়া কবিতার স্তম্ভ। তার পর এল সবুজযুগ। অন্নদাশঙ্কর রায় কালিন্দীচরণ প্রমুখ কবিরা নতুন সুর সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন সেদিন। নবযুগের কবি শচি রাউথ রায় লিখলেন 'পল্লীশ্রী' অথবা 'বন্দি রাউথ' (১৯৩৮) এর মত বিশিষ্ট কাব্য। 'পাণ্ডুলিপি' (১৯৪৭) কাব্যে নতুন আশা ও বিশ্বাস ধ্বনিত হল। তারপর এল নতুন কবিতার যুগ।

ওড়িয়া নতুন কবিতা সংকলনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নানা বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটলো। গুরুপ্রসাদ মহান্তি 'সমুদ্রস্নান' প্রভৃতি কাব্যে ভালবাসার ধারণাকে কোন রোমান্টিক বিষয় করে তুলতে চাননি। গুরুপ্রসাদের 'বিষাদ এক ঋতু', সৌভাগ্য মিশ্রের অন্ধ মৌমাছি রমাকান্ত রথের 'সপ্তম ঋতু' প্রভৃতি কাব্যে মানবমনের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নৈরাশ্যবোধ, অস্তিত্বের অর্থসন্ধান প্রভৃতি নানাভাবে ও ভাষায় ফুটে উঠল। পাঞ্জাবী নতুন কবিতার লেখক মনজিৎ সিং কাঁছির তো নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলতে চান।

কন্নড় 'নবকবিতা' পরীক্ষা করলে দেখা যায় পাশ্চাত্য ভাব ও ভাবনার সঙ্গে সেখানে মিশে আছে অন্তর্মনের ভাবনা। অস্তিত্ববাদী চেতনার ও প্রকাশ ঘটেছে। শব্দ ব্যবহার অনেকসময় বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। আবার চেয়ে ইংরাজীতে কাব্যকর্তা দেখা যায় অন্যদিকে নেপালী নতুন কবিতায় ইংরেজি সেকেন্ড সার্ট্র কাম্যু প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব যেমন আছে, বাংলা আধুনিক কবিদের প্রভাবও তেমন অনুভব করা যায়। অসিত বাই, শরদ ছেত্রী প্রমুখ কবির রচনায় তার প্রমাণ মিলবে। আবার চারু ছত্রুর নিজে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নেপালী কবিতা নতুনত্বের সূচনা করেন।

হিন্দী নবীন কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাশ্চাত্য প্রভাবের সঙ্গে মিশে আছে দর্শনীয় জটিলতায়। অস্তিত্ববাদের ছাপ পড়েছে। কিন্তু তার নতুন চেতনা দেখা পরিবেশের প্রভাবে। আট পরবর্তী হিন্দী কবিতায় 'অকবিতা', অকবিতা প্রভৃতি নানা অভিনব লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চাশ পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তা নতুন কবিতার অভিধার পাবার যোগ্য। হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী উত্তর আধুনিক প্রভৃতি ভাবনা ও আন্দোলন তারই বিভিন্ন দিক বলা যায়। আসল কথা হল বাংলা কবিতা অনেকটা ভাবধারা কবিতার মধ্যে থেমে নেই। তার গতিপথ নতুন অভিজ্ঞতার দিকে প্রবাহমান হয়েছে।

পাঁচ

দলিত কাব্য আন্দোলনের কথা না বললে বাংলা কবিতার ভাবধারায় পরিবর্তনের কথা সম্পূর্ণ হবে না। মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মূল শক্তি হল কবিতা। নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের যন্ত্রণা আজ প্রতিবাদী ভাষা পেয়েছে দলিত কবিতায়। দলিত কবিতা তথা সাহিত্যের চার প্রধান লক্ষণ হল এই রকম—

১. আত্মজ্ঞান
২. আত্মশোধন
৩. বিদ্রোহ
৪. ঘৃণা

এই সব লক্ষণ দলিত কবিদের রচনায় স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে। নামদেব ঢসালের 'গোলপীঠা' কাব্য সংকলনে কবি লিখেছেন—

এই ঘোর বন্দী দশা কত দিন আর সইবে
ঐ দেখো, ঐ দেখো, মাটি ভেদে উঠেছে অহংকারে
জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখর হয়েছে আমার আত্মা
রক্তের ভেতরে অসংখ্য সূর্য
এখন এই শহরে আগুন লাগিয়ে চল—'

শুধু নামদেব নয়, দয়া পাওয়ার, বাবুরাও বাগুল, অর্জুন ডাঙ্গলে, যশোবন্ত মনোহর,

কেশব মেতাম, বাজা ঢালে, চোখা কাম্বলে প্রমুখ মরাঠি কবিদের দানে দলিত কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে

মহারাষ্ট্রে দলিত কবিতার সূচনা হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দলিত কবিতা আন্দোলন দাঁড়িয়ে পড়েছে বাংলা কবিতাও পিছিয়ে নেই তবে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই দলিত কবিতার বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে বেশি গুজরাত কন্নড় ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে দলিত কবিরা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছেন এটা খুবই আশার কথা

আধুনিক বাংলা কবিতার ভারতীয় প্রেক্ষিত বিচার করলে এই কথাটিই স্পষ্ট হয় যে বাংলা কবিতা কোন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয় অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে যে ভাব ও ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছে বাংলা কবিতাতেও তার অনুরণন শোনা যায় সামগ্রিক ভাবে আধুনিক ভারতীয় কবিতার নানা রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় বাংলার মত অন্যান্য ভাষার কবিতাতেও। অনেক সময় ভাব সাদৃশ্য এত বেশি যে বলে না দিলে দু'টি ভাষার আধুনিক কবিতা পৃথক ভাবে চিনতে কষ্ট হয়। বীরেশ্বর বড়ুয়ার একটি অসমীয়া কবিতা এইরকম—'

খণ্ড পরিচয়ের অক্ষরগুলো
আঙুলে নিয়ে গুনছি
সৌজন্য সাক্ষাৎ অথবা
হাতে তুলে দেওয়া এক কাপ কফি
এসবই সিঙ্গাপোরের হিসাব ধরা পড়ে না
কর্মফল? ভাগ্য? এই সব হিসাবের খাতা
অন্ধকারে মুছে যায়
স্বপ্নগুলোকে কেই বা পারে
টুকে রাখতে
গিরগিটির লেজের মত নেমে যাওয়া ডালের পাতায়।'

এ কবিতা পড়ে পাঠকের যদি মনে পড়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতা—'

তেমন কোনো কভার নেই, দেনাপাওনার কথা নেই—
থোক হিসেব
দেখা হয়, দেখা না হলে দেখা হয় না।

তবে আধুনিক ভারতীয় কবিতার সেই পাঠককে দোষ দেওয়া যাবে না।

আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজীবনের উপাদান নির্ভর শৈলী হল লোকাভরণ। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, নজরুল বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট কবিদের রচনায় লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায়। কবিরা লোকজীবনের নানা উপাদানকে কবিতার শিল্পনির্মাণের

অবিভাজ্য অংশ করে তুলেছেন ফলে লোকাভরণ শিল্পীগত বিশিষ্টতার সার্থক উপাদান হয়ে উঠেছে।

লোকাভরণ প্রধানত অন্বয়ী ও অনন্বয়ী এ দু ধরনের হতে পারে। অন্বয়ী লোকাভরণ কোন কবিতার পদাবয়ে বাক্যাংশে ভাবনায় অলঙ্কারণে অথবা পদপূরণে ব্যবহৃত হয়। অনন্বয়ী লোকাভরণে মূল লোকোপাদানটি কাব্যশরীরের সঙ্গে অন্বিত হয় না। কিন্তু অন্বয়ী লোকাভরণে তা কাঙ্ক্ষিত পদ বা বাক্যের অন্বয়ে প্রকাশিত। কোনো কবিতা সামগ্রিক ভাবে লোকোপাদানে নির্মিত হলে লোকাশ্রিত কবিতার সৃষ্টি হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'দশানন', কালা ধলা ভাই আহমদ', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' ও অন্যান্য কাব্যের অনেক কবিতায় লোকাভরণের শিল্পী রূপ লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণু দে র 'সাত ভাই চম্পা', সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখী' প্রভৃতি কবিতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চল্লিশ পরবর্তী কবিরা বাংলা প্রবন্ধ ও রচনায় বস্তুনিষ্ঠ বিস্তার দেখা যায়। অন্য দিকে ভারতীয় কবিদের রচনায় লোকাভরণের প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে, বাংলা কবিতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কতটুকু এসব প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় কবিতার তুলনামূলক পাঠেরমাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।

সাত

আধুনিক ভারতীয় কবিতার রূপ বড় বিচিত্র। নানা ভাষায়, নানা বাক্য নানা ভঙ্গিতে তার প্রকাশ। সব প্রাদেশিক ভাষায় একরকম তার বিকাশ ঘটেনি। আবার সর্বত্র তার প্রকাশ একরকমও নয়। মণিপুরী, নেপালী প্রভৃতি ভাষায় আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে ধীরে। বিশিষ্ট মণিপুরী কবি ও সমালোচক ই নীলকান্ত সিং একটি প্রবন্ধে পূর্ব ভারতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় আধুনিক মণিপুরী সাহিত্যের ক্ষীণ অথচ প্রবহমান ধারাকে মণিপুরের নমবুল নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কোনো কোনো ভারতীয় ভাষায় মহাকাব্য রচনার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে বাংলা কাব্যে মহাকাব্য রচনার যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে। বাঙালি কবিরা গীতিকবিতার পথ ধরে। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলেও কোনো কোনো ভাষায় মহাকাব্য রচনার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ মৈথিলী বা ওড়িয়া কবিতার কথা বলা যায়। বিশিষ্ট মৈথিলী কবি সুরেন্দ্র ঝা 'সুমন'-এর লেখা 'দত্তোটি' একালের একটি বিশিষ্ট ভারতীয় মহাকাব্য। অষ্টাদশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবই স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাই গুরুত্ব পেয়েছে এ কাব্যে। তবে পৌরাণিক পটভূমিতেই অযোধ্যার রাজা মৃগাঙ্ক দত্ত ও উজ্জয়িনীর শশাঙ্কবতীর প্রণয় এই কাব্যে মূল। অযোধ্যাবাসীর দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক ভাবাবেগেই মধ্য আধুনিক ভারতবাসীর স্বর শোনা যায়। মৈথিলী সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত এ কাব্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কবি কৃষ্ণনন্দন সিং-এর 'স্বাধ, স্বহ, ভগৎকর'

মহাকাব্যটিও পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত বিশিষ্ট মহাকাব্য। তার পাশাপাশি মহেন্দ্রবীর সিং, মাহেশ ও কেশব ঠাকুর সম্পাদিত 'অরালিত্তুরা' আধুনিক তেলুগু কবিতার বিশিষ্ট সংগ্রহ। বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের তেলুগু মহাকাব্য 'রামায়ণ কল্পবৃক্ষম্' (১৯৭১) ও অতুলনীয়।

আধুনিক ওড়িয়া কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ মহাকাব্য রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী। যদুনন্দনের লেখা 'অহি মহাকাব্য', ওড়িয়া মহাকবি সরলা দাসের মহাকাব্যের আদলে লেখা আধুনিক মহাকাব্য। কটক শহরের সাধু বেণীর জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই বিশাল কাব্য সমাজের নিম্নস্তর মানুষেরই জীবনালেখ্য।

মহাকাব্য লেখার প্রবণতা থাকলেও ছোট কবিতাও লেখা কম হয়নি। জানকী বল্লভ পট্টনায়কের সিন্ধু উপত্যকা (১৯৮৭) সমসাময়িক জীবন ও ঘটনার সংহিতাকে রূপায়ণ। আধুনিক ওড়িয়া কবিতায় বেণীধর, [illegible] কবির মধ্যে আছেন হরিহর মিশ্র (ভাবনি মণ্ডপ), বিপিন বিহারী [illegible] (মহাস্থবির বটু), কুন্তলকান্ত লেঙ্কা (দুঃখ সহ কথকতা), হৃষিকেশ মল্লিক (বেদনাসীতা ঝি) প্রমুখ কবিরা।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে যে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের (AIPWA) সম্মেলন হয়েছিল তখন ভারতীয় প্রগতিবাদী লেখকরা সংগঠিত হতে পেরেছিলেন। সাজ্জাদ জহীরের প্রস্তাবিত বিলেতের লেখক সংঘের ফর্মুলা ও অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে কথাবার্তার পরই AIPWA-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারপর থেকে প্রগতিবাদী চিন্তা [illegible] বিকাশ ঘটে। তবে এই সংঘের প্রতিষ্ঠার আগেও ঝাবেরচাঁদ মেকলাই উমাশঙ্কর জোশী ইলাচন্দ্র যোশী প্রমুখ বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিরা ভারতীয় কবিতার সীমা অনেকটাই প্রসারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দ প্রমুখ বাঙালি কবিদের প্রভাবে অবশ্য আধুনিক ভারতীয় কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং উন্মুক্ত করেছে নতুন নতুন দিগন্ত। বৈদ্যনাথ মিশ্র দু'টি ভাষায় কবিতা লিখেছেন। মৈথিলীতে 'যাত্রী' ছদ্মনামে ও হিন্দীতে নাগার্জুন ছদ্মনামে। ভারতীয় প্রগতিবাদী কবিতায় তাঁর অবদানও স্মরণীয়। নবোদয় পর্বের 'নয়া' কবিতার মাধ্যমে আধুনিক কবিতা এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথে।

তেলুগু কবিতায় একসময় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ভাব কবিতা লেখা হত। এই রোমান্টিক কাব্য আন্দোলন কল্পনিকোদ্যমম নামে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু এ দশকের শেষে দীর্ঘ এবং গাথা কবিতা লেখা হতে থাকে। বিখ্যাত তেলুগু কবি ও উপন্যাসিক বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ একদা 'অন্ধ প্রগতি' (১৯২৭) কাব্য রচনা দিয়ে তেলুগু কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যিক রচনা 'রামায়ণ কল্প-বৃক্ষম' (১৯৭২) তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। কন্নড়, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার মতই তেলুগুতেও দীর্ঘ কাব্য ও মহাকাব্য রচনার প্রবণতা এমনিভাবে আধুনিক ভারতীয় কবিতায় বিশিষ্টতা পেয়েছে। ঠিক যেমন গালিবের গজল অথবা ইকবাল কবিতার স্থান। মহম্মদ ইকবাল ভারতীয় কবিদের মধ্যে উর্দু ও পারসি উভয় ভাষাতেই কাব্য রচনা করেন। উর্দু কবিতায় গালিবের পরেই ইকবালের স্থান তর্কাতীত।

আধুনিক ভারতীয় কবিতা বিচিত্রগামী ও বহুমুখী। রোমান্টিক, অতীন্দ্রিয়বাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি কোন একটি অভিধায় তাকে বেঁধে যায় না। তার গতিপথ সরলরেখায় প্রসারিত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ অটুট সত্য। যা সাদৃশ্যযুক্ত এমনও বলা যাবে না। তবে একথা সত্য যে আধুনিক বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে আধুনিক ভারতীয় কবিতার স্বরূপ বোঝা জরুরী।

'নারায়ণ' থেকে নানা কবিতার ধারা। শুধু প্রাদেশিক ভাষায় নয়, ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষাতেও ভারতীয় কবিতা লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। ভারতীয় কবিতার নানা স্তর, নানা বর্ণ ও বিস্ময়ে বিস্ময়ে [illegible] নানা প্রভাব পড়েছে ভারতীয় কবিতায়। একজন ভারতীয় কবি যেন বারবার নানা বিচিত্র বর্ণ [illegible] আসতে চায় নানা বিদেশী ভাব ও ভাবনার অনুসরণে। স্বভাবিক স্বাধীন সুর সুস্থপরিচ্ছন্ন কথাটাই ধ্বনিত হয় বারবার। নেপালী কবি দুর্গেন্দ্র [illegible] কবিতায় যেমন লেখা হয়েছে—

আমার দেশের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব রক্ষায়
ব্যস্ত ছিলাম দেশের সীমান্তে
ত্রিবর্ণ পতাকা তুলে ধরেছি বারবার
বনে পাহাড়ে [illegible]
কিন্তু যখন [illegible] এলাকায় [illegible]
আমার গ্রাম [illegible]
আমার বাড়ি [illegible]
আমার [illegible]
আমার বৃদ্ধ বাবা মা [illegible]
আমার ঘরের মেয়েরা
ধর্ষিত হওয়ার লজ্জা [illegible]
আমাকে দেখে সমস্ত উত্তর পূর্ব অঞ্চল চীৎকার করে বলছে
'বিদেশী' ফিরে যাও, বিদেশী ফিরে যাও।
জিজ্ঞাসা করি দেশের সংবিধান আর সব গড় চুক্তিকে
"আমি কে? বলতো আমি কে?"
কালা আর অন্ধ হয়ে যেন সবাই
চুপ করে তামাশা দেখছে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি আশায় বুক বেঁধে :
কেউ আমার হয়ে বলবে নিশ্চয়
কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দেবে নিশ্চয়ই।

এই সংশয় আর বিশ্বাস, আশা ও আত্মপ্রত্যয় বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় কবিতা অশ্রুত নয়।

তথ্যসূত্র :

১ দ্রষ্টব্য উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ভারতীয় প্রকাশটি বিপ্লব চক্রবর্তী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ২০৪।

২ দলিত সাহিত্য একটি বিতর্ক ঐকতান দলিত সাহিত্য বিতর্ক সংখ্যা ১৯৯৭, পৃ. ক ৪-৫।

৩ [illegible] অনুবাদ বর্তমান লেখকের

৪ লিলিয়ন [illegible] অনুবাদ লেখকের

৫ সুদেষ্ণা [illegible], [illegible] [illegible] পোস্টমার্ন

৬ লোকায়ত : বাংলা [illegible] বিপ্লব চক্রবর্তী, কলকাতা, ২০০১

৭ Monipuri Among Eastern Literatures Prachi Ed Surendra Jha Suman , Sahitya Akademi 1992 P , 71

৮. অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব
(জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে র কবিতা)

মঞ্জুভাষ মিত্র

এই লেখাটির নাম হতে পারত আধুনিক বাংলা কবিতায় ও আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতা। একটি তুলনামূলক আলোচনা নিশ্চয় হতে পারত নাম হতে পারত আধুনিক বাংলা কবিতায় আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতার [illegible] সাহিত্য প্রভাবের আলোচনায় সাদৃশ্য আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাদৃশ্যই একটা মূল ভিত্তি যা নতুন কবি [illegible] কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি বাংলা কবিতা পড়লাম সঙ্গে ও জীবনানন্দের সঙ্গে ইয়েটসের, সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালার্মের, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে হপকিন্সের, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এজরা পাউন্ডের, বিষ্ণু দে র সঙ্গে এলিয়টের সাদৃশ্য [illegible] কবিদের সঙ্গে [illegible] পাশ্চাত্য [illegible] [illegible] ক্ষেত্রে বঙ্গীয় কবি তাঁর প্রিয় কবিদের দ্বারা [illegible] প্রভাবিত হয়েছেন। [illegible] নিশ্চয় হয়েছেই এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছে। [illegible] সহমর্মিতা আছে, দুটি কবি [illegible] শতকীয় সময়কাল ও [illegible] তা আধুনিক বাংলা কবিতার [illegible] যায়।

বিশ্বসাহিত্যের ভূগোলে যদি পরিক্রমা করি [illegible] যদি চোখ রাখি, হাতের দেখি প্রভাবমূলক আলোচনা [illegible] লেখা *From Eliot to Counter* অথবা [illegible] *The Heritage of Symbolism* ইত্যাদি বইয়ের নাম মনে পড়বে। বিশ্ব সমালোচকের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট কবিকে আলোকিত করা। অনুসরণের কাছে এই কবির মূল [illegible] তার নিরূপণ এ ক্ষেত্রে একটা উপায় মাত্র। [illegible] বিশ্ব সাহিত্যের [illegible] *Weltliteratur* এর ধারণাটা তাই গুরুত্বযোগ্য। সাহিত্য [illegible] এক অপূর্ব বহমান ঐতিহ্য। দেশে দেশে কালে কালে মানুষের চিন্তার [illegible] সমান্তরালতা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। এইসব পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখে বলা যায় আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব কথাটা কোনো সঙ্কীর্ণ জাতিমূলক তত্ত্বের প্রমাণ বহন করে না বরং তা এক উদার বিশ্বভূমিক সৌন্দর্যবাদের আলোকে বাংলা ভাষার কবিতাকে জানানোর প্রয়াস সূচিত করছে।

পথটা যিনি দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ইংরেজ কবি টমাস স্টার্নস এলিয়ট। তাঁর *Tradition and the Individual Talent* নামক প্রবন্ধটি এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলছেন, আমরা সাধারণত কোন কবির প্রশংসা করি তাঁর লেখার যে অংশগুলো আর

কারো সদৃশ, যা তাঁদের কথা মনে রেখেই কিন্তু নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান চালালে বোঝা যায় তাঁর কবিতার সেই অংশগুলিই শ্রেষ্ঠ যেগুলি মৃত কবিরা তাঁর পূর্বগামীরা বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন এরই নাম দিয়েছেন এলিয়ট কবিতার ঐতিহ্য' যা ব্যক্তিগত প্রতিভার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এই ঐতিহ্য শব্দটির মধ্যে গভীর গভীরতর তাৎপর্য আছে এবং এই ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য নয় বরং পরিশ্রমে লভ্য *No poet, no artist of any art has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead. You must set him for contrast and comparison among the dead* --পাঠকের কাছে কোন কবি একা কিন্তু একজনের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক সম্বন্ধ উদ্ঘাটন করতে পারেন না তাঁর তাৎপর্য তাঁর অন্যান্য মৃত কবিকুলের সঙ্গে সম্পর্কের অনুক্রমেই অবদ্ধ হতে পারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে একলাভাবে একজন কবির মূল্যায়ন করা যায় না বিশ্বকবিদের ও অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনা এ ক্ষেত্রে খুবই জরুরী এলিয়টের এই বক্তব্য আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাবের আলোচনায় প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে

[illegible] দিক থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবিরা রবীন্দ্রসৃষ্ট ভাষাভূমিকে [illegible] করলেও [illegible] রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন না, আসলে নিজস্ব মৌলিক আবেগকে প্রকাশিত হওয়ার জন্যে তাদের এই আচরণই ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক [illegible] কেবল [illegible] মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই কবিত্রয়ী ভাবের দিক থেকে [illegible] রবীন্দ্রবিদ্রোহী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা রোমান্টিক [illegible] অতিক্রম করেছেন বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার আদিসূত্রধার কবিত্রয় ভাবের দিক থেকে শুধু যে নতুন ও ভিন্ন পথে গেলেন তা নয় তাঁরা কবিতার কলাকৌশলেও অনাধুনিকতার মাত্রা ও ত্রুটিটি খুঁজলেন। রোমান্টিকতাকে বিদীর্ণ করে এবং রোমান্টিকতার প্রতি স্পর্ধাকারেই যে তাঁরা উদিত হয়েছেন একথা কালের পুতুল, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ স্বগত কবিতার কথা প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখেরা খুব জোরের সঙ্গেই বলে গেছেন অন্তর্দৃষ্টিবলে তাঁরা বুঝেছিলেন নতুন সময়ের নতুন যন্ত্রতন্ত্রের তাঁরাই হবেন ধারক ও বাহক

'যেখানে আধুনিক কবিতা সুকুমার বক্তব্য থেকে চলেছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্ত রাখবার জন্যে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায় একে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে " রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাত না, অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিশ্বস্থ সম্মুখে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, র্যাঁবো ওয়েটস ও এলিয়ট এর সদর্থক বা নঞর্থক মননবিচিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।' জীবনানন্দ দাশের কবিতার কথা গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক প্রবন্ধের এই বাক্য দুটি মূল্যবান এইজন্য যে এতে আধুনিক কবির আদর্শ হিসেবে রবীন্দ্রকাব্যকে গ্রহণ

করার ব্যাপারে যেমন অনীহা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বিদেশী কবিদের কাছে সচেতনভাবে ঋণগ্রহণের প্রসঙ্গটিও এসে গেছে। বিশেষ করে এটাও লক্ষণীয় যে এখানে এখন তিনজন কবির উল্লেখ আছে— ডাবলিন ইয়েটস ও এলিয়ট। যাঁরা সকলেই জীবনানন্দের যেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রেরণার কাজ করে গেছেন। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিতার যে শিল্পবিধান নির্মাণ করেছেন, তা নিয়ে কাজ করে গেছেন, ইয়েটস প্রভৃতিও প্রায় সেই একই শিল্পবিধানের নির্মাতা ও প্রস্তাবক।

জোলাক চিরাবির বইটির নামই *Esthetics of Modernism*। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইংরেজি কবিতার প্রভাব সম্পর্ক নিয়ে বলতে গেলে আধুনিক কবিতা কথা আধুনিকতার সংজ্ঞা ও শিল্পতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক পাশে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পূর্বলিখিত 'কবিতার কথা' প্রভৃতি বইগুলি, বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক কবিতার সংকলন, ক্লীন্থ ব্রুকস এর *Modern Poetry and the Tradition* এবং আর লীভিস এর *New Bearings in English Poetry* ও এডমান্ড উইলসন এর *Axel's Castle*, টি এস এলিয়ট এর *Selected Essays* এর নানা কাল প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত আছে এর *Children of the Mire* এবং এমনকি আমার এবারের আলোচ্য গ্রন্থ *Composition of Poetry* প্রভৃতি রচনাবলী ও বাংলা কবিতাসংকলন 'সো অফ বোদলেয়র' ও *Curiosities Aesthetiques* গ্রন্থ নিয়ে কিছু কিছু কাজ করেছি। এই যদি পাঠ করেন তিনি আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে অনেকটা স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হবেন। এবং একজন আধুনিক কবির পক্ষে প্রভাব ব্যাপারটা কেন এত জরুরি তাও বুঝতে পারবেন। দু এক কথায় বলা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উদ্ভূত এক বিশেষ সময়ের কবিতাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতায় অনেকে পাঠক কুৎসিতকে নন্দনতত্ত্ব ও প্রথাসিদ্ধ সুন্দরের পাশাপাশি কুৎসিতের ভিতর থেকেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করে নেয়া অথবা সুন্দর ও কুৎসিতকে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা। এটা ভাবের দিক থেকে। ভাষার দিক থেকে কবিতায় মসৃণ শব্দের পাশাপাশি আয়াসে কর্কশ শব্দের ব্যবহার কবিতার ভাষাকে নূতন ভাষার কাছাকাছি করে তোলার প্রবণতা বাড়ায় আধুনিক কবিতায়।

আধুনিক কবিতায় আধুনিক কবির শ্রেণি বিন্যাস হয়ে উঠেছে নগরজীবনের বীরগাথা—সমালোচক যাকে ইংরেজীতে বলেছেন *Heroism of Modern Life*। একটা কারণ নগর জীবনের যত সুন্দর ও অসুন্দরের একবড় সঙ্গমস্থল আর নেই। মানুষের মনের অসুস্থতার এত বড় দর্পণও আর নেই। এখানেই বিচূর্ণ আত্মর পুনরুজ্জীবন ঘটে গেছে। বোদলেয়ারের পারিসচর্যা, বাঁকা ও নগরচিত্র, লা ফর্ম ও কলচিত্রের এবং নগরভিত্তিক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন, এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ড, জীবনানন্দ এবং একবার্শ মিলার মনুষ্যমৃত্তিকা কলকাতা বিষ্ণু দে-র জন্মাষ্টমীর কবিতাগুলি সবই নগরজীবনের প্রতীকের মত ব্যবহার করেছে এবং বিশ্বকবিতার পাঠক অনুভব করবেন এই সংকেত এর আদি উদ্ভাবক বোদলেয়ারের এত কাউকে কাউকে বলা গেলেও কেউই প্রায় একক ভাবে নিজেকে আবিষ্কারক বলে দাবী করতে পারেন না বরং নানা কবির নানান আবিষ্কারের পাশাপাশিই

গাঁথা পড়েছে আধুনিক মানুষের যাপিত জগৎ জীবনের মহাভাষ্য। অগ্রজের কাছে পরবর্তীর ঋণ স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছে।

নগরবাসী কবির শারীরিক অক্ষমতা বিষাদ অনুতাপ ও নৈঃসঙ্গ কি ভীষণ বেদনায় আর্ত হয়ে উঠেছে কবির হৃদয় উদ্ভাসন করেছে শার্ল বোদলেয়রের *Spleen* কবিতাগুচ্ছের একটিতে।

নীচু আর ভারী এই আকাশ যখন এক ঢাকনার মত চেপে বসে আত্মার যে দীর্ঘকালে চিন্তায় জীবিত এবং বোকামি মানুষের চক্ষু দিয়ে যতদূর দেখা যায় সে বিছানো অদ্ভুত আঁধার এক বর্ষণের ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বিষাদ রচিত পৃথিবী যখন কারাগার হয়ে গেছে নিজন কারাগার যার সেইখানে সাঁতারহীন আঁধারের তার ভীতু ডানা নিয়ে আশা এক বাদুড়ের মত ছুটে বেড়ায় বুকে করে ক্ষীণ আঘাত ক্ষয়িষ্ণু ভিতের ছাদে মাথা ঠুকে বারবার গিয়ে মাঝে সজল বৃষ্টি বিস্তার করেছে তার অনুরণন ধারাপাত অনুকরণ করেছে গারদঘরালাকে কোন নিরাশ কুকুর আর যত মাকড়সা নীরব ও ঘৃণাবাদের পুরো আত্মাদের সারামন ঘিরে বেড়ে গুনে বুনে জালগুলো অজস্র ঝুলায় হঠাৎ কাফেন, কর্তিকা, ঘণ্টা বাজে ভয়ানক ক্রোধে আকাশের দিকে ছোঁড় মেলে ভীষণ গড়ন আত্মাদের স্বরণ করিয়ে দেয় দিবাকালের মতন শব্দহীন ফেরা একজোট হাতে হানা শুরু করে তাহাদের গূঢ় অভিযোগের বচন নিরুত্তর ঢাকে দুখের বাজনা ছাড়া কবরখানাটি নীল কোলাহাটা করে আমার নির্জন হৃদয়ের ভিতর দিয়ে ঢুকে বিষণ্ণ কীর্তন আশা পরাজিত হয় মৃত্যুর ক্রুর প্রেতাচারী তার কালো পতাকাকে আমার মাথার খুলির ভিতর অকস্মাৎ প্রোথিত করেছে (*Spleen Spleen et Ideal*) অনুবাদক অমূল্যকুমার মিত্র।

আরো আগে এই জনতাকে (*Living dead* 'জীবন্ত যে মৃত') বলে সম্বোধন করেছেন টি এস এলিয়ট। এই জীবন্ত মৃত বলা বাহুল্য কবিরই নির্বাচিত আত্মা। নগর কারার সাধারণ নাগরিকের অসামান্য প্রবন্ধ লিখে এলিয়ট তুলেন ঋণ ও সামান্য শোধ করেছিলেন। ১৯২২ সালে *The Waste land* এর প্রথম অংশ *The Burial of the Dead*—এ এলিয়ট লিখেছিলেন

Unreal City,

Under the brown fog of a winter dawn A crowd flowed over London Bridge so many I had not thought death had undone so many Sighs shout and infrequent were exhaled and each man fixed his eyes before his feet

শীতসকালে বাদামী কুয়াশার লহরে ঢাকা অবাস্তব শহর। লণ্ডন ব্রীজের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে অগুনতি জনতা। জনতা না মৃত্যু এতজনকে শেষ করে গেছে। তারা ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। ইঁপাচ্ছে, প্রতিটি মানুষ দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছে তার পায়ের আঙুলে। অর্থাৎ তারা চলেছে মাথা নীচু করে।

নগরমানুষের এই প্রেতমিছিলকে বিশ্ব আধুনিক কবিতায় বিশ শতকের কবিতায় বার বার দেখা গেছে। এ হয়ে উঠেছে প্রিয় প্রতীক অথবা চিত্রকল্পের মত—বিষাদের

ভালোবাসায় পড়ে ছিলেন যাঁরা আত্মাকে চিরে চিরে পথনির্মাণে ব্রতী ছিলেন যে সব কবিরা-তাঁদের কাছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে এই নগর-দর্শনের ছবি উদ্ধার করে দিচ্ছি —

'অনেক রাত হয়েছে অনেক গভীর রাত হয়েছে,
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে
কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো
এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে সমস্ত শরীরের রক্ত এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি (ফুটপাথে : মহাপৃথিবী)

স্পষ্টতই এখানে আধুনিক ফাঁপা মানুষের জীবন্মৃতের মুখ দেখতে পাচ্ছি এ মুখ কবিরই মুখ।

'পাবলো নেরুদার 'পথে হেঁটে যেতে যেতে' নামে একটি অসাধারণ কবিতার কথা মনে পড়ছে সেখানে তিনি বলছেন "আমি এই মানুষী অস্তিত্ব নিয়ে ক্লান্ত এমনটা হয় যে আমি দরজীর দোকানে যাই সিনেমায় যাই একেবারে কুঁচকিয়ে ছোট হয়ে একটা ফোন্টের তৈরি বাজখাঁসের মত মূল উৎস জল ও ছাই এর উপর দিয়ে যে চলেছে। আমি কিছু চাই না শুধু শান্তি চাই পাথরের ও পদ্মের আমি প্রতিষ্ঠান দেখতে চাই না, বাগান নয় মালপত্র নয়, কাঁচ বা এলিভেটর নয় কিছু দেখতে চাই না আমার পা দুটো আর নখগুলো আমাকে ক্লান্ত করে, আমার চুল আর আমার ছায়া আমি যে মানুষ এই ব্যাপারটাই আমাকে ক্লান্ত করে।' (*Scanning the century* *The Penguin Book of the Twentieth Century in Poetry* দ্রষ্টব্য) অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অথবা সমর সেনের কোনো কোনো কাব্যপংক্তি চিন্তার সমান্তরালতা সহজেই অনুমেয় বিষ্ণু দে র পূর্বলেখ কাব্যের 'চতুর্দশপদী' কবিতার অষ্টক অংশ 'চৌরঙ্গী' থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন ধ্রুবতারা?
উদভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।
সহে না খুবই এই নিঃসঙ্গ মাথুর
স্নায়ুতে অবশাভীত আদিম ক্রন্দন
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদের ছিন্নভিন্ন একতা আতুর

বলাবাহুল্য বোদলেয়ার, এলিয়ট প্রভৃতি পূর্বযাত্রীরূপে কবিতা লিখে না গেলে এই নগরকীর্তন সম্ভব হোত না। বাঙ্গালী কবিরা কিছুটা নিজেদের হৃদয়ে অনিবার্য তাগিদ

অনুভব করেছেন আর কিছুটা পরিগ্রহণ করেছেন বিদেশী কবিদের কাছ থেকে। এভাবেই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অলৌকিক ভাব রসায়নের সংশ্লেষণে এক নতুন কবিতা পথের সন্ধান পেয়েছেন। মনস্তত্ত্ব, অবচেতনা, নির্মোহিত আত্ম বিপ্লবের স্বপ্ন সংশয় জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধিবাদ আত্মনাভির চারদিকে পরিক্রমা অথবা ভ্রমণ সংকেত চিত্রকল্প *Allusion* বা পাঠচিত্রের ব্যবহার গদ্যাঙ্গ ভাষার গদ্যময়তার অবতারণা শব্দপ্রয়োগ বাক্যগঠন লঙ্ঘন ভাবের ক্ষেত্রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যাওয়া বিপরীত আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী পাপপুণ্যের সমভূমিক ব্যবহার বক্তব্যবর্জন নারীকে জ্যোতির্ময়ী দেবী রূপে না দেখার প্রবণতা, আপাত কাব্যিক মনোবমকে বর্জন জর্মান নানা বিষয়ে সুষ্ঠুবিন্যস্ত মধ্যবর্তী বাঙালী কবিরা ইয়োরোপ আমেরিকার কবিদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। নবীন দর্পণ আমি শুধু বহুর মধ্যে একটি উদাহরণরূপে ব্যবহার করেছি। আমার 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব' গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিংশ শতকের কবিতা প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণীয় ডারউইনের *Genesis of the Species*, কার্ল মার্কসের কম্যুনিস্ট মনিফেস্টো ও *Das Kapital* ফ্রয়েডের *Introductory Lectures on Psychoanalysis* ও *Interpretation of Dreams* এবং আইনস্টাইনের *Theory of Relativity* দ্বারা গভীরভাবে পরিপুষ্ট হয়েছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতা আধুনিক ইয়োরোপীয় কবিতা দুই ই আধুনিকতার শিল্পতত্ত্বকে অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে বিদেশী কবিতা বাংলা কবিতা পাশাপাশি 'টেকসট' হিসেবে সতর্কভাবে পাঠ করলে এক শিল্প থেকে আর এক শিল্প কিভাবে প্রাণ পায়, গড়ে ওঠে তাও সহজেই বোঝা যায়। একে বলতে পারি কবিতায় শিল্পলোকের উপাদানের ব্যবহার, শিল্প থেকে উপাদান নিয়ে আপন ভঙ্গিমায় নিয়ে নতুন শিল্পের যাত্রা করা। একটা কবিতাকে আগাগোড়া অনুকরণ করে কিভাবে একটা নতুন কবিতা লেখা যায় তার আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ জীবনানন্দ দাশের 'হায় চিল' (*Keats* এর *He Reproves the Curlew* এবং 'হায় চিল' পাশাপাশি পড়লে একসঙ্গে দুটো ভালো কবিতা পড়বার আনন্দ পাওয়া যায়। অনুসরণ বর্জীয় কবির লেখনীতে অবশ্যই মৌলিক পদবী পেয়েছে। একে বলতে পারি নতুন নির্মাণ। কৌতূহলী পাঠক যদি দান্তে আলিঘিয়েরীর 'ডিভাইন কমেডী'র *Henry Francis Cary* কৃত ইংরেজী অনুবাদ চোখ রাখেন সহসা একটি বাক্যের সম্মুখীন হবেন শুরুর দিকেই সেই যেখানে ভার্জিলের সঙ্গে দান্তে তাঁর নরক-পরিক্রমা শুরু করেছেন।

I should ne'er

Have thought that death so many had despoil'd

নরকে শাস্তিপ্রাপ্ত অগুন্তি মৃতকে দেখেই কবির এ মন্তব্য। সেই সূত্রতে পাঠক প্রবেশ করবেন টি এস এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' এর জগতে এবং দেখবেন দান্তের পংক্তিটিকে প্রায় হুবহু এলিয়ট ভাষান্তরণে গ্রহণ করেছেন। *I had not thought death had undone so many* বলাবাহুল্য এলিয়ট এটা করেছেন আধুনিক নগরদর্পণকে প্রতিবিম্বিত করবার জন্য এবং এ বলিষ্ঠ ব্যবহারে এলিয়টের কবিতা অধিকতর মননশীল হয়ে উঠেছে, তাঁর

মৌলিক আবেদন হয়েছে বহুগুণিত

'আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের উপর ইয়োরোপীয় কবিদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় চিত্রকল্প, সংকেত ও অবচেতনা অর্থাৎ *Imagism Symbolism* ও *Surrealism* এই তিনটি কাব্যান্দোলনই তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করেছে। ইয়েটস্, বোদলেয়ার এবং পো ই জীবনানন্দকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন (আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব অশ্রুকুমার মিত্র) অমিয় চক্রবর্তীকে ছুঁয়ে গেছেন হপকিন্স ও এলিয়ট, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এলিয়ট বোদলেয়ার মালার্মে হইটম্যান বিশ হইটম্যান বুদ্ধদেব বসুকে এজরা পাউণ্ড বাঁধেন বোদলেয়ার নিজেকে হাল্ডারলিন এবং বিষ্ণু দে কে এলিয়ট এলুয়ার আরাগঁ লোরকা বেশী পথ দেখিয়েছেন

আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর একটি গদ্যগ্রন্থ অক্টাভিও পাজ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মেক্সিকোর বিখ্যাত স্প্যানিশ কবি – বলেছিলেন 'ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও পশ্চিমী দুনিয়ায় একটিই মাত্র আধুনিক কবিতা আছে (*Children of the Mire Trans by Rachel Philips*) তাঁরই প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই সারা বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় একটিই মাত্র আধুনিক কবিতা আছে এবং এই কবিতা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন কালে অবদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে সহজ সংজ্ঞ ভাবের বাণিজ্য ও আদানপ্রদানের পথ খোলা আছে তুলনামূলক সাহিত্যেরও প্রথম সোপান এখানে

***Bibliography* : গ্রন্থপঞ্জী**

T. S. Eliot : Selected Essays

জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা

Cleales Baude laire The Flowers of Evil (New Directions)

T S Eliot The Waste Land The Penguin Book of the Twentieth Century Poetry

বিষ্ণু দে পূর্বলেখ বত্রিশ পঁচিশ

দান্তে আলিখিয়েরী *Divine Comedy*

Octavio Pan Children of the Mire

সন্ধিক্ষণের কবিতা

অলোক রায়

সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতির যুগবিভাগের রীতি সর্বত্র সব সময়ে সহায়তা করে না। আদি যুগ কালনির্দেশের পক্ষে প্রশস্তভাবে নির্দেশিত হতে পারে, কিন্তু 'মধ্যযুগ' কেমন করে নির্দেশ করব তা বুঝতে পারি না। ইউরোপে মধ্যযুগকে একসময় ধর্মান্ধতার কাল বলা হত, কিন্তু মধ্যযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়নি এমন নয়। মধ্যযুগে দেবতাবাদ থাকলে তার পাশাপাশি মানবতাবাদ ছিল। মধ্যযুগের ঠিক অবসান কবে হল আমরা জানি না। ইউরোপে রেনেসাঁসকে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা বলা হয়েছে। কিন্তু অধুনা পণ্ডিতেরা নবিয়েসাঁস মধ্যযুগেও রেনেসাঁসের অনেক লক্ষণ দেখা গেছে। আর ইউরোপে যাকে রেনেসাঁস বলে আমাদের দেশে তা আদৌ ঘটেনি, ঘটা সম্ভব ছিল না। ফলে ইংরেজ শাসনকে আধুনিক যুগের সূচনা বলা বিভ্রান্তিকর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে লেখা হয়েছে তেরো শতক থেকে আঠারো শতক মধ্যযুগ আর উনিশ বিশ শতক আধুনিক যুগ। কিন্তু ইতিহাসের ধারণায় এবং সাহিত্যের ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ থেকে গেছে। কেউ যদি বলেন একুশ শতকের সূচনায় আজও আমাদের দেশে মধ্যযুগের অবসান হয়নি, তাহলে কী খুব ভুল বলা হয়? এমনি নানা প্রশ্ন ছাত্রদের মনে দেখা দেয়, অধ্যাপককেও তাই নতুন করে ভাবতে হয়। উচ্চশিক্ষার পাঠশালা যদি সেই কাজে অধ্যাপকদের সাহায্য করে তবেই এই ধরনের আলোচনার সার্থকতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) তখন জাতীয় জীবনে সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য অতিক্রম করে তা বাংলা কাব্যধারারও সন্ধিক্ষণ সূচিত করে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০০ সালে বিংশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ১৯২২ সালে, মৃত্যু পরবর্তী গ্রন্থের হিসেব নিলে ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'বেলা শেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'। মোটের উপর তাই বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর সত্যেন্দ্রনাথের কাল, এই সময় তাঁর সতীর্থ-সহযোগী কবি ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়। সাধারণভাবে এই কবিপক্ষকে রবীন্দ্র-বৃত্তের কবি বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই ধরনের শ্রেণীনির্দেশের হয়তো উপযোগিতা আছে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সব কিছু বিচারের প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য— কিন্তু কবি বা কাব্যের পরিচয় এভাবে মেলে না। অন্য দিকে 'কল্লোল' এর সময় থেকে সচরাচর আধুনিক কবিতার জন্ম ধরা হয় বলেই প্রাক-'কল্লোল' কবিরা অনাধুনিক বলে পরিগণিত হন। 'কল্লোল' এর প্রকাশ ১৯২৩ সালে, সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। যুগবিভাগের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক—এ দিক থেকেও বিশ শতকের

প্রথম পঁচিশ বছর তথাকথিত 'পুরোনো' কবিদের কাজ হবার কাল।

অবশ্য কবিদের এই নতুন পুরোনো শ্রেণীভাগ নিতান্ত সাল তারিখের নিরিখে অসংগত ও অসম্ভব। 'কল্লোল' পত্রিকায় বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কুসুমকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধাচরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরকুমার চৌধুরী, হেমেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জসীমউদ্দিন, নরেন্দ্র দেব, বাসন্তী দত্ত প্রভৃতিও কবিতা লিখেছেন, যাঁরা অনেকেই ছিলেন শতাব্দীর প্রথমপাদের বাংলা কাব্যধারার অনুবর্তী। অন্য দিকে 'কল্লোল' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্র প্রশস্তি (ভাদ্র ১৩৩২)। আসলে তখনও সত্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর সহযোগী কবিরা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হননি। এবং 'কল্লোলীয়' কবিদের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। ১৯২২ সালে নজরুল ইসলামের কবিতায় সত্যেন্দ্রানুসরণ খুবই স্পষ্ট

অমল নির্মল
নবল নিরামিল
বাতুল তুলতুল কাঁপায়
ঝরলো ফুলকুল
ঝরলো গুলবুল
বাতুল বুলবুল্ চপল।

'যমন-চন্দ্রমা', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯।

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া।
ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে,
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢল ঢল কায়া।

'স্তব্ধ বাদল', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

শুধু নজরুল ইসলাম নন, তরুণ জীবনানন্দ দাশ বা বুদ্ধদেব বসুও অন্তত সাময়িক ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, এমন কি আরো পরবর্তী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতায় সাময়িক ও রাজনৈতিক বিষয়ের ছন্দাশ্রয়ী প্রকাশও সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়: সত্যেন্দ্রনাথের 'ধর্মঘট' ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'উনত্রিশে জুলাই' কবিতা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে

তা হলে ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর

যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা কি সকলেই 'রবীন্দ্রনাথের মতো' হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন? অবশ্য এক হিসেবে রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য, সে কালের কবিরা রবীন্দ্রনাথের বড় কাছাকাছি ছিলেন। এ অবশ্য সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ যেমন অসম্ভব, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ছন্দের অনুসরণও এ কালে স্বাভাবিক। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তিরিশের দশকের এমন কি চল্লিশের দশকের কবিদের রচনাতেও দেখা যাবে। বুদ্ধদেব বসু তিনি মনে করেন 'রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না।' তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ সম্বন্ধেও হয়তো অনুরূপ মন্তব্য করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে চাওয়া অবশ্য দোষের নয়, অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। যেমন শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রিয়ম্বদা দেবী, সুখরঞ্জন রায়, রমণীমোহন ঘোষ, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের স্থান হলেও বাংলা কাব্যের গতিপরিবর্তনে বা প্রভাববিস্তারে এঁদের ভূমিকা নগণ্য। বুদ্ধদেবের অভিযোগ এই কবিদের সম্বন্ধে কিছুটা গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু এঁদের সম্বন্ধেও এমন কথা বলা অন্যায় হবে যে কথা সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেন। 'তিনি খাঁটি কবি না সেইটেই হল আসল কথা।' সত্যেন্দ্রনাথের এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। আসলে কবিতাবিচারে এই খাঁটিত্বের প্রসঙ্গ উঠলেই বিপদ। কারণ খাঁটি তৈল বা খাঁটি ঘৃতের মতো খাঁটি কবিত্বের বিচার চলে না, সেখানে পক্ষপাত আসে। কোনো কারণে কারো রচনা ভালো না লাগলেই তার পিঠে 'অকবি' ছাপ মেরে দেওয়াও সুবুদ্ধির পরিচয় নয়। কবিতার ভালো মন্দ বিচারে একাধিক মানদণ্ড ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যুগরুচি ও ব্যক্তিরুচির প্রভাবও সেখানে স্মরণীয়। এ অবস্থায় আলোচ্য কবিদের রচনা আজকের দিনে আমাদের তেমন আকর্ষণ করে না বলেই তাঁদের কাব্যপ্রয়াসকে ব্যর্থ বলা যায় না।

অন্য দিকে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস শুধু সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নয়, স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব হিসেবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাংলা কাব্যধারার এক সন্ধিক্ষণের কবি বলতে পারি তাঁদের। রবীন্দ্রযুগে তাঁরা কবিতাচর্চা করেছেন বটে, কিন্তু রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করাই তাঁদের একমাত্র কবিকর্ম ছিল না। হয়তো স্বল্প বা সুচিন্তিত নয়, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শ এই কবিদেরও ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেম ও নিসর্গ প্রকৃতি ইতিহাস ও পুরাণ, স্বদেশ ও সমাজ, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস, অর্থাৎ রোমান্টিক কবিতার প্রচলিত বিষয়বস্তুই এঁদের কবিতার অবলম্বন। আর রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত ছন্দ ও কবিভাষার ব্যবহার না করেও কারো রেহাই নেই। ফলে যদি কখনো বিচ্ছিন্নভাবে এঁদের রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনির মতো শোনায় তার জন্য এঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সচেতনভাবেও এঁরা কখনও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন—বিশেষভাবে যাঁরা তাঁর নিকট-সান্নিধ্য পেয়েছেন, যেমন যতীন্দ্রমোহন ও সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু একটা বিরোধ ছিল, যাকে স্ববিরোধও বলতে পারি—মুখে ও লেখায়

বার বার রবীন্দ্র-প্রশস্তি রচনা, কিন্তু নিজস্বের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ। দৃষ্টান্ত হিসেবে কালিদাস রায়ের পরিণত বয়সের গ্রন্থ নিম্নোক্ত স্মরণ করতে পারি

> গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারি নি। তাঁর পদাঙ্ক পরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চলে গিয়েছেন কি না। তবে তিনি যে বলেছিলেন একতোড়াতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূরে এগিয়ে এসেছি মুখস্থ করে নয় জীবনের যাত্রার পথে। আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারো এমন কি কবিগুরুর রচনারীতির আমি জ্ঞাতসারে অনুসরণ করি না। জানি না রচনারীতির বৈশিষ্ট্য আমার কিছু আছে কি না।[১]

অবশ্য কেউ এমন কথা বলতে পারেন কালিদাস রায় জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে কবিগুরুর অনুসরণ করেছেন এবং অনুকারক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। কিন্তু কালিদাস রায়ের কাব্যজগৎকে কোনো অর্থেই রবীন্দ্রিক কাব্যজগৎ বলা যায় না, এবং যদি কালিদাসের কথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি তা হলে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-প্রশস্তিকেও সেইভাবেই গ্রহণ করতে হবে— 'তোমার কবিতা বাংলা মায়ের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা মেয়ের শ্রেষ্ঠ পটীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা। সেই ভালোবাসার উচ্ছ্বাসের ধারায় তোমার কাব্য কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'[২] 'ভালোবাসা মঙ্গলাগান' কথা বাদ দিলে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়লে 'বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ'র কথা মনে পড়ে না। অন্য দিকে কালিদাস, যতীন্দ্রমোহন সত্যেন্দ্রনাথ এমন কি করুণানিধানও তাঁদের জীবনের প্রধান অংশটি কাটিয়েছেন শহরে। তাঁদের কবিতাতেও, বিশেষত কালিদাসের কবিতায় শহরজীবনের কথা এসেছে বারবার। কাজেই 'পল্লী কবি' ছাপ মেরে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখাও অসমীচীন। আর সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও শহরজীবনের স্থান খুব বেশি নয়, আসলে গ্রাম ও শহর নয় এমনকি বর্ণনীয় বিষয়ও নয়— কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই বিচার্য। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই কবিদের সাদৃশ্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি তাঁদের সমবেত এবং কখনো স্বতন্ত্র কাব্যশৈলীও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের শেষ দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গমঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম 'সবিতা'র মতো করুণানিধানের প্রথম কাব্যগ্রন্থকেও স্বদেশপ্রেমের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে এ ধরনের স্বদেশপ্রেমের কবিতা সুলভ ছিল না। তরুণ করুণানিধানের

কণ্ঠে তখনই শোনা গেছে—

মরা নদী ভরে গেছে আজিকার বানে
কে তিষ্ঠিবে বলো এই দুর্নিবার টানে
থর থর করতলে ধরিয়াছি হাল,
তুলে দে মেঘের কোলে নির্ভয়ের পাল

কিছুটা অপ্রত্যাশিত মনে হলেও সন্ধিক্ষণকে তিনি তখনই প্রত্যক্ষ করেছেন—

আসিয়াছে দুঃসময়, বড় দুঃসময়—
স্তম্ভিত হইয়া আছে আসন্ন প্রলয়।

এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছেন—'আমরা সবাই মায়ের সন্তান'। 'বঙ্গমঙ্গলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে (১৩১২)। সেখানে নতুন কবিতা সংযোজনে ও পুরোনো কবিতার রূপান্তরে কবির স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাজেই কৃষ্ণকান্তিধ্বনিকে শুধু রূপমুগ্ধ স্বপ্ন পথিক বলে পরবর্তী বাংলা কাব্যান্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে অন্যায় হবে।

আধুনিক কালে আমরা কবির involvement বা commitment-এর কথা বলি। শতাব্দীর সূচনায় বাঙালি কবিরা সে দিক থেকে জাতীয় জীবন ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বিশেষ মতামত গোপনে ও প্রকাশ্যে বিরত ছিলেন না। স্বদেশ বা সমাজ চেতনার স্বরূপ নিয়ে অবশ্যই তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এই কবিদের আন্তরিকতা বা প্রত্যয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা লালপরী নীলপরীর কবি বলে জানলেও, তিনি কিন্তু কখনোই গণবিক্ষোভ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গ বা গান্ধিজির আহ্বান তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিচলিত করেছে, এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে অন্তত তিনি রবীন্দ্রানুসারী নন, সে কথা সকলকে মানতে হবে। লক্ষণীয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তসুলভ সাবধানী মনোভাব বা কলাকৈবল্যবাদী কাব্যসংস্কার অগ্রাহ্য করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের দিনে তিনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন—

যে খুসি টিট্‌কারি দিক
অন্তরে বুঝেছে ঠিক—
এ কেবল নহেক হুজুগ,
সন্ধিক্ষণ আজি বঙ্গে, এল নবযুগ।

তেমনি অসহযোগ-আন্দোলনের দিনেও তিনি বলতে পেরেছেন—

ওরে মূঢ় তুই আজকে কেবল ফিরিস নে ছল খুঁজে,
খুঁটিনাটি বোল করে কি বলেছে তাহারি উত্তোর বুঝে,
গোকুল শ্রেয় কি শ্রেয় খানাকুল—সে কলহ আজ রেখে
ভারত জুড়ে যে জীবন জোয়ার নে রে তুই তাই দেখে।

১৯১০ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের যে নতুন আইন ঘোষিত হল, তাতে যে-কোনো

রচনাই 'বিদ্রোহাত্মক ও আপত্তিকর' বলে নির্দেশ করা সম্ভব ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কতকগুলি কথক কবিতা লেখেন যার মন্মার্থ দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল না। 'কয়াধু' 'স্কন্ধযাত্রী' 'ভীষ্মজননী' 'অরুন্ধতী' 'গির্গিরকা' প্রভৃতি। এগুলি পড়বার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অনুরূপ কবিতা প্রতিবাদের কবিতা নজরুলের কথা মনে পড়ে। সে সময়ে এগুলি লেখা কম সাহসের কাজ ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেন "He was a fiery Nationalist, almost a revolutionary" তখন তা শুধু ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে নয়, কবিজীবন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সে যুগে চরমপন্থী দলের দিকেই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ব্যঙ্গকবিতা ও নব্য বঙ্গের সংবাদ সত্যেন্দ্র কাব্যধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়।

৩

রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তারের কথা মনে রেখেও স্বীকার করতে হয়, তাঁর কাব্য মূলত অন্তর্মুখী। রাজনৈতিক আন্দোলন কখনো উত্তেজিত করেনি, বা সামাজিক অন্যায় ও মিথ্যাচার তাঁকে পীড়িত করেনি, কবিতা লেখার সময় বহিরঙ্গের উত্তেজনা ও কলরব তিনি পরিহার করতে চাইতেন। কিন্তু নজরুলের কাব্যে এ দিক থেকে প্রি-ব্যাফেলাইট কবিদের মতো সমাজসচেতন, এমন কি বিশ্ব শতাব্দীর বিপ্লবীচিন্তাচেতনারও প্রকাশ ঘটে তাঁদের রচনায়। অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু মনে হয় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে গিয়ে, বিষয় ও বিষয়ীর সম্পর্ক অনেকটা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিদ্রা কবির লেখা কবিতা সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন দলের রচনা বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছে। অন্য ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালি কবিদের অনেক সময় মধ্যবিত্ত সংস্কার ও স্বার্থচালিত কবি বলে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালের কবিরা কি সকলেই মধ্যবিত্ত মানসিকতা পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন? অন্য দিকে বিষয়বস্তুর উন্নতি কোনো কবির প্রশংসা বা নিন্দা নিরর্থক, তাও জানি। তবু যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য না লেখার জন্য বিহারীলাল প্রশংসা পান, রবীন্দ্রকাব্যের বিষয়গত অভিনবত্বও এক সময়ে চমক সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের একেবারে প্রথমজীবনের কবিতায় রেকাব গাড়ির গাড়োয়ান বাদলরাম হালওয়াইর ধর্মঘটের অবতারণা, বাবাঙ্গনাকে স্বাগত জ্ঞাপন কিংবা 'সাম্য সাম্য' রচনা খুবই অসামান্য ঘটনা মনে করার কারণ আছে। ১৩১৩ সালে কিংবা তার আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন ভয় হারা
সাম্যের মহা সঙ্গীত সব গাহ মিলি নরনারী
মানি না গীর্জা, মঠ, মন্দির, কঙ্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর

পরবর্তী কালে নজরুল ইসলামের একাধিক কবিতায় যে সাম্যবাদী চিন্তা চেতনার প্রকাশ দেখা যায় তাকে তাই পূর্বপ্রস্তুতিহীন মনে করতে পারি না।

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার

সত্যেন্দ্রনাথের 'কুম্ভীরাদপি' কবিতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতায়—

শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাকি কোনো গ্লানি
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয় নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যে 'শুচি' প্রথম পুরুষ মতো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তার বহু দিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দেবতার স্থান' বা নাজরীনের স্বপ্ন। সত্যেন্দ্রনাথের 'শূদ্র' বা মেথর কবিতার কথাও আমাদের প্রসঙ্গত মনে পড়বে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের সমাজচেতনা তাঁদের আদর্শবাদের প্রকাশ হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুঁজে লাভ নেই। এক দিকে অত্যাচারিত মানুষের প্রতি সমবেদনা ও দুঃখী দুর্গতজনের প্রতি মমত্ব, অন্য দিকে অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের কবিতার প্রধান বিষয় ও অনুপ্রেরণা। ভক্তকবি কুমুদরঞ্জনও তাই লেখেন—

আকাশস্পর্শী স্পর্ধা যাদের যারা ঘোর ভজনাদী,
লুণ্ঠিত মনে কাম্যেরী স্বর্গে সেজে থাকে বসিয়াটী।
তাহাদের কেশ করিয়া আকর্ষণ,
জাগায় বক্ষে বিবেকের দংশন
যায় তাহাদের ধ্বংসের বীজ বপনযজ্ঞ সাধি

'কেয়াফুলে'র কবি যতীন্দ্রমোহনকে লিখতে হয়

শ্রমিকের ফাটছে শিরা ধনিকের বুটের ঘায়ে
ধনিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ ছায়ে,
কে খাটে, কেই বা খাটায়? কে বা কাল খেলায় কাটায়।
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে

এবং মনে রাখতে হবে এই কবিতাগুলি এঁদের রচনাধারায় কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই ধারাই পরবর্তী কালে যথার্থ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় পরিশোধিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম দিয়েছে।

৪

রবীন্দ্রযুগের কবিদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ভগবদ্ভক্তির প্রাবল্য তাঁদের রচনাকে সুদূরতা দিয়েছে ভগবৎবিশ্বাস থেকেই তাঁদের রচনায় এসেছে এক ধরনের প্রত্যয় ও প্রসন্নতা অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও বিশেষত গীতাঞ্জলি পর্বের রচনায় ঈশ্বরাকুতি প্রবল সুতরাং রবীন্দ্রযুগের কবিরা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছেন কিন্তু প্রথমেই মনে রাখা ভালো উক্তিকে এক কবিরা রবীন্দ্রযুগের সব কবির সমান আগ্রহ ছিল না সত্যেন্দ্রনাথ বালকবয়সে নিজেকে না কি 'নাস্তিক' বলতেন, অবশ্য যথার্থ নাস্তিকতার পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথ বা এঁর সমকালের কবিদের রচনায় কোথাও পাওয়া যায় না। তবে সত্যেন্দ্রনাথের সহজাধিক কবিতার মধ্যে ভক্তিমূলক কবিতার সংখ্যা সত্যই কম বলে এক ধরনের সংশয়বাদের সাক্ষাৎ মেলে সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রমোহনের কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন—

গ্রহণ দিনের গহন ছায়ায় গাহন করি'
গগনে উঠিছে শঙ্খের সুর ভবন ভরি'
বাহির পরাণে হিরণ কিরণ হইল সারা,
হায় হায় করে সন্তানে পিয়াসী [illegible]

যে দিকে তাকাই কেবলই যে ছাই পড়িছে ঝরি
ক্লান্ত পরান দিনমান শুধু ভাবিয়া মরি
'কি হবে গো' [illegible] কারে সুধাইব হায় কাই [illegible] ভাবি
মধ্য সাগরে ছিন্ন তরণী যায় যে নাবি

স্থির নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে আসিছে ঘিরে
নিশ্বাস ভরি' দৃষ্টি আবরি ঘন তিমিরে
কোথা সাদা পাল? কই তরী তব? হে কাণ্ডারী
লোনা জলে এ কি মিছে মিলে গেল নয়ন বারি (সংশয়)

এখানে 'কাণ্ডারী'র উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাকে ঠিক 'বহির্দ্বিক' মনে হয় না। বরং 'ভব কাণ্ডারী' সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণারই সমর্থন মেলে

কিন্তু করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস নিঃসন্দেহে ভক্তকবি। তাঁদের কাব্যভাণ্ডারের একটা বড় অংশের প্রধান অবলম্বন ভগবদ্ভক্তি। বিশেষত শেষ জীবনে করুণানিধান যেমন 'গীতায়ন' 'গীতাঞ্জলি' রচনা করেছেন তেমনি অন্য কবিরাও হরিনামসংকীর্তনে আগ্রহী হয়েছেন। কালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন সে কথা তাঁদের তিনজন সম্বন্ধেই সত্য —"এই যুগের বিচারে কুমুদরঞ্জনের একটি অপরাধ তিনি ভক্ত কবি ভক্তি বস্তুটি এ যুগে উপহাস্য।" তারপর তিনি ভক্তিমূলক

কবিতার সমর্থনে অনেক বাক্যব্যয় করেছেন। কিন্তু তবু কবে তো কবিতা ভালো লাগানো যায় না। এসব কবিতা আধুনিক পাঠকের ভালো না লাগার কারণ 'ভক্তি'র আতিশয্য নয়। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান বা গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতা আজও 'উপন্যাসী' নয়। ভালো না লাগার কারণ স্বতন্ত্র কিন্তু এখানেই রবীন্দ্র-প্রভাবের প্রসঙ্গটি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রযুগের কবিতায় ঈশ্বরভক্তির যে সুর প্রধান পেয়েছে তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'পাড়ে পাওয়া ধন নয়'। ভক্তিমূলক কবিতার ঐতিহ্য বাংলা দেশে সুপ্রাচীন। কালিদাস রায়ের 'নন্দবিদায়' কিংবা 'পদরেণু ন গচ্ছামি' এক সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার কারণ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রানুসরণ নয়। এই সময়ের কবিরা স্বতন্ত্র একটি ভাবাদর্শ ও কাব্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন বলেই তাঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই আদর্শ আজ আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু স্বীকার করতে হয়, বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে তার যোগ সুনিবিড়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত সংগীত, কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, করুণানিধান, কালিদাস, কুমুদরঞ্জনের কবিতার অন্যতম ভাবপ্রেরণা। কুমুদরঞ্জন তাঁর কবিজীবনের ইতিহাস বর্ণনাকালে জানিয়েছেন—

> আমি পাঠ্যপুস্তকের কবিতা ভালো বুঝিনি (বালক বয়সে) আর কোন কবিতার খবরই জানিতাম না। পল্লীগ্রামে যাত্রা, কবিগান, ফকিরদের গীত ও বাউলদের গানই আমার প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে যেদিন পরিচয় হয়, তার আগে বৈষ্ণব কবিদের কবিতা পড়িতাম, চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত। কীর্তনগান প্রথম যেদিন শুনি, আমার মনে হইল ভগবান ঠিক এই সুরেই বাঁশি বাজাইতেন। তাহারি কিছু মধুরতা কীর্তনগান আত্মসাৎ করিয়াছে। আমি ভক্তমাল, চৈতন্যচরিতামৃত, পদকল্পতরু, ভক্তির সহিত পড়ি ও অত্যন্ত ভালবাসি। মাঝখানে বাউলের পাঁচালী ভাল লাগে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ ও ঈশানী পড়ি—ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায় এই ধারণা আমার বাল্যাবধি ছিল, রামকৃষ্ণের কথায় সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। একটা বড় অভয়ের বাণী, আশার আলো, আশ্বাসের কথা সেখানে পাইয়াছি।

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব নিয়ে গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয় সত্য। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাদৃশ্য' বাহ্য। অন্তস্তরে তিনি বৈষ্ণব অসদৃশ 'রবীন্দ্রনাথ'। বৈষ্ণব মাধুর্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী এবং এই সৌন্দর্যবাদ আবার ঐশ্বর্যবাদে সমাহিত। তাঁহার ভগবান রসের নহে, ভাবের।'' রবীন্দ্রনাথ তাই 'বৈষ্ণব কবির গাথা প্রেম-উপহার' এ যে তাৎপর্য পৌঁছেন তা করুণানিধানের 'বৈষ্ণব কবি'র কল্পনার সঙ্গে মেলে না—

> রাধা হয়ে বিরহের শাঙন্ রজনী
> জাগিয়াছ একাকিনী পল গণি, গণি',
> ফিরিয়াছ কেঁদে কেঁদে যমুনার কূলে
> না হেরি' তমাল-শ্যাম তমালেরি মূলে।

কুমুদরঞ্জন শুধু মুখেই বলেন না, 'বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় আমি সব রসই পাইয়াছি।

ভগবান 'রসো বৈ সঃ' এটা যেন জানিয়ে দিয়েছি।' তাঁর কবিতাতেও সেই রসের সাধনাই প্রকাশ পেয়েছে—

> মোদের হরি বংশীধারী মোদের হরি মাখনচোরা
> যুগল রূপের উপাসনা যে বিলাসী সে রসের মোরা
> স্মরণে তাঁর পরশ মধু, নামে করে পীযূষধারা
> মুগ্ধ মোদের মানস বধূ পেয়ে তাঁহার পীতের সাড়া
> কোথায় কুরুক্ষেত্র কোথা পাঞ্চজন্য কোথায় রাজ
> গাণ্ডীবে ভীম টংকারেছে মারে মারে সৈন্য সাজ
> আমরা তাহার ধার ধারি না বুঝি কোথা তমাল ছায়,
> নিশ্বেছ বাঁশি কদমতলা কল্পতরু শ্যামের পায়

স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনাকে বাস্তবিক করিয়া গ্রহণ করেন নি রবীন্দ্রনাথ বলবেন যে ভক্তি তোমার সাথে 'দেখা নাহি মানে, মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে ভাবোন্মাদমত্ততায়' সেই জ্ঞানহারা উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল যেন ভক্তিমদধারা নাহি চাহি নাথ।' কিন্তু করুণানিধান কুমুদরঞ্জন কবিদাস সেই 'ভাবোন্মাদমত্ততা' একান্ত কাম্য বিবেচনা করেছেন, তাঁরা বলেন—

> নারি আনন্দ প্রকাশ করিতে নিজে
> মুখে মোদের জ্যোতি নয়ন উঠে ম ভিজে
> শিহরে পুলক রোমাঞ্চ কলেবর।'

৫

আসলে নিসর্গপ্রকৃতি বা মানবীয় প্রেম, ভগবদ্ভক্তি বা সমাজমনস্কতা যেমন কোনো বিশেষ দেশকালের সম্পত্তি নয় তেমনি কোনো বিশেষ ব্যক্তির উত্তরাধিকারও নয়। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল কিন্তু একমাত্র প্রকাশশৈলীর ক্ষেত্রে তাঁদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব নির্দেশ করা সম্ভব। সেখানেও সে প্রভাব সর্বাঙ্গীণ বা সচেতন বলা যায় না। মধ্যযুগীয় এবং উনিশ শতকীয় বাংলা কাব্যের ভাষা ছন্দের প্রতিও তাঁদের সমধিক আকর্ষণ ছিল। কোনো দেশের কোনো কাব্যধারাই পূর্বতন কাব্য-ঐতিহ্য অস্বীকার করে অগ্রসর হয় না। অন্য দিকে এর মধ্যে 'খাঁটি বাঙালিয়ানা'র উত্তেজনাও কাজ করেছিল।

রবীন্দ্রযুগের কবিরা কখনো সচেষ্টভাবে রবীন্দ্র কবি ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করলেও তাঁদের রচনার একটা বড় অংশ লোকায়ত-ঐতিহ্য-পুষ্ট। তাই এঁদের রচনায় ছন্দের শিথিলতা বা ভাষার গ্রাম্যতা অনেক সময়ে একালের পাঠককে আহত করে। বুদ্ধদেব বসুর মতো কেউ এই কারণেই এঁদের 'স্বভাবকবি' আখ্যা দিয়ে অপাংক্তেয় জ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং মন্তব্য করেন : "তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ, শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে আর

তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করলেন তাঁরা।" বলা বাহুল্য এই ধরনের সরলীকরণ রবীন্দ্রযুগের কবিপ্রকৃতিকে বুঝতে আদৌ সহায়তা করে না, আর সত্যেন্দ্রনাথ বা যতীন্দ্রমোহনের মতো কবি সম্বন্ধে কথাগুলি আদৌ প্রযোজ্যও নয়।

সাহিত্যে সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা বেশি দামি না চাতুর্য এবং কৃত্রিমতা বেশি জরুরি—এ নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা আপাতত অবান্তর। আধুনিক কবিতা অবশ্যই সরলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রথম দিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, এবং তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। কিন্তু কবিতা যদি কাগজের ফুল না হয়, তা হলে তাকে মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করতে হবে। এ দিক থেকে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে রবীন্দ্রযুগের কবিতার বিচ্ছেদ ঘটেনি। চলতি অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ ও দেশজসংস্কার নির্ভরতা এ ব্যাপারে কবিদের সহায়তা করেছিল। কবিভাষাও সেখানে খুব সহজেই মুখের ভাষার কাছাকাছি আসতে পেরেছে। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তৈরি করা কবিভাষার তুলনায় তাকে সাধারণের নামান্তর মনে হলেও কাব্যবিচারের সাথে বলা যায় না। কুমুদরঞ্জন তাই সহজে লেখেন "দুঃখেরই আলোটুকু খুব বাজিয়ে যাব গানখানি / অকূলের কোন কূলেতে কবারো দিয়ে পাড়ি দিব। কিংবা শুধু গুনগুনানি উনুনানি আর ছিল না কাজ রে।" এ গান অবশ্যই সে কালের বাজসভা বা এ কালের কফি হাউসের জন্য লেখা নয়। "দীনপল্লির মেয়ো গান তোমার কে শুনিবে রাজসভাতে?" কিন্তু হাট মাঠ কাটের ভাষা আধুনিক কবিকেও অন্য ভাবে আকর্ষণ করে।

যতীন্দ্রমোহন বা সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক পল্লি কবি না হলেও লোকায়ত কাব্যসংস্কার রক্ষা করেছেন, বিশেষত বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌বিধির ব্যবহারে। প্রত্যেক ভাষা যেমন অনুবাদ অনুকরণের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি দেশজ শব্দভাণ্ডার ও প্রয়োগবিধিকে রক্ষা ও পরিপুষ্ট করে। এখানেও কবির শিল্পবোধ কাজ করে, কারণ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করা কবিরই কাজ। যতীন্দ্রমোহন কেবল বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য জেলের ছেলে, জেলের মেয়ে, চাষার মেয়ে, মালোর মেয়ে, অন্ধ বধূ বা কাজলাদিদিকে নিয়ে কবিতা লেখেন না। নিজস্ব কবিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনেই এখানে পল্লি ঘেঁষা বিষয় কবিতায় ব্যবহৃত হয়। "পালের তলায় নলম ঠেকাস কি? / আস্ত একটু চল্ না, ঠাকুরঝি—ও মা, এ যে ঝরা বকুল! নয়?" কিংবা "ধানখেতের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই / মা গো, আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই?"—এমন ভাষা ও ভঙ্গি কারো অনুকরণ নয়, অথচ এর অভিনবত্ব চট করে ধরাও যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ পণ্ডিত কবি, এই খ্যাতি তথ্যভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও, লক্ষণীয় বাংলা ভাষার দেশজ শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌বিধির ব্যবহারেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি লোকায়ত কাব্য ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমান সচেতন ছিলেন। ফলে পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যথার্থ বিচ্ছেদ ঘটে নি, বরং পুরোনো কাব্যধারার সঙ্গে যোগেই তা নতুন তাৎপর্য লাভে সক্ষম হয়েছে। শুধু ভাষা ব্যবহারে নয়, লাচাড়ি ছন্দের আধুনিক রূপান্তরেও তাঁর সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। 'বাউলের সুরে' তিনি কখনো

লেখেন — কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা— / ফিঙে গাছে গাছে নাচে?" কিংবা 'পাল্কীর গানে' খুব সহজেই ব্যবহার করেন 'আদুল গায়ে উড়ছে কতক ভনভনিয়ে' 'গরুর বাথান গোয়ালখানা', 'মটকা থেকে', 'মাদুর থেকে' মাথায় পুটে 'দিচ্ছে চালে পোয়ালপুছি' 'ফ্রানসো ভাতে'র মতো শব্দ 'কাব্যের অধিকার বাড়াবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেক দিন সেই কাল ছন্দে 'পুনশ্চ' লেখার কাল পর্যন্ত। কিন্তু তার অনেক দিন আগেই পল্লীজীবনে আমরা মহাকবি, হাটুরে, বাসন মাজা বউটী দোকান ঘরের গুরুমশাই, লাঙ্গোল-হাতে সর্কার ঘাড়ে ডাকপেয়াদার সাক্ষাৎ পেয়েছি রবীন্দ্রনাথ এখানে অদ্ভুত উত্তরণ ঘটান রবীন্দ্রযুগের কবিরা সচেতনভাবেই মুখের ভাষা ও কবিতার ভাষাকে মেলাতে চেয়েছেন এবং আধুনিক কবিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের অনুসরণ করেছেন

৬

রবীন্দ্রযুগের প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য আলাদা ভাবে দৃষ্টান্তসহ দেখাবার অবকাশ এখানে নেই কিন্তু আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটুকু অন্তত স্পষ্ট হয়েছে, শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের প্রধান পাঁচজন কবি একটি স্বতন্ত্র কালাদর্শের সন্ধান করেছেন, যেখানে লোকায়ত সংস্কার এবং রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলন ঘটেছে ছিল রবীন্দ্রপ্রভাবও কমবেশি কাজ করেছে, কিন্তু সেটাই এ যুগের কবিদের বা কাব্যধারার প্রধান পরিচয় নয়। বরং বলা যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে এঁদের অবস্থান এক ধরনের 'চিত্ত দ্বিধায়' এবং সীমাবদ্ধ — সে জন্য এঁদের সাফল্য প্রশ্নাতীত না হলেও, প্রাচীনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য এবং এই দিক থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সন্ধিক্ষণের কবিরা বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারেন

অনুধাবনীয় আলো অনুধাবনীয় অন্ধকারে
প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোনো কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলে, সেই সব কবিতা নিয়ে শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান শুরু হলে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তা নিয়ে পরীক্ষার উত্তর লিখতে আরম্ভ করলে সেই কবি ও কবিতার অপমৃত্যু হয় বলে অনেকে মনে করেন। পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা নির্ভর কবিতা তথা সাহিত্য বিষয়ক চর্চার সীমাবদ্ধতা স্মরণে রেখেও তেমন সংশয়বাদীদের সবিনয়ে জানানো যেতে পারে যে অ্যাকাডেমিক অনুশীলনের বাইরে সবকিছুই অত্যন্ত মূল্যবান ও শিরোধার্য বমন মনে করাও বোধহয় অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘাজাত। বোধহয় এমনও বলা যেতে পারে যে ঈস্কিলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিডিসদের অবিস্মরণীয় নাটকগুলি যেভাবে সময়ের উজানে আমাদের কাছে বাহিত হয়ে এসেছে তার পেছনে অ্যাকাডেমিক আগ্রহ ও অনুশীলনের অবদান ছিলো অনস্বীকার্য।

একজন কবি বা লেখকের কোনো বিচার বা মূল্যায়ন তাঁর সময়কালে হতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছু বছর কেটে গেলে, সময়ের বেশ কিছুটা দূরত্ব তৈরী হলে তবে তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতার পর্যালোচনা হওয়া সম্ভব। এ-রকম একটি অভিমতও দীর্ঘদিন ধরে চালু। একজন কবি বা লেখককে তাঁর সম সময়ের পাঠকেরা পড়বেন ও বিচার করবেন এবং তাঁর উত্তর কালের পাঠকেরাও পড়বেন ও বিচার করবেন, সেটাইতো স্বাভাবিক। কোনো পাঠ বা মূল্যায়ন তো সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয় যে সময় দূরত্বের কল্পিত লক্ষ্মণ রেখা দিয়ে তার শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। সমকাল ও উত্তরকালে নানাভাবে পঠিত ও মূল্যায়িত হতে হতেই তো একজন কবি বা লেখক অমরত্বের দাবীদার হয়ে ওঠেন।

ঠিক এই জায়গা থেকেই আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনাটি শুরু করতে পারি। যে শক্তি-সুনীল-শঙ্খ-অমিতাভ অথবা আরো পূর্ববর্তী অরুণ মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়-নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীদের নিয়ে বিগত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে আলোড়ন হয়েছে ও হচ্ছে কবিসভায়, পত্র-পত্রিকায়, কফি হাউসের আড্ডায়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অ্যাকাডেমিক চর্চাকেন্দ্রে তাঁদের শ্রম ও সৃজনের বহু বিচিত্র অনুপুঙ্খগুলি নিয়ে আরো বেশী করে মনোনিবেশ করলে আমাদের লাভ না ক্ষতি? আলোচনার শুরুতে তাই 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেন?' জাতীয় প্রশ্নটিকে একটু ঘুরিয়ে নিতে পারি এইভাবে যে 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় নয় কেন?'

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে দুটি নাম ঘিরে পাঠক-সমালোচকদের প্রবল জিজ্ঞাসা ও তুমুল বিতর্ক আমাদের নতুন সহস্রাব্দের সূচনাবর্ষ পর্যন্ত তাড়িত করেছে তার একটি জীবনানন্দ দাশ হলে অন্যটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রথম জনের কবিতা বিষয়ে লক্ষ্য

করা যায়নি। যেখানে দ্বিতীয়জন ও তৃতীয়জনের বহু বিতর্কিত জীবনযাপন বৈশিষ্ট্য এবং অতিপ্রজ্ঞ সৃজনের আশ্চর্য কৃতকে জীবৎকালেই নিঃসন্দেহ। প্রথম জনের কবিতার আশ্রয়েই আমরা অনেকের মতো দ্বিতীয় জনের আত্মপ্রকাশ যদিও সেই আশ্রয়ের বাইরে স্বনির্ভর পদক্ষেপ ও স্বতন্ত্র কবিত্বশক্তিরও তিনি। তবে কথাটাই 'অতিজীবিত' রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বিস্তৃত উপত্যকায় দাঁড়ানো 'জীবনানন্দ' ও 'শক্তি' নামাঙ্কিত দুটি শিখর পাঠক সাধারণের আরোহণের অভ্যাসকে যার পর নাই জাগ্রত করে তোলে।

পর্বতারোহণের আগে প্রস্তুতিকে জেনে নিতে হয়, তবে শক্তির শিখর সম্পর্কে এখানেও আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ কয়েকটি দিকচিহ্ন সংগ্রহে নিয়ে অগ্রসর হতে পারি :—

১। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমস্ত ভাবেই আত্মভাবনা নির্ভর স্বগতকথনধর্মী স্বীকারোক্তিমূলক। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় এমন অকপট সরাসরিকতায় আর কোনো কবি তার কবিতার সব কবিতায় এভাবে আত্মভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্বের যন্ত্রণায় আবেগ সংবেগ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণায় [illegible] প্রেম যৌনতা মমত্ব উৎকেন্দ্রিকতা, সৃজন ও [illegible] শব্দ ও চিত্রকল্পের অনিবার্য কৃতকে অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

(২) তাঁর কবিতার এই [illegible] ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা আগ্রাসী আত্মপ্রকাশময় হলে কথা ভাবলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিগত শতকের পঞ্চাশ ও ষাট দশকের [illegible] ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বরাট [illegible] আবেগ [illegible] ও নির্লজ্জতা প্রাণ প্রকাশ করিয়া যে [illegible] নীরব, এদের মধ্যে [illegible] কবি [illegible] সঙ্গে শক্তি ও তার [illegible] সচেতনতার সঙ্গে [illegible] সব পর্যায়ভুক্ত।

(৩) কৃত্তিবাস পত্রিকা, [illegible] কলকাতায় আসা [illegible] আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি সূত্র ধরে শুরু করে আমরা ক্রমে শক্তির কবিতার পরিক্রমায় অগ্রসর হলে একটি একটি করে আবিষ্কার করতে পারি এক ধরনের [illegible] ভাষা ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ ও ভাষায় লিপিবদ্ধ মধ্যবিত্তের মন ও মনন [illegible] স্মৃতি [illegible] স্বেচ্ছাচারীর তুমুল খেয়াল [illegible] চলার এক আত্মগ্লানিযুক্ত প্রবণতা, জীবনের প্রতি আন্তরিক আসক্তি সত্ত্বেও বিসদৃশ, অনুজ্জ্বল সাদৃশ্যহীন, [illegible], বিপর্যয়কর যা কিছু তাকে উন্মোচিত করার এক নিষ্ঠুর প্রাণবন্ত কার্যক্রম। হয়তো এ সবেরই বীজ ও প্রবাচনা ছিলো জীবনানন্দের কবিতায়। তবু রাগ হিংসা নেশাগ্রস্ততা, যৌনাচার, কাপড় ইত্যাদি প্রসঙ্গ যেভাবে শক্তির কবিতায় এসেছে, সেভাবে ঝঙ্কারময় তৎসম শব্দের পাশাপাশি যথেচ্ছভাবে অশ্লিষ্ট ও গ্রাম্য শব্দ বসিয়ে শক্তি বাংলা কবিতার পাঠক সাধারণকে উদ্বেলিত করেছেন। তাই বলে জীবনানন্দ উত্তর কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম গোড়া পত্তনকারী বলে তাঁকে ভাবাটা অযৌক্তিক নয়।

(৪) কবিতাকে রাজনীতি, সমাজদর্শন, বৌদ্ধিক প্রচার ইত্যাদির প্রয়োজনে ব্যবহার করার বিরোধী ছিলেন শক্তি। কেবল শক্তিই নয়, সাধারণভাবেই 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' এর মতো পত্রিকাকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠা পঞ্চাশের কবিতায় তার পূর্ববর্তী দুটি দশকের উদ্দীপ্ত গণ-সংবেদিতা তথা সোচ্চার সমাজমনস্কতা থেকে অনেকটাই ব্যক্তিগত, আত্মমগ্ন, নির্মাণসচেতন শিল্পের দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা ছিলো। ১৯৬২ তে কবিতা বিষয়ক একটি গদ্যে শক্তি লিখেছেন — কবিতার কোনো বাস্তবিক উদ্দেশ্য নেই। কবিতা কবিগণের কাছে একপ্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার। কবিতা ঘোরতর অসামাজিক। অবশিষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজসেবা। কবিতা একমননের ব্যাকরণ যা কেবল অনিবার্যভাবে সাহিত্যের ভাষা শিক্ষা দেয়। — অবশ্যই ঐ বিশেষ সময়ের আবহে বলা এইসব কথায় কিছু ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জন আছে, আছে প্রচলিত বিশ্বাসকে আক্রমণ করবার যৌবনকালীন দ্রোহবাসনা। তবু উদ্দেশ্যমূলক বা [illegible] শিল্পের দায় থেকে সরে যাবার যে প্রস্তাবনা শক্তির ঐ ভাষ্যে ছিলো তাকে সবটাই ভঙ্গিপ্রধান খেয়ালিপনা বলে মনে করবারও কোনো কারণ নেই। এর বছর দশক বাদেই প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন শক্তির অন্যতম সহযাত্রী, পঞ্চাশের অন্যতম বিশিষ্ট কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'দেশ' পত্রিকার ১৯৭২ এর সাহিত্য সংখ্যায় — আমরাই বোধহয় কৃত্তিবাস ও শতভিষা কবিপত্রের লম্বাঁছাড়ার দল — শুরু করে দিয়েছিলাম অ-তাত্ত্বিক (Non-[illegible]) কবিতা লিখতে। এই প্রসঙ্গে আলোকরঞ্জন অন্যত্র আরো বলেছিলেন — এই কবিরাই (অর্থাৎ অ-তাত্ত্বিক কবিতার রচয়িতারা) আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম 'কবিতা বাংলে দেবে না মানে সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে' (আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ) এই ধারণার কাছাকাছি থেকেই কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন।'[১৩] তাঁদের কবিতা সম্পর্কে শক্তি, আলোকরঞ্জন প্রমুখ যা বলতে চেয়েছেন তার প্রাসঙ্গিক অভিমুখটি মোটের ওপরে ধরা গেলেও সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত বা প্রামাণিক নির্ণয় খুব সহজ নয়, কবিতার এই 'হয়ে উঠতে থাকা' কি প্রকৃতই দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ প্রভাব অগ্রাহ্য করে নিভৃত ও নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে? কবিতায় ভাষা ও আঙ্গিকে কি ধরা পড়ে না সব সময়ের বহুমাত্রিক দোলাচল ও আহতি? শক্তি যতই বলুন না কেন তাঁর কবিতা কেবল 'এক প্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার' অথবা 'ঘোরতর অসামাজিক'?

(৫) আলোকরঞ্জনের সঙ্গে একটি বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি যে কবি হিসেবে শক্তি ছিলেন এক 'স্বশিক্ষিত' বা [illegible]'[১৪] রচয়িতা। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের মতো কবিতা রচনাতেও যিনি নিয়ম-নীতি-অনুশাসন-শৃঙ্খলার নিগড়সীমা লঙ্ঘনে বেপরোয়া। জীবন ও মৃত্যু, আসক্তি ও বৈরাগ্য, নির্মাণ ও নৈরাজ্য ইত্যাকার পরস্পর প্রতিমুখী টানের মধ্য দিয়ে তাড়িত ও আলোড়িত হতে হতে যেন চকিত বিদ্যুৎ উদ্ভাসের মতো অনুভূতির রহস্যজটিল শব্দলিপি রচনা করে গেছেন। কবিতা তথা শিল্প-সাহিত্যে যাঁরা 'আধুনিকতাবাদী' তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই সচেতন, মগজ প্রধান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান ও অনুশীলনের একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যের মালার্মে বিলকে-

পাউণ্ড-এলিয়ট কিম্বা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী এমন কি জীবনানন্দ দাশেও এই সচেতন সন্ধান ও চর্চা আমাদের নজরে পড়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সম্ভবতঃ এই বৌদ্ধিক অনুশীলনের ঘরানার কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত বলে মনে হয়। রিলকে শক্তির অন্যতম প্রিয় কবি ছিলেন, বদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভেরলেন প্রমুখ ফরাসী কবিদের প্রসঙ্গ বিক্ষিপ্তভাবে শক্তির কবিতাতে এসেছে, পাশ্চাত্যের কবিদের রচনার সার্থক তর্জমাও করেছেন তিনি। তবু তাঁদের রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে কোনো লক্ষণীয় আত্মীয়তা শক্তির কবিতায় দেখি না। অলোকরঞ্জনের দেওয়া 'অটোডিডাকট' অভিধাটি সে-কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'নিজের রক্তার্জিত অনুশীলনের স্বরলিপিই ছিল শিক্ষানবীশের সমীপে তাঁর শিক্ষকতার ভিত্তি'।[৫]

(৬) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু এবং তাঁর কবিতার সম্পাদক ও সংগ্রাহক সমীর সেনগুপ্ত মত প্রকাশ করেছেন যে 'বিষয়হীনতা' শক্তির কবিতার 'প্রথম ও প্রধান লক্ষণ', বলেছেন, 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে। তাঁর কবিতার কোনো সারমর্ম করা যায় না, তাঁর সব কবিতাই যেন পার্থিব ও অপার্থিবের সীমারেখার ওপর রচিত'।[৬] এমন মন্তব্য আবারও সেই ম্যাকলিশের কবিতার 'হয়ে উঠতে থাকা'-র দিকে ইশারা, এবং এ সব কথার মধ্যে অবশ্যই কবিতা বিষয়ক কিছু মৌল ও অনতিক্রম্য সত্য আছে। প্রকৃতই কি কোনো সার্থক কবিতার সারমর্ম করা যায়? প্রকৃত কবিতা কি সর্বদাই তার বাহ্য বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে যেতে চায় না? দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আড়াই হাজারেরও বেশি কবিতায় শক্তি লিখেছেন নানা বিষয় নিয়ে। প্রেম, নারী, যৌনতা, প্রকৃতি, পর্যটন, জীবন, মৃত্যু, ঈশ্বর, মানুষ ইত্যাদি কত না বিচিত্র বিষয় ও প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তবু যদি বলি যে বিষয়হীনতা তাঁর কবিতার প্রধান লক্ষণ, সেক্ষেত্রে 'বিষয়হীনতা'ই হয়ে দাঁড়াবে বিষয়। আর তাছাড়া কবিতার ক্ষেত্রে ঐ 'হয়ে উঠতে থাকা'র সঙ্গে বিষয়ের যোগ আছে।

এতক্ষণে মনে হয় আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামক শিখরটি আরোহণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি সেই বেস ক্যাম্পে যেখান থেকে মূল যাত্রার রুট ম্যাপটি আমাদের নাগালে এসেছে। আমরা আরোহণ করতে চাইছি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশের কবিতার 'হয়ে উঠতে থাকা'র সূত্রটি অনুসরণ করে। ১৯২৬-এ তাঁর *Ars Poetica* শীর্ষক রচনার একটি কবিতার শেষ দুটি ছত্রে ম্যাকলিশ বলেছিলেন— *A poem should not mean/But be*। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ থেকে আমরা কবিতার হয়ে ওঠার রহস্যটি বোঝার চেষ্টা করবো। কিভাবে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের প্রসঙ্গ-নির্দেশিত ভাষা বা *referential language* থেকে কবি নানা ভাবে সরে যেতে চান আবেগ-অনুভব মনন নির্ভর এক সৃজনশীলতার দিকে—এক *creative* ও *performative language*-এর দিকে, যেখানে কী বলা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে বলা হচ্ছে। অথবা কিভাবে বলা হচ্ছে কেবলমাত্র তারই স্তরে স্তরান্তরে লুকিয়ে আছে কী বলা হচ্ছে তার সমস্ত সম্ভাবনা ও

বিকল্প। শব্দ, শব্দার্থ পদান্বয় ইত্যাদির নানা বিচ্যুতি, শব্দের দ্বারা শব্দের অতিনির্ণয় চিত্রকল্প ও প্রতীকের বহু বিচিত্র কুহকমায়া, ছন্দ অলংকার ইত্যাদি মিলে কবিতার ভাষা কিভাবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু নির্বাচিত কবিতা থেকে আমরা তার একটা ধারণা পেতে পারি। শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র পূর্বে উল্লেখিত একটি মন্তব্য 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে' শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষার এই অনুসন্ধানে আমাদের যাত্রারম্ভের সংকেত বলে বিবেচিত হতে পারে। অথবা আমরা ম্যাকলিশের মতো করে বলা সুজান লাঙ্গার এর একটি মন্তব্যকেও এ প্রসঙ্গে সবুজ আলো বলে ধরে নিতে পারি— *'Through the material of poetry, verbal or unpaid is not the literal assertion made in the world, but the manner in which the assertion is made'.*[৭]

এই আলোচনায় প্রথমে বেছে নিচ্ছি শক্তির জনপ্রিয়তম কবিতাগুলির একটি, 'আনন্দ-ভৈরবী'। এক গভীর, আত্মময় বিষাদময় স্মৃতিমেদুর প্রেমের কবিতা। ছয় মাত্রার কলাবৃত্তে লেখা কুড়ি পংক্তির এই কবিতা পাঁচটি স্তবকে সমবিভক্ত। প্রথম স্তবকের চারটি ছত্র কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ফিরে এসেছে পঞ্চম স্তবক রূপে। প্রতিটি স্তবকের প্রথমে তিনটি পংক্তি সমদৈর্ঘ্যযুক্ত দুটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্বের সঙ্গে একটি দুই মাত্রার অপূর্ণ পর্ব তিনটি পংক্তির শেষে এই অপূর্ণতা আর তার পরেই চতুর্থ হ্রস্ব পংক্তিটি মিলে যেন কবিতার গতিক্রমে আবেগাত হৃদয়বেদনার ছোঁয়াটি লাগিয়ে দিতে চান কবি। ছন্দকে এভাবেই কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে একাত্ম করে কবিতার হয়ে উঠতে থাকা কে নিড় ন করে দিয়েছেন শক্তি।

কবিতাটি, অনুমান করা যায় কোনো এক বিরহী প্রেমিকের স্বগতকথনের ঢংয়ে লেখা এবং তার স্মৃতিবাহিত বিমর্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ধরণের আত্ম নমনীয়তা কবিতার ভাষার আবহটি চিহ্নিত করেছে। প্রথম ছত্রে লক্ষ্য করুন এলায়ে পড়েছে। তৃতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তিতে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার সেকি জানিত না এমনি দুঃসময়। ' এবং তার পরের পংক্তিতেই চলিত রীতির ক্রিয়া 'লাফ মেরে ধরে '. এভাবে সাধু চলিতের মিশ্রণে যে শুরুচণ্ডালী তা শক্তি জীবনানন্দের অনুসরণে ব্যবহার করেছেন তাঁর বহু কবিতায়, বিশেষতঃ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে।

তৃতীয় চতুর্থ স্তবকে দুই দুই চার বার এসেছে জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যাংশ 'সে কি জানিত না'। কবিতার প্রেমিকের হৃদয়বেদনা এই বাক্যাংশে অনুযোগ হয়ে বেজেছে। একটি পংক্তি বা তার অংশকে একাধিকবার ব্যবহার করে লিরিক ধ্বনি তৈরি করা শক্তির কাব্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানা ধরণের পুনরুক্তি দিয়ে কবিতার ভাষায় যে সম্ভ্রান্তবালতা সৃষ্টি করা যায় সে ব্যাপারে শক্তি ছিলেন নিপুণ কারিগর। আমরা যারা 'আনন্দ ভৈরবী' মন দিয়ে পড়েছি বা শুনেছি শক্তির গলায় তারা আরো জানি যে দুটি স্তবকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'সে কি জানিত না' স্বরগ্রামের উত্থান ও পতনে কিভাবে কবিতার প্রেমিক পুরুষটির হৃদয়ের বিরহ বিষাদের লেখচিত্রের ইঙ্গিত দেয়।

বিশেষ লক্ষণীয় কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শব্দ ও শব্দানুষঙ্গ—'গোঠ', 'রাখাল ছেলে', 'মোহন-বাঁশি' ও 'বটের মূল', সব মিলিয়ে যেন একটি প্রাচীন, পুরাণ প্রতিম, প্যাস্টোরাল আবহ। সেই দূরবর্তী রাখালিয়া আবহ থেকে ঠিক পরের স্তবকেই কবি আমাদের নিয়ে আসেন সব-সময়ের অস্থিরতা ও বিপন্নতার দশা চিত্রকল্পে—'সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়/ লক্ষ মেঘ ধরে মোরাদের লাল ঝুঁটি'। অতীত ও বর্তমান, 'হৃদয়পুর' ও 'রাজধানী' অনাধুনিক ও আধুনিক, এইসব বিপ্রতীপতার বিরোধের সঙ্গে ওতোপ্রোতো হয়ে যায় ভাষার গুরুচণ্ডালী। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে 'সে কি জানিত না' দিয়ে পরপর চারটি প্রশ্ন কিন্তু কোথাও কোনো প্রশ্নচিহ্ন নেই। চতুর্থ প্রশ্নটি বিশেষভাবে আমাদের কাব্যভাষা বিষয়ক আলোচ্য প্রসঙ্গটিকে তীব্রভাবে উসকে দেয়—

'সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি আনখ সমুদ্দুর'। গোটা কবিতায় শক্তি কেবলমাত্র দুটি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি স্বল্প বিরতি সূচক 'কমা' উদ্ধৃত অংশে 'সে কি জানিত না'র পরে এবং একটি পূর্ণচ্ছেদ কবিতার শেষে। পর পর তিনবার প্রশ্নচিহ্নবর্জিত জিজ্ঞাসার পর চতুর্থবারে এই স্বল্প বিরতি যেন এই স্বগত জিজ্ঞাসাকে কিছু স্বাতন্ত্র্য দিচ্ছে এবং এও লক্ষণীয় যে এখানেই কবিতার প্রেমিক চরিত্রটি প্রথম ও শেষবার উত্তম পুরুষের সর্বনাম 'আমি' ব্যবহার করেছে। 'আমি তারে যত জানি' 'খোঁজা করুন তারে' 'তাকে নয়। এখানে 'বলবা' ইত্যাদি কিছুটা কোমল ও পদাগন্ধী শব্দের সঙ্গে 'তারে' এই সর্বনাম যেন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় শব্দ নির্বাচন, নির্মাণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক সহজাত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন শক্তি। 'আনখ সমুদ্দুর' শব্দটির ব্যবহার সেই জাদু ক্ষমতার একটি নিদর্শন। 'আনখ সমুদ্দুর' অর্থাৎ নখ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত 'আপাদমস্তক', 'আসমুদ্রহিমাচল' ইত্যাদির মতোই যেন 'আনখ সমুদ্দুর'। কিন্তু এখানে তার প্রিয় নারী সম্পর্কে প্রেমিক পুরুষটি যখন বলেন, 'সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি/ আনখ সমুদ্দুর' তখন শব্দটি ঠিক কী অর্থ বহন করে? স্তবক শেষের দুই পংক্তির জায়গায় বসে শব্দটি যেন কোনও দুরাচারী ভুলকলমের মতো পাঠককে হাতছানি দেয়। তখন আমরা বুঝতে পারি 'কোথাও আমরা আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারি না কবিকে', এ মন্তব্যের সারবত্তা।

'উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল, আনন্দ ভৈরবী' কবিতার শিরোনাম রূপে ব্যবহৃত কী এই 'আনন্দ ভৈরবী'র দুটি শব্দের হাইফেন-চিহ্নিত যৌগ যা হতে পারে আনন্দের রাগিনীবিশেষ, কিংবা দশমহাবিদ্যের অন্যতম রূপের আদলে কল্পিত এক নারীমূর্তি, কিংবা শেষ-আষাঢ়ের 'বরষা পীড়িত' এক ফুলেরই নাম। এইসব বিকল্পের মধ্য দিয়েই কবিতার অন্তরঙ্গ গড়ে উঠতে থাকে বাহ্যনার্থের নানা চোরা স্রোত ধরে। কিছুতেই কোনো সারমর্ম বা সরলার্থের দিকে যাওয়া যায় না।

এখান থেকেই আমরা চলে যেতে পারি শক্তির আর একটি বহুপঠিত ও বহুশ্রুত কবিতায়—'অবনী বাড়ি আছো?' আবারও একটি জিজ্ঞাসা, যদিও পূর্ববর্তী কবিতার তুলনায় এখানে জিজ্ঞাসা অনেক বেশি জোরদার। তিনটি অসম স্তবকের এই কবিতায়

প্রতি স্তবকের শেষে ধ্রুবপদের মতো বেজেছে এই প্রশ্নটি। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে পাই যে হিজলিতে দীর্ঘ তিন মাস অবস্থান কালে কবিতাটি রচিত হয়েছিলো মাত্র পাঁচ মিনিট সময়ে এক ঘোর-লাগা অবস্থায়।' এ কবিতায় শব্দ নির্বাচন ও যোজনার মধ্য দিয়ে আত্মসংকট, স্বপ্নময়তা ও নাটকীয়তার টানাপোড়েনে যে ভাবমণ্ডলটি আভাসিত হচ্ছে তাতে শব্দার্থ ও যুক্তিপরম্পরার কোনো সুনিশ্চিত বোধগম্যতা পাওয়া কঠিন। অবনী নামধারী কোনো ব্যক্তিবিশেষ ও তার রুদ্ধদ্বার গৃহের বাইরে সন্ধানী কণ্ঠস্বর এসবের কোনো তথ্যগত ভিত্তি এ কবিতার প্রকৃত ভরকেন্দ্র নয়। বরং শাব্দিক তথ্য ক্রমেই অবান্তর হয়ে যায় 'চিহ্নায়ক' বা 'Signifier' সমূহের নভশ্চারিক গ্রন্থনার গূঢ় রহস্যে। নিশুত রাতে ঘুমিয়ে থাকা নিরাপত্তা-নির্ভর জনবসতির ছবি অবিরাম কড়া নাড়ার শব্দ এবং অবনীকে খুঁজে ফেরা অনুসন্ধানকারী, খানিক রহস্য-গল্পের মতো এটুকু কাহিনীসূত্র কবিতাটির আকর বলে মনে হয় না। এক অবচেতন আত্মনাট্যের যেন এগুলি ন্যূনতম তথ্যসূত্র। এইসব তথ্যচিহ্নের আড়ালে থাকে এক গভীরতর মানবিক সংকেত, এক অনিকেত সত্তার আর্ত আশ্রয় সন্ধান; বিশেষতঃ 'অবনী' নামবাচক বিশেষ্যটি যখন 'পৃথিবী' বা 'ধরণীর' অর্থ বহন করে। কবিতার ভাষাবয়নে 'চিহ্নায়ক' ও 'চিহ্নায়িত' (Signified)-এর সেতুবন্ধ এবং তার বার্তাটি পাওয়ার জন্য চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার রহস্য উন্মোচন —'অবনী বাড়ি আছো?'র মতো কবিতা পাঠককে সেই সৃজনশীল পাঠ ও অনুভবের দিকে প্রবোচিত করে।

এবার আমরা কবিতাটির 'হয়ে উঠতে থাকা'র দিকে তাকাই। 'দুয়ে এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া' নিদ্রামগ্ন জনবসতির একটি ছবি। শক্তি লিখলেন 'দুয়ার', 'দরজা', 'দ্বার', 'কপাট' ইত্যাদি নয়, 'দুয়ার' যা বিকল্পগুলির তুলনায় কিছুটা কাব্যিক ও ধ্বনিময়। 'আটকে' বা 'বন্ধ করে' না লিখে লিখলেন 'এঁটে', যা দৈনন্দিন ব্যবহারের গার্হস্থ্যময়তাযুক্ত শব্দ, বেশ আটপৌরে এবং প্রচলিতভাবে কাব্যিক নয়। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া'। দৃশ্য চিত্রকল্পের পর শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা। কিন্তু তাতে চিহ্নায়কের রহস্যময়তা লক্ষণীয়। 'রাতের কড়ানাড়া' মানে কি 'রাতই কড়া নাড়ছে, না রাত্রিকালীন কড়ানাড়া? অথবা এমনও কি হতে পারে না যে রাতের দরজাতেই কড়া নাড়ছে অচেনা আগন্তুক? আবারও সেই শব্দ বিন্যাসের গূঢ় তলে নিশ্চিত অর্থের সমস্যা।

প্রথম স্তবকে অবনীর প্রতি আর্ত, উচ্চকণ্ঠ প্রশ্ন ও কড়ানাড়ার শব্দ মিলে যেভাবে নিরাপদ নিশিনির্জনতাকে ভেঙে দেয়, তারই বিপরীত আবহ দ্বিতীয় স্তবকে, শান্ত, সজল, সবুজ প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ। 'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/ এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে/ পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস/দুয়ার চেপে ধরে —'। বারোমাস বৃষ্টি পড়ে, এ কোন চিরসজল দেশ? আকাশে সঞ্চরমান মেঘের দলকে কবি যখন 'গাভীর মতো চরে' এই উপমা দেন তখন সেই চিরসজল দেশের চিরমেঘমেদুর আকাশ যেন পরিণত হয় তৃণভূমিতে। এই উপমার পরেই যখন সবুজ নালিঘাসের গররাজি হয়ে দুয়ার চেপে ধরার ভঙ্গিটি সমাসোক্তির সার্থক প্রয়োগে মানবিকীকৃত হয়ে যায়, তখন শব্দার্থকে অতিক্রম করে

তথাকথিত চিত্রায়নের বয়নসূত্রটির আন্দাজ পাওয়া যায়। কাব্যভাষার আপাতগ্রাহ্যতার অন্তরালে এভাবেই পদ্যভাষার এক স্বতন্ত্র পরিসর উঁকি দিয়ে যেতে থাকে।

কবিতাটির শেষ স্তবকের প্রথম দুটি ছত্রে উচ্চারণ হয়ে ওঠে আরো বিষাদময়, জটিল ও আত্মঅনুভবময় — 'আমেকলীন হৃদয়ে দূরগামী ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি' এখানে 'আমেকলীন' কি 'হৃদয়' এর বিশেষণ? সেক্ষেত্রে তো দুয়ের মাঝে 'ড্যাশ' চিহ্নটি থাকার কথা নয়। 'দূরগামী' শব্দটি কি ব্যথার দূরে যাওয়া বোঝাচ্ছে? রুদ্ধদ্বার ঘরে 'আমেকলীন' সত্ত্বা এবং দূরে চলে যাওয়া ব্যথার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া এ সবের শাব্দিক ও তথ্যগত আরণের আড়ালে খেলা করে অবচেতন রহস্য আর সেই ঘুম আবার ভেঙে যায় 'রাতের কড়ানাড়ায়' তবে কেবল শুনি র পরিবর্তে এখন সহসা শুনি।

কবিতা ভাব দিয়ে হয় না হয় শব্দ দিয়ে। চিত্রকর দাশের প্রতি কবি মালার্মের এই কটাক্ষের কথা আমরা সবাই জানি তবু প্রশ্ন থাকে কবিতা লেখা হয় শব্দ দিয়ে বলতে ঠিক কী বোঝায়? গল্প উপন্যাস, দৈনন্দিন কাজের হরেক রকম গদ্য মুখের কথা ইত্যাদি সবই তো গড়ে ওঠে শব্দ দিয়ে। আর ছাড়া কোনো ভাষাতেই কেবলমাত্র কবিদের ব্যবহারের উপযোগী বা তাদের জন্য সংরক্ষিত কোনো শব্দভাণ্ডার নেই তবু কবিতায় শব্দেরা যেভাবে আসে ও যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে এক প্রায়-অনিবার্য সৃজনী শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত হয় শব্দের অভিধা-অর্থ অথবা ব্যাকরণের নিয়ম দিয়ে তাকে ধরা যায় না শাসন করা যায় না। নতুন শব্দেরা যেমন আসে তেমনি আবার পুরনো শব্দেরাও নতুন করে বেঁচে ওঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কার বা পরিমার্জনের খুব বেশি সুযোগ থাকে না শব্দার্থকে ছাপিয়ে ওঠে ব্যঞ্জনা বা অনুষঙ্গ, শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনায় তৈরি হয়ে উঠুক অর্থ চিত্রকল্পের অভিনবত্ব ও তীব্রতায় ছন্দের চমৎকারিত্ব ও কারুণ্যে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের বহুমাত্রিক বর্ণশিল্প কবিতার ভাষায় সঞ্চার করে এক রহস্যকুহক, ক্ষেত্রবিশেষে উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতির স্পষ্টতা থাকলেও মোটের ওপর বলা যায় যে কবিতার ভাষা যতখানি রহস্যসৃজনের ভাষা, ততখানি রহস্যমোচনের ভাষা নয়। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ইংরেজ লেখক জর্জ পুটেনহ্যাম তাঁর The Art of Language in Poetry গ্রন্থে কাব্যভাষার এই রহস্যময়তা ও গোপনীয়তার কথা বলতে গিয়ে এক ধরণের 'Ambiguity' এর কথা বলেছিলেন যা মূলতঃ শাব্দিক তথা আলংকারিক। অর্থাৎ আবারও আমরা কবিতায় কী বলা হচ্ছে তার চাইতে কিভাবে বলা হচ্ছে সে দিকেই অনুসন্ধানের নির্দেশ পাচ্ছি

কবির সত্যাগ্রহ ও শব্দাগ্রহ এক ও অভিন্ন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিন্নতার কিছু আন্দাজ পেতে আমরা কবি শঙ্খ ঘোষের একটি ভাষ্য দিয়ে শুরু করতে পারি— 'প্রকৃতি যেভাবে শুকনো ঘাসের কাছে যায়, কবিরা তেমনি শব্দের কাছে লিখেছিলেন একদিন এই কবি। সব কবিই সেভাবে শব্দের কাছে যান কিনা জানি না, কিন্তু শক্তি যেন প্রায় প্রকৃতির প্রাণ আর প্রাচুর্য নিয়ে ঝুঁকে পড়েন শব্দের দিকে, সজীব করে তোলেন তাঁর সমস্ত সংসার। এই প্রাচুর্য এমনই যে তার স্রোতের মধ্যে ঢুকে পড়লে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দিশাহারা লাগে কোনো পাঠকের। কিংবা অজস্র পাতা ঝড়ে পড়া সুঘ্রাণ বনের মধ্যে একলা

হেঁটে যাবার মতো অনুভব হয় তাঁর। কিভাবে শক্তি ঝুঁকে পড়েছিলেন শাকুন কাছে, কিভাবে ভরে তুলেছিলেন তাঁর কবিতার সংসার তার কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে :—

(১) যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল চোখ দুটি কিছু চুম্বন মতো কপাল করুণ তাকে তোর মায়ের হাতে তুলে দিলাম নিতে বলি। আমি যখন অনন্ত অন্ধকারের হাত দেখি না পা দেখি না তখন তোর ভুবনে ভর করে এ আমার কোথায় নিয়ে গেলি। (জবাসন্ধ / হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)।

(২) লাবণ্যময়ী উষ্ণিত তুমি কিছু কিছু অশ্রুবেদনাতে (সংগীতের পরিচ্ছদটী ঐ)।

(৩) নিজস্ব গাছ পড়া বৃষ্টিবৃষ্টি প্রায়ান্ধকার (চতুরঙ্গ ঐ)।

(৪) অলস অলস ভালোবাসা তুমি নাচছ [illegible] তাঁর দুটিতে পড়েছে সাদা গাছগুলি উপরোক্তন সমূহ [illegible] (ঐ)।

(৫) বাতাসে তার চমৎকার [illegible] নদীতটে। (ঐ)

(৬) যে বক্ষ নিয়ে কাব সেই বাঁধ [illegible] (দেবদূত/ঐ)।

(৭) হে উট পড়ার মাঠী আমার নাও [illegible] বহুদূরে কুয়াশাতলা কালো জল [illegible] হে উট [illegible] (ঐ)।

সব কটি উদাহরণই শক্তির প্রথম কাব্যগ্রন্থ হে প্রেম হে নৈঃশব্দ থেকে সংগৃহীত। কাব্যভাষার রহস্য বিষয়ক আলোচনায় চমৎকার একটি শক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক কথা গদ্যরীতিতে লেখা [illegible] কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দটি মোট আটবার ব্যবহৃত হয়েছে। একবার বিশেষণরূপে ও বাকি সব ক্ষেত্রেই বিশেষ্য পদ হিসাবে কিন্তু উদ্ধৃত অংশে 'অন্ধকারের মতো শীতল' উপমাবাচক বিশেষণটি লক্ষ্য করুন। 'শীতল স্পর্শের অনুভূতি সাপেক্ষ যেখানে অন্ধকার বহন করে কথা দশাপটের অনুভব অভিজ্ঞতা। তারপর শক্তি নিয়ে আসেন 'অনন্ত অন্ধকার' শব্দবন্ধে প্রত্ন অহীন অবয়বহীন কিম্বাকার অন্ধকারের এক ভয়ানক প্রেত অভিজ্ঞতা। স্বনিষ্ঠ আবেগময় তৎসম শব্দসমূহের গার্হস্থ্য ও অভিজাত্য আধুনিক বাংলা কবিতার এক লালিত উত্তরাধিকার। উদ্ধৃত অংশগুলিতে সেই উত্তরাধিকার মনস্ক কবির পরিচয় পাই 'নিক্ত' 'লাবণ্যময় অশ্রুবেদনাতে প্রায়ান্ধকার' উপরোক্তন অলকারহিত ইত্যাদি শব্দে। কিন্তু চতুরঙ্গে কবিতার ঐ পংক্তিতে 'নিজস্ব গাছ পড়া বৃষ্টিবৃষ্টি প্রায়ান্ধকার' কিভাবে 'প্রায়ান্ধকার' বিশেষণ পদটি তার ব্যাকরণ লঙ্ঘিত অবস্থান থেকে সারা গিয়ে উচ্চারণটিতে কবিতার কাঙ্ক্ষিত রহস্য এনে দিলো তা তো অস্বাদন করে দেখতেই হয়। ঋণী কবিতার দুটি ছত্র পরীক্ষা করুন। ভালোবাসা ঋণী তৈরী করেছিলো এখন ভালোবাসা তাকে নদীরূপ দিচ্ছে। আর সেই আশ্চর্য অতি ভৌগোলিক নদীকে দেখে 'সাদা গাছগুলি' অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ছায়ার কারুকাজ ছুড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ তো গেলো কবিতায় বর্ণিত

ছবি থেকে বাদ দেবার চেষ্টা। কিন্তু উপমাটিকে সরাতে ছাড়াবার ও মাত্র চিত্রকল্পমাত্র কি কোনো সার্থক সম্ভব? এরপর ভাষ্টি কবিতার পংক্তিটিকে দেখুন। নদীতটের শূন্যতার অনুভূতি মর্মটি অর্থাৎ মালা যেন পরিণত হয়েছে মর্মচিকায়। কিন্তু এও তো সেই কবিতার ভেতর থেকে গ্রহণযোগ্য অর্থ নিষ্কাশন। কবিতা থেকে ছেড়ে শব্দ বিন্যাসের অনুরণনী ধ্বনিত দোলায়িত প্রতিধ্বনিত মানবহৃদয়ের জীবনানন্দের বিখ্যাত পংক্তিটির মতো 'চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা', 'মুখ তার চমৎকার ডাঙাডাঙা মরচিত্রার শূন্য নদীতটে'।

একটু আলাদা করে দেখা যাক ভাবনাবাচক বলে কবিতার তৃতীয় অংশটি। উটি স্ব ভাবিকভাবেই প্রকাশের বাহন এবং কোনো বুকের কাটা পাত সেই প্রকাশেরই চিত্র। সেই প্রকাশ সুরের সীমা ছাড়িয়ে বাক্যে কুয়ে তলা কালো হল। মানে কথা আমার আর শক্তিল কথা হল শীতের প্রাকৃতিক ঘাস। কিন্তু কী অর্থে উটি পড়ার সময়ে? অথবা আমার উটি বলাহত বা ঠিক কী লেখকের? অথবা কল্পদর্শনের মধ্যে কিছুটা উদ্ভাবিত মিশিয়ে দিয়ে যুক্তি দুয়ে অর্থ অনুসন্ধানকে কিছুটা নাকচ দিয়ে কবি যেন পাঠককে মানিক চেতনার সন্ধানে দাঁড় করিয়ে দিতে চান। এ কবিতার পরবর্তী স্তবকে কিছু করে আসে আরো কিছু উদ্ভট ছবি যাতে কারণের অর্থ ও বিন্যাসগত অসঙ্গতি এক নবাগত যুক্তিক্রম রচিত। আমি পরের স্তবকটা অর্থাৎ কবিতার দিকে তুলিত করব। কী সব উদ্ভট ছবিরই দিয়ে পরে দিয়ে না যেন কবির দিয়ের দাঁড়। আসল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ ছাড়ে। বাঁধা পাকে মুহূর্ত ভাবনা বাড়ে বাড়ে। তবে নিশ্চয়ই এই যে শব্দার্থ ও বিন্যাসের এই অসঙ্গতি সত্ত্বেও কবিতায় নির্দিষ্ট ছন্দ ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কারটি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। ফলে শব্দের বেশ কিছু কবিতায় চিত্রকল্প ও পরবর্তে উদ্ভাবিত ও যুক্তিক্রম লঙ্ঘনের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে যাবতীয় কবিতার পর বস্তুবাদীদের সমালোচনায় বলে শক্তিকে চিহ্নিত করা চলে না।

বিচ্ছিন্ন সাক্ষাৎকারে ও কবিতা বিষয়ক টুকরো লেখায় শক্তিবাবুর একটা ঘোর লাগা মানসিক অবস্থার কথা যে আবিষ্ট অবস্থা থেকে তার কবিতাগুলি জন্ম নিয়েছে কয়েক মিনিট প্রায় কোনো কাটাকুটি ছাড়াই লেখায় এসেছে একটি কবিতা পরেও তার কোনো সংশোধন বা পরিমার্জনার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি 'পরাবাস্তবতা বা সুররিয়ালিজম এর দার্শনিক বোধ শক্তির সাম্প্রতিক কবিতাচর্চায় সেভাবে প্রতিফলিত না হলেও কবিতার সৃজন পদ্ধতিতে এক অবচেতন অতীন্দ্রিয় রহস্যের ছোঁয়া তিনি অস্বীকার করেন নি। 'আমার যা কিছু লেখা সে সব তো সচেতনভাবে লিখি না – কে যেন লিখিয়ে নেয়। হঠাৎ হঠাৎ একটা সময় আসে এমন একটা গভীর অবস্থার মধ্যে চলে যাই তখন লেখা হয়'। অথবা 'লেখা ব্যাপারটাই আমার মনে হয় আমি যেন একটি পুকুরের মধ্যে ডুব দিলাম উঠলাম না। যতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ততক্ষণ যা দেখলাম জানলাম তাই লিখে ফেলা।' এমন আবিষ্ট অবস্থায় কবিতারচনার কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে ইংরেজী তথা ইওরোপীয় কবিতার ইতিহাসে মূলতঃ রোমান্টিক

কবিদের প্রসঙ্গে, ব্লেক, কোলরিজ, ইয়েটস, হোল্ডারলীন প্রমুখের ক্ষেত্রে।

অথচ আবিষ্ট হয়ে সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় কবি যতই কবিতা রচনা করুন না কেন, সেই সৃজন প্রক্রিয়ায় নির্মাণের ন্যূনতম শৃঙ্খলা ভাষা-ছন্দ-অবয়বের কিছু পরিকল্পনা থাকেই, অথবা বলা যায় থাকতেই হয় যদি তাকে কবিতা হিসাবে কোথাও পৌঁছতে হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতা বোহেমিয়ানা সত্ত্বেও শব্দমনস্কতা, চিত্রকল্প-প্রতীকের অনবদ্য কারিগরি, নিরূপিত ছন্দ ও ছন্দভাঙায় তাঁর অনায়াস দক্ষতা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে কবিতাশিল্পের চর্চায় তিনি যথেষ্ট শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। কোনো সোচ্চার ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে কবিতাকে ব্যবহার করতে চান নি। পরোক্ষে টান-টোনের মধ্য দিয়ে শব্দ প্রয়োগের সমস্ত সম্ভাবনাকে চিনি দিয়ে গেছেন জীবনের 'জ্বলন্ত দর্পণ' হয়ে ওঠার স্বাধীনতা।

ফিরে আসি 'প্রকৃতির প্রাণ আর প্রাচুর্য নিয়ে শক্তির শব্দের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রসঙ্গে। 'শব্দ হাতে পেলেই আমি খরচা করে ফেলি' বলেছিলেন যে কবি তাঁর সেই অমিতব্যয়ীতার প্রসঙ্গ স্বীকারোক্তির কথা ভাবলে আমাদের তো এটাও ভাবতে হয় যে মুক্ত হাতে ব্যয় করতে গেলে উপাদানের প্রাচুর্য থাকাও জরুরি। শক্তির কাব্যভাষার রহস্য সৃজনধর্মীতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তার শব্দের বিস্ময়কর প্রাচুর্য, ঐতিহ্যানুসারী ও জ্ঞানদার তৎসম শব্দ-ভাণ্ডারের পাশাপাশি তদ্ভব অর্থাৎ আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের শব্দ, গ্রাম্য বা আঞ্চলিক শব্দ, অশিষ্ট বা ইতর শব্দের অ-কচ্ছ বাহুল্য, ইংরেজি ও অন্য বিদেশী ভাষার নানা স্বাদ ও বর্ণের শব্দ—সব মিলিয়ে শব্দের এক অবিশ্বাস্য, বর্ণাঢ্য মিলন মেলা। এক সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততা ও শুচিবায়ুহীনতায় সব ধরনের শব্দকে যেভাবে তাদের ব্যাকরণ ও সংস্কারশাসিত অর্থের পাহারাদারি থেকে শক্তি মুক্তি দিয়েছেন বস্তুত্ব বাঞ্জনার রহস্যে, উপাদানের সেই সাবলীল নিশ্চয়তা না থাকলে কি খরচ করা যেত ঐ 'রূপবান কথার মোহরগুলি'?

তবে কেবলই যথেচ্ছভাবে শব্দ খরচ করে গেছেন শক্তি এ তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাণবন্ততার উচ্চারণ। অসংখ্য শব্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি মহৎ কবির প্রতিভা ও দায়িত্বে খরচ হয়ে যাওয়া শব্দগুলি জমা পড়েছে, ধৃত রয়েছে অগুনতি পাঠকের অনুভব ও স্মৃতিতে। ভাষা ও সংস্কৃতির নানা স্তর থেকে লক্ষ্যভেদের অব্যর্থতায় শব্দগুলিকে তুলে আনা এবং অভাবনীয় চৈতন্যময় উচ্চারণে তাদের প্রয়োগে যেমন এক বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শক্তি, তেমনি শব্দের অন্তর্লীন রহস্যকুহকের নানা দিক নিয়ে লিখেছেন এমন বেশ কিছু কবিতা যা আধুনিক শব্দবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় গভীর অভিনিবেশ দাবী করবে। মনে করুন তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ৯৫ সংখ্যক রচনাটি 'শব্দগুলি সুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে / আমার পেটকাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড় / সংসারে গেরস্ত মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে / অবশ্য জানি শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর / শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, হিসি করে বুকে / খুচরো করে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সংবিৎ, / তাকে করে জামা, গায়ে জামা

নেই, মৃদু নতমুখ / এভাবে শব্দকে জানি একদিন তারও মৃত্যু হবে!' মানুষের একেবারে সহজ গার্হস্থ্য জীবনের ছবিতে এখানে দেখা হয়েছে শব্দকে। শক্তি এখানে শব্দের সাংসারিক ধর্মে বিশ্বাসী। কোনো অসম্ভব উচ্চাকাঙ্খা নেই তাঁর বরং ক্রমে অবসিত হয়ে আসার অনুমতি, এক স্বাভাবিক মৃত্যুবোধ যেন তাঁর শব্দবোধেও সংক্রামিত। শব্দের প্রয়োজন, শব্দের শক্তি, শব্দের জীবন-মৃত্যু, যন্ত্রণা উদ্দীপনা, ভাঙা-গড়া নিয়ে নানাভাবে ভেবেছেন শক্তি। ব্যবহারে জীর্ণ হতে হতে, অর্থের সংকোচন বা অবনমন হতে হতে, শব্দ একদিন অবসিত হয়। সে রকমই ক্লান্ত অনময় শব্দের বেদনা অসম্ভব মানবিক আবেদনে ধরা পড়েছিলো 'সোনার মাছি খুন করেছি'র 'ক্ষমা করো' কবিতায় ' শব্দ ছড়িয়ে পড়ে শব্দের সমুদ্রে / যেখানে মূল শব্দ উঠে আসে / উপকূলের বালুতে রাখে বুকের দাগ / মুখ জলায় দেয় ডুবিয়ে / কাঁধে মাথা রেখে বলে / ক্ষমা করো—আর বাজতে পারি না'।

'কবিতা' নামক বানীশিল্পের অমোঘ উপকরণ শব্দ। নির্মাণের সেই উপকরণ নিয়ে এতো আন্তরিক ও নিবিড় মানবিক অনুসন্ধান খুব বেশি নির্মাতার কলমে উঠে এসেছে বলে মনে হয় না। শব্দকে মানুষের মতো করে দেখা এবং মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, ক্ষয়-ক্ষতি, যন্ত্রণা-উপশম দিয়ে চিহ্নিত শব্দের বারোমাসা শক্তির কারবারের এক অভিনব মাত্রা ঃ—

(১) 'আমিও দুঃখিত হই শব্দের নিজস্ব অনুতাপে / যে আমি একদিন তাকে আগাপাছতলা পেটাতাম / এখন তার দুঃখে আমি দুঃখী অনুতাপী— / একদিন পিরে যেতে হবে প্রসিদ্ধ যৌবনে / অবাধ্য শব্দ ক্রমাগত সাজিয়ে মহান / আবার বানাতে হবে নিজহাতে নিজেরই সমাধি '। (ফেরা, পিছুটান আর পিতৃদুঃখ / প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)

(২) 'শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে / এক নিদারুণ রোদ এসে ডাল মুড়িয়ে নেবার কালেই / শব্দ গেছে হাওয়া ফেরাতে কাটি-গঙ্গার খালে! / শব্দ এমন যখন-তখন শটকে পড়েন দূরে / হয়তো ভাবেন, পারলে যাবেন এড়িয়ে রোদ্দুরে / কখনো কোনো গাঁয়ের মধ্যে / যেখানে নেই আস্ত রোদের হানা / সব কিছু সাত-টুকরো এবং তরল কাণ্ডখানা!' (শব্দ গেছে / কবিতার ভালো ওড়ে)

(৩) 'শব্দের নিজস্ব কিছু কিসে আছে, কৃষিবৃত্তি আছে, / শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছ মাংস খায় / তুলাকরা অন্নে-শস্যে, শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ আছে। / তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনটি বা / যুগলে মানায় কাউকে, অনো বসে নিভৃতি, বিরহে— / এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা / মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে / বালু নিয়ে অকারণ, বল নিয়ে, ইয়ো-ইয়ো নিয়ে—/ সেই স্বাভাবিক খেলা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি / একদিন, তারপর মিশে গেছি তাদের সহিত ঃ / আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে / এই বলে, ব্যবধান না রেখে অন্দরে চলে গেছি'।

(মিশে গেছি শব্দের সহিত / এই আমি যে পাথরে)।

(৪) 'শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে। বর্ণমালা যার দুয়ার কিছু কিছু নিয়ে বনভূমি মডেল টাউন যেন গড়েছে নিঃসঙ্গ তিলোত্তমা অমরত্ব চাই বলে অধিকাংশ শব্দ হেলে দুলে অধ্যুষিত শব্দ চোখ মুদে থাকে পাতার আড়ালে। শব্দেরা নিজস্ব একটি শহর গড়েছে - দেখে আসি চলো দেখে আসি কোথাকার তরকারি কোথায় বেচেছে)।

আমিও অনাথ শব্দ আমাকে খেলায় নিতে হবে এই কথা বলে যে কবি ঢুকে পড়েন শব্দের অন্দরমহলে তাঁর শব্দ পুরবলই কবিতার সেই হয়ে ওঠে চাবিকাঠি। কবিতা রচনার একেবারে আদিপর্ব থেকেই অভিজ্ঞতার অল্প বয়স হইতে শব্দের বাসহারে শক্তি আধুনিক কবিতায় তাঁর কীর্তিমান পূর্বসূরীদের পদাঙ্কে অনুসরণ করেছিলেন ধ্বনিময়, ওজোদার বিশ্লেষণ ও বিশেষ শব্দের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যভাষায় নিশ্চিতভাবেই এনেছে এক মধুর পার্থক্য 'পরদেশগুটির অনুভূতি সড়ক পলাশমণ্ডিত কেশমালা' 'ফেনাসংগত রাত অমনোযোগিতময় সিঁড়ি সপ্তাহের জগৎসংসার' অনুমানীয় অন্ধকার' 'তৃষিত কল্পনাপরবশতা উপনক্ষত্রতাটান মেরুদণ্ড' কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা বিপুল অর্থগ্রন্থ ইত্যাদি অদ্ভুত শব্দবিন্যাস শক্তির কবিতার পর কবিতায় উচ্চারণের গর্ভীর কাব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত স্বরগ্রামটি চিহ্নিত করেছে। আবার তারই পাশাপাশি গ্রাম্য অশিষ্ট উভয় শব্দের অবাধ প্রয়োগে শব্দের বৈদিক প্রথা তথা বর্ণাশ্রম ভেদে দিয়েছেন শক্তি এক অভূতপূর্ব সিদ্ধিতায় - লোপ হাত চুমায় অশ্লীল দেহের নিহত মৃত পৌরুষ তুলনায় ঘ ঘ করতে করতে দিকবিদিকহারা ডালিয়ার চন্দ্রমল্লিকার / আশাদা গতর কোড নিয়েছিলো আদি পুরুষের হাত মাথে হেসে যায় উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্তানেই অন্ত পোড়ার মুখো মিনসে / মা গো কী তার চিহ্নে' কেলিয়ে কাতরায় পড়ুন সন্তানেরা মুখোমুখি দাড়াই জীবনে, চোখ মারি / নিজের পেন্টুলে মুছি নেমন্তন্ন বাড়ি খেয়ে অটিচাটি করতে করতে মাগভাতারে পথ / পাড়ি দিচ্ছে মোটরে এলাটি পায়ে পরানন তেনি তোলা কাব্য সুষমাময় রুচিশীল শব্দ ও বাক্য প্রতিমান সংসারে তথাকথিত অন্ত্যজ অপশব্দের এমন অসংকুচিত অনুপ্রবেশ শক্তির আগে বাংলা কবিতায় দেখেছি বলে মনে হয় না এও সম্ভবতঃ শক্তির জীবন ও রচনার প্রকাশ কর্মকাণ্ড যে 'মার্কিনমার্কি'র কথা বলেছিলেন তারই লক্ষণ। উত্তর-আধুনিকতার অন্তর্ঘাতমূলক প্রবণতার কিছু স্পর্শও কি এতে পাওয়া যায় না?

কবিতায় শব্দ আর অর্থকে আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। ঠিক যেমন রেখাচিত্রে আলাদা করা সম্ভব নয় রেখা ও চিত্রকে, রেখাই চিত্র আবার চিত্রই রেখা। ভারতীয় আলংকারিকদের অন্যতম কুন্তক শব্দ আর অর্থকে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত দুই যোদ্ধার সঙ্গে তুলনা করে তাদের 'পরস্পরস্পর্ধিত্ব' ও অন্যান্যাতিরিক্তত্ব'র উল্লেখ করেছেন। কবি পল ভালেরি শব্দ ও অর্থের দ্বৈতসত্তা এবং কবিতার ভাষার স্বাতন্ত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে একটি দোদুল্যমান পেন্ডুলামের রূপক ব্যবহার করেছেন— Think of Pendulum

existing between two [illegible] points. With [illegible] of these points [illegible] the focus of [illegible] Wheelwright. [illegible] point [illegible] the meaning of the given poem [illegible] between the [illegible] and the context [illegible] the sense [illegible]' কবিতায় তাই শব্দের অর্থের কোনোরূপে সীমাবদ্ধ থাকে না। আপাত অর্থের সীমা পেরিয়ে নতুন কোনো ব্যঞ্জনা, ভাষার আপাত স্বচ্ছতা অতিক্রম করে কোনো অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত দেয় কবিতার ভাষা। অবশেষে বোঝার আগেই তা বেজে ওঠে, স্মরণীয় কবি এলিয়টের সেই বহুল প্রচারিত উক্তি 'Genuine poetry can communicate before it is understood.'

শব্দ ও অর্থের এই 'পরস্পরসম্পৃক্ততা' সেতুবন্ধনের কোনো ছল [illegible] থেকে অনায়াসে সেই রহস্যযাত্রা আরো অনেক মহৎ কবির মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যভাবনারও সমান্তরালরূপ। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে কয়েকটি আশ্চর্য পংক্তি। শক্তি যখন লেখেন 'অধিক নিচুর মাঠ', কিম্বা 'পরিত্যক্ত বাড়ি পোড়খাওয়া' কিম্বা 'চতুর্দশীকার মাংস' কিম্বা 'রূপসীর রবাবের কান্নাকাটির মতো' তখন 'বস্তুসত্যের' বিবরণ কোথায় যায় কেবল? এমন প্রয়োগ কি খুবই সম্ভব? অথবা শক্তি যখন 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই' কাব্যের 'পোড়ো ওগুলি শব্দ' নামক ছোট কবিতায় 'শব্দ' এই শব্দটিকে দ্বৈতার্থে ব্যবহার করেন কিম্বা 'আমি চলে যেতে পারি' [illegible] 'বাসনা', 'সীমাবদ্ধ' ও লাইনের কবিতায় 'মানুষ' শব্দটি যখন ব্যবহার করেন বারংবার, তখন কী মনে হয় না যে কবিতা প্রকৃতই 'হয়ে ওঠে' এবং তার নিরবচ্ছিন্ন উৎসারণ ও সম্প্রসারণ তার নিজস্ব [illegible] সাথে নিষ্কাশন অপেক্ষা অনেক বড়।

শেষ করার আগে খুব সংক্ষেপে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই। প্রায় বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েও পরে রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন শক্তি। তাঁর কবিতায় দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি বারবার উন্মোচিত হয়েছে। [illegible] নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তি তবু সমসময়ের বহু জ্বালাযন্ত্রণা ধরা পড়েছে শক্তির কবিতায়। অথচ তবুও তাঁকে 'সমাজসচেতন' বা 'দায়বদ্ধ' আখ্যা দেওয়া যাবে কিনা জানি না। তবে তাঁর বহু কবিতায় সমাজ-সমকাল, মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখ বিম্বিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে সেইসব কবিতাতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর রহস্য সন্ধানের কারুকাজটি চিনতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না :—

(১) 'একটি ভিখারি ছেলে জানলার কাছে দেখছিল ভাত আর পরশ কাটছিল / জ্যোৎস্নায় ভুতুড়ে ধানগাছগুলি ধানের গোড়ায় শুরু জল ঢালা মাখনের মতো মাটির সারল্যতার চিকন কাঁপানো ধান ধানগুলি ভাত হতে পারে?' ('সীমান্ত প্রত্যন্তঃ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন' / অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

(২) 'শিশুকেও মাতৃক্রোড়ে হত্যা করে বাধা রাজনীতি। এও কি মানুষে করে? যে মানুষ বসেছে হৃদয়' ('তীক্ষ্ণ তরবারি / প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)

(৩) 'অস্ত্র নদীর কাঁধ থেকে আজ জনমানুষের গায়ে পড়ে, গোপন পিঠে এবং মিঠ মাথার ওপর ঘূর্ণিঝড়ে যেমন ধুলো অনেকগুলো হিংস্র পোড়ায় দৃষ্টিতে ঘর / মানুষ নামের জাতক জ্বলে সব যুগে এই ভ্রান্তিমুখর ' (ঐ যেখানে অস্ত্র, সুখে আছি।

(৪) 'সমস্তটাই প্রবোচনা, সমস্তটাই ফন্দি বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে ভিতরে তাই বন্দী বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর বইলো অন্ধ হাত বাড়ালে টিকোনো দায় স্বাধীনতার স্বাস্থ্য।' (সম্প্রতিকী ১৯৬৬' ঈশ্বর থাকেন জলে)

(৫) টালিখোলার ওপরে পড়েছে রোদ, অনেকদিন পরে, আমাদের ঘরে ভাত ফোটানো হচ্ছে, কালো ডিক্সিতে ফুটছে ভাত ভোর বরাত, আমাদের ঘরে রোদ্দুর এসেছে ভাতের গন্ধে পেটে ডোচকানি লাগে রাখো গা জ্বলছে, পেটে জ্বলছে খাওয়া, এই তো হাত নেমেছে / ভালোই, অনেকদিন বাদে ভালো আসছে / তাকে ডাকি'। ('তাকে ডাকি' জ্বলন্ত কমাল)।

(৬) ছেলেটা খুব ভালো কারাগে শক্ত পাথর ভেঙে, মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো' (ছেলেটা ভাত নেই পাথর রয়েছে)।

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কারাগারের 'এপিটাফ' কবিতায় শক্তি এক আত্ম প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন যাতে ছিলো এক কবি ও কাঙাল'-এর কথা। সে মারা গেলে 'মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ, / কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে বিরক্ত করবে না / সন্ধ্যাবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না টাকা দাও নতুবা ভাঙ চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা, / চটজলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে'। এই আত্ম চিত্রণে হয়তো কিছু বাড়িয়ে বলা কিছু মজা ছিলো। তবু এর ভেতরে 'কবি' ও 'কাঙাল', এই দুই বিপরীতমুখী অস্তিত্বের এক আশ্চর্য সহবাসের কথা আছে কবি, যিনি বেপরোয়া, প্রতিষ্ঠানিক বাণিজ্যের কর্ণধারদের কাছে যিনি অস্বস্তিকর হয়তো বা বিপজ্জনকও বটে, যিনি দৈনন্দিন জীবনের দাবী আদায়ে সোচ্চার, অন্যদিকে কাঙাল, যিনি অবিরত পুড়তে থাকেন জীবনযাপনের প্রবল বাসনায়। একজন রাগী, উচ্চকণ্ঠ, অন্যজন কিছুটা দুর্বল, অসহায়। এই দ্বৈত অস্তিত্ব আর তার অলঙ্ঘনীয় সংঘাত এক রক্তমাংসের মানুষের জীবনলিপ্সা যিনি সৃজনের স্পর্ধিত উচ্চারণে নিজেকে মেলে ধরতে চান, তারই ভেতরে লুকিয়ে থাকে এক নিভৃতচারী অচিন মানুষ। এই বিপ্রতীপতাই জীবন, এই বিপ্রতীপতাই সৃজন আর তাই যে কবি 'গাছ', 'বৃষ্টি', 'চাঁদ', অনন্ত' ইত্যাদির মতো প্রতীক বা চাবি-শব্দগুলি বারবার বাজিয়ে তোলেন তাঁর কবিতায়, তাঁকে বারবার দাঁড়াতে হয় 'পাথর', 'চিতা' আর 'অন্ধকার'-এর সামনে। সম্ভ্রান্ত ও কুলীন শব্দের সঙ্গে প্রায়শই ঢুকিয়ে দিতে হয় কর্কশ ও অশিষ্ট শব্দকে। আসন্ন মৃত্যুর নিষ্ঠুর থেকেই উচ্চারণ করতে হয় -'আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে / শুধু জাগরণ চাই বারেক জীবন'।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১ শক্তির বন্ধু ও বিখ্যাত চিত্রকর প্রকাশ কর্মকার তাঁর শক্তি বিষয়ক স্মৃতিলেখায় 'ম্যালিগনান্সি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন শক্তির স্বভাব ও সৃজনের গভীরে থাকা এক অস্থির বোহেমিয়ানাকে বোঝাতে। সূত্র: 'আমার বন্ধু শক্তি কিন্তু আপাতত মুখ লুকোনো অনগোশ উজ্জ্বল পশমের কাউবে চঞ্চলভাবে' কবিতীর্থ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২ ।

২ 'কবিতার প্রতি সমীহ' অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, জানুয়ারি ১৯৯০।।

৩ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত স্থির বিস্ময়ের দিকে ১৯৭৬ পৃঃ ২৯।।

৪ এই কাব্য এই হাতছানি দেবতোষ বসু সম্পাদিত, ১৯৯৭ ভূমিকা পৃ ৭ ।

৫. তদেব

৬ ভূমিকা অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায় পৃ ১৪।

৭ Suzanne Langer Philosophy in a New Key quoted in Philip Davies Robets, How Poetry works, 1986, P 67

৮ মানেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবন ঘসে আগুন জীবন ঘসে কবিতা', বিনোদন বিচিত্রা ১৮ এপ্রিল, ১৯৯৫।।

৯ 'শক্তির কাছাকাছি' সমরজিৎ ও ইলা সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), ১৯৯৬, পৃ ৭৪।।

১০ 'এই কাব্য এই হাতছানি', পৃ ১২৮।।

১১. তদেব, পৃ. ১২৩।।

১২ Paul Valery The Art of Poetry 1958 P 209-10

বাংলা কবিতায় রাজনৈতিক উপাদান (১৯৭০ – ২০০০)

হিমবন্ত বন্দোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

নেশায় মাতা তরুণের স্বপ্নে এবং স্বপ্নভঙ্গে যার পরিচয় এত বড় উত্থান এবং এতখানি অপচয় কখনো কি দেখেছে এই দেশ? এই মৃত্যু উপত্যকা কি কারও দেশ ছিল তখন? ছিল বোধ হয় তাদের সমবেত প্রতিরোধেই তো সেই লাশবিপ্লবের চরিত্র গেল বদলে সে তো সম্ভবই এই উত্থানপতনের সময়ে সুতরাং রাজনীতি, কবিতা এবং জীবনযাপন যে মিলে মিশে যাবে এবং হয়ে উঠবে নতুন এক মাত্রা এমনটাই প্রত্যাশিত না, সম্ভবের কবিতা প্রত্যাশাভঙ্গ করে নি খুব বেশি ভরা এই পশ্চিমবঙ্গের অদূরে ঠিক তখনই চলেছে আর এক মুক্তিযুদ্ধ রচিত হয়ে চলেছে আর এক শৌর্যময় ইতিহাস। পূর্বপাকিস্তানের বাংলাদেশ হয়ে ওঠাও কম রোমহর্ষক নয় এই সব মিলিয়ে পূর্বপশ্চিমে দুই হাতে কালের মন্দিরা বেজেছে তখন উত্তাল বায়ু। এই সব মিলে গেছে সন্তবদশকের কাকবাসনায়, তার কবিতাতে।

॥ দুই ॥

গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখলো ভি আই পি র লোক
স্টেটসম্মান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘর হলে বলেছিলো 'আর নয় এবার ফিরে যা
ফেরার আগেই থাকি বাড়ির বিদ্যুৎ দরজায়
বিড়ালবার গর্জে ওঠে...

অধ্যাপক বলেছিলো 'মাস্টার বড় আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'
মাস্টারের কাশি ওঠে, কোথায় বিপ্লব শুধু মাথে গেল অসংখ্য হাতাতে
উকিল সতর্ক হয় 'নিষ্কৃতি নিই নি শুধু চাকরি দামটা বাড়ো লিখে
চটকলের ছকু মিঞা, 'এবার পাঁচসালা শাহা হারানি ও সিংকে'
উনুন জ্বালে নি আর, বেতার ধারেই সেই ডামাডোলের তেজি রক্তধারা
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকে ছিল তারা

সন্তবের এই অতি জীবন্ত ছবিটি কবিতায় এঁকেছেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। ষাটের কবি হলেও সন্তবের কবিতায় তাঁর শ্বদর্শিয় সক্রিয়তা ভোলার নয় আসলে রাজনৈতিক ভাবে সন্তবের ভূকম্পনের এপিসেন্টার তো ষাটের শেষেই। এই সময়ের জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এইরকম :

ষাট	সন্তর	বিশ্বপরিস্থিতি
১ চীন ভারত যুদ্ধ (৬২)	১ নকশাল আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও দমনমূলক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস	১ মহাকাশে মানুষ (৬১)
২। কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ (৬৪)	২ বিধানসভা নির্বাচন (৭২)	২ চাঁদে মানুষ (৬৯)
৩। পাক-ভারত যুদ্ধ (৬৫)	৩ জরুরী অবস্থা (৭৫)	৩ ভিয়েতনাম যুদ্ধ (৬৫)

ষাট	সত্তর	বিশ্বপরিস্থিতি
৪ বিহারের কংগ্রেস বিরোধী [illegible] নকশালবাড়ি আন্দোলন ('৬৭)	৭ বিহারের নির্বাচন [illegible] ক্ষমতায় ('৭৭)	১ ফ্রান্সে ছাত্র আন্দোলন ('৬৭)
৫ যুক্তফ্রন্ট সরকার (৬৭ ও [illegible])		২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এছাড়াও গণতন্ত্র হত্যা দেশে দেশে ইন্দোনেশিয়া সুহার্তো, কঙ্গো (পাট্রিস লুমুম্বা), চিলি (আলেন্দে) ইত্যাদি
৬ কংগ্রেস [illegible] ('৬৭)		

গোটা পৃথিবীর এত অস্থিরতার কারণে এই ঘনঘন মাথা নাড়ার দিনগুলিকে এই বাংলার গ্রাম শহরের গুলশান অসুস্থ তেহারা শুধু সেলুলয়েডে নয় বেশ আস্ত ইঁদুরের জানের মনে মনেও বহু ঘন হতেই পুলিশ গার্দের আড়ম্বরে আনাগোনা আর চেনা অচেনা পায়ের দুদ্দাড় দৌড় তারপর বোমা ও গুলির শব্দ পরদিন খবরে বা খবরের কাগজে সত্য মিথ্যা অর্ধসত্য সেসব ঘটনা দুর্ঘটনার খবর মৃত্যুর পরিসংখ্যান। ট্রাম বাস, স্কুলবাড়িতে আগুন মিছিল টিয়ার গ্যাস ট্রাঞ্চিক পুলিশের মাথা ফাটা লাল হাত বাঁধা যুবকের মৃতদেহ—বেওয়ারিশ কাইওয়ান বাম্প হাড় ছিঁড়ি, সি আর পি র বুলিং অপারেশন পাড়াভাঙা আর পুলিশবাহিনীর ধরপাকড় বিচিত্র নিয়ম কোলাজ একদিকে স্বপ্নদর্শী যৌবন অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ একদিকে ঈশ্বর অন্যদিকে ব্যর্থতা একদিকে গণতন্ত্র অন্যদিকে গণহত্যা এবং আরও বেশি করে—গণতন্ত্রহত্যা এই ছিল এই সময়ের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ও আবহ।

সত্তর, এই সিকি শতাব্দীর পূর্বার্ধ এমন ইতিহাস কিন্তু আশি নব্বই? সময়ের এই ঘনিষ্ঠতা কি সময়কে বোঝার ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়? একথা ঠিকই, এসেকালেটরের নিম্নতম ধাপে পা রাখলে সেই চলমান সিঁড়ি যেমন পথিককে পৌঁছে দেয় ভিয়াদের উচ্চতায়, অনায়াসে সময়ও তেমন কবিকর্মী নতুন সহস্রাব্দীর চলমান চলে এলাম আমরা। এভাবেই হয়তো আলতামান ইতিহাসের অঙ্গ লিপ্ত আমরা। তত্ত্বগতভাবে একথা হয়তো ঠিক কিন্তু শিল্প সাহিত্যের মূল্যায়ন এতো সহজ সরলক করা যায় কি? আশি নব্বইয়ের কবিতার স্বভাবচরিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই ধারণা থেকেই যায়। স্থির সময়াঙ্ক স্থাপন করার মতন প্রামাণিক ভিত্তি পেয়েছি কি আশি নব্বই?

তবু একথাও ঠিক সত্তর দশকের থেকে আপসামাজিক রাজনৈতিক নানা কারণে আশি এবং নব্বইয়ের দশক, তার কবিতা তার কবিতায় জন্ম ওঠা রাজনীতির ধরন অনেকটাই আলাদা সেগুলি চিহ্নিত করার আগে আশি নব্বইয়ের সমাজ রাজনীতির একটি রেখাঙ্কন করা প্রত্যাশিত, এখানে সেই প্রধান ঘটনাগুলি সংকেতিত হল :

প্রাদেশিক ও জাতীয় ঘটনা	আন্তর্জাতিক ঘটনা
১ স্বাধীনতা উত্তর কালে সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ, আই এম.এফ থেকে, ৫০০ কোটি ডলার ('৮১)	১ সিরাইল গরবাচভ ক্ষমতা বাষ্ট্রগ্রহণ (৮৭,

প্রাদেশিক ও জাতীয় ঘটনা	আন্তর্জাতিক ঘটনা
২ জাতীয় মূল্যায়নের সম্ভাবনা (৮২)	১ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন শুরু পোলান্ড, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়া ('৮৯)
৩ ইন্দিরা গান্ধী হত্যা (৮৪)	২ টিয়েনানমেন স্কোয়ারে গণহত্যা (৮৯)
৪ শ্রীলঙ্কায় তামিল উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান ভারতীয় শান্তি রক্ষী প্রেরণ (৯	৩ রুমানিয়ায় স্বৈরতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের পতন (৯১) বাকি ইয়াকোবসিন
৫ বাবরি মসজিদ ধ্বংস (৯	৪ ইথিওপিয়ায় স্বৈরতন্ত্রী সরকারের পতন মেংগিস্টু হাইলে মারিয়াম ('৯১)
৬ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় ৯৮	৫ উপসাগরীয় যুদ্ধ (৯৪

আমরা দেখছি উল্লিখিত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ কি বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সময়ের কবিতায় প্রভাব বিস্তারকারী। রাজনীতির উপাদান অনেক ক্ষেত্রে কবিতার মধ্যে বসল গেছে। সরাসরি রাজনৈতিক অভিপ্রায়ক্ষমতায় শিল্প নিছক শিল্প থাকে না বলেই কুশলী কবি কিছুটা ঘুরপথে কবিতায় রাজনীতির উপাদান ব্যবহার করেছেন। বিশেষত নব্বইয়ে।

।। তিন ।।

কবিতার এই দশকগুলির অলীক সম্প্রদায়ে অনেক প্রাবন্ধিক সত্য ধরা দেয় না — একথা আমরা জানি এবং মানি। শুধু 'মানব বন্দনের প্রার্থনা' ছাড়া সম্ভবের রাজনৈতিক কবিতার মূল্যায়ন কি সত্যিই যথাযথ খুঁজে পায়? অথবা, অমিতাভ দাশগুপ্তের এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্রুদ্ধ অথচ অনিবার্য কবিতা বিনা? মুক্তিযুদ্ধ বইগুলির আড়ালে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ইতিহাস ধরে রেখেছেন আর সম্পাদিত করেছেন উত্তর প্রদেশের জন্য — আর কি সত্যি কোনও তুলনা আছে? কি বা অরুণ মিত্র এই সংযত কলালেখির সংবেদনশীল স্রষ্টাকে ভুলে যাবে কি করে সম্ভব?

তবু সম্ভবের কবি তো মূলত তাঁরাই, যাঁরা এই আলোচ্য সময়ে এলেন প্রথম, রচনা করলেন নিজেদের পৃথক অথচ সার্থক আত্মপরিচয় কবিতাসমূহের। অন্তত এইভাবে বিভাজনেই প্রতিটি দশকের নতুন কবিদের নতুনত্বকে বুঝে নিতে পারি আমরা। এই সময়ে সক্রিয় সিনিয়ার কবিদের। অতএব, সংশ্লিষ্ট আলোচনায় উহ্য রাখাই সমীচীন বিবেচিত হল।

সম্ভবের কবিরা সংখ্যায় অল্প নয়। তাদের সব কবিতাই এখন নানা কারণে সহজপ্রাপ্য নেই। কিন্তু সেই কালের ক্যানভাসে যাদের ছবি উজ্জ্বল করে আঁকা রাজনীতির মধ্যে এবং বাইরে। তাদের নামের একটি তালিকা এখানে রাখা হল। এই তালিকা সম্পূর্ণ এমন হঠকারী দাবী অবশ্য কারই বা করার দুঃসাহস হবে। কতকগুলি উপবর্গে তাদের স্থাপন করা হল, এক লহমায় তাদের শনাক্তকরণের সুবিধার জন্য :

রাজনৈতিক কবি (যাঁরা অকালপ্রয়াত)	রাজনৈতিক কবি (যাঁরা বেঁচে রইলেন)	সত্তরের কবিতার	সত্তরের পুরনো কবি
১. [illegible]	১. [illegible]	১. [illegible]	১. অমিতাভ গুপ্ত
২. মুরারি মুখোপাধ্যায়	[illegible]	[illegible]	২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. বিমল বসু সিংহ	৩. [illegible]	[illegible]	৩. সুনন্দা রায়
৪. অমিত চট্টোপাধ্যায়	৪. [illegible]	৪. [illegible]	৪. শীতলেশ ভট্টাচার্য
	৫। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫। নমিতা চৌধুরি	৫. [illegible] চৌধুরী
	৬। বিপুল চক্রবর্তী		৬. মেহদাদ [illegible]
			৭. কমল চক্রবর্তী
			৮. [illegible]
			৯. [illegible]
			১০. একলাব [illegible]
			১১. [illegible]
			১২. [illegible]
			১৩. [illegible]
			১৪. [illegible]
			১৫. [illegible]
			১৬. [illegible]

সত্তরের ঘটনাবহুল এবং রাজনৈতিক পুঞ্জিভূতের দিকে তাকালে দেখা যায় এই দশকের শেষাংশে একধরনের দ্বিধাগ্রস্ত মিশ্র এসেছিল বাঙালির জীবনে জনপ্রাচীরে অন্যান্য সত্তরের তরুণতর কবিদের লেখায় চলমানতা সেই সত্য ভাষা পেয়েছে এদের মধ্যে আছেন ১. জয় গোস্বামী ২. মুরারি মুখোপাধ্যায় ৩. সুবোধ সরকার ৪. ব্রত চক্রবর্তী ৫. অমিত বসু প্রমুখ।

নিছক কবিতার দর্শিকোণ থেকে দেখলে প্রোলেচার্য ঘোষ বা মুরারি মুখোপাধ্যায়ের কিংবা হিমিরবরণ সিংহের কবিতা অপরিপক্কতার মনে হবে মনে হবে শুদ্ধ নন্দনের চেয়ে সেখানে কাঁচা স্লোগান অনেক বেশি কিন্তু যে তরুণ স্বপ্নিলেরা ক্ষণকালের ছন্দ নিয়ে সাহিত্য করেছিলেন মূলত সত্তরদশক প্রকাশের অভিপ্রায়ে এবং জীবন দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মর্যাদা তাদের কবিতার মাপকাঠি শিল্প নৈপুণ্যের প্রথাগত কেতাবে না থাকাই সম্ভব নিরন্ন বধির পরিপার্শ্বকে নিজেদের কথাগুলি শোনাতে এরা কখনো কখনো কর্কশভাবে গলা চড়িয়েছেন যেমন সত্তরের শহীদ কবি আর এক শহীদ বাদা আন্দোলনের মৃত কিশোরকে স্মরণ করেছেন 'পড়ে আছে নুরুলের শব' কবিতায় :

> 'পৃথিবীর শেষ স্বপ্নে পড়ে আছে নুরুলের শব
> মাছি শুধু একা একা উড়ে যায় দুপুরের ঘ্রাণে
> মানুষের কাছে বাদা চেয়ে চেয়ে হয়েছে নীরব
> বুলেট দিয়েছে বাদা অসম্ভব কিশোরের প্রাণে।'
>
> (প্রোলেচার্য ঘোষের কবিতা সম্পাদনা-রতন শিকদার)

এই কবিদের উল্লেখ ছাড়া সত্তরের সমগ্রটা মূর্তি হয়ে উঠতে পারে না। যেহেতু এরা ইতিহাসেরই অংশ। তখন মৃত্যু ছিল হাতের মুঠোয়। কোন স্বর বন্ধ করে তাকে রুখবে মানুষ? তাদের বাঁচার কথা ছিল না। তবু কবি কবি কেমন করে বেঁচে গেলেন। রাজনৈতিক শত্রু আর রাষ্ট্রীয় সেনার সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্যেও কী করে যেন বেঁচে গেলেন তাঁরা। জ্যেষ্ঠ কবি সমীর রায় লিখলেন, বলাবাহুল্য ছোট্ট মাপ। সুজন সেন লিখলেন থানাগারদ থেকে মাকে। রাজনীতির নিজস্ব বোধ হয় উঠলো সেখানে কবিতার সৌন্দর্যের নির্মাণ যেমন

'তুমি তোমার দু চোখ ভরে আগুন ধরে রাখো
হৃদয়কলস পূর্ণ করে রাখো প্রবল ঘৃণা,
বীজ ও মাটি শস্য দিয়ে বাঁচাই রাখো
প্রেমিক আমায় বলবে তুমি দেশপ্রেমিক দিনার

(অনুরোধ : থানাগারদ থেকে মাকে)

যখন জন্মভূমির মাটি বধ্যভূমির কাদায় পরিণত, সেই ভয়ানক রাজনীতিহীনতায় নবারুণ ভট্টাচার্য লিখলেন 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'। স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের দ্বিমুখী টান এই সব কবিতায় ভাষাশরীর পেয়েছে। রাজনৈতিক প্রত্যয় এবং ক্রোধসৃষ্টিকারী মাত্রা সুনীল পাঞ্জার কবিতাতেও। সমাজের ভবিষ্যৎ ভাষ্য কল্পনা করতে গিয়ে উঠেছে কবিতার কাঙ্খিত উচ্চারণ। যথা—

"অনির্বাণের দিদির চিঠি পাই
তেসরা জুনের বিষণ্ণ বিকেলে
তোমার বন্ধু আর নেই
পয়লা মে'র ভোর রাতে
প্রেসিডেন্সী জেলে—"

('প্রেসিডেন্সী জেলে বন্ধুকে' থেকে ধ্বনিরূপ)

সেই সময়ের একদিন প্রতিদিন ঠিক এই রকম স্থিরচিত্রের মতন কবে না কিছুটা কৌণিক প্রতিচ্ছায়া গায়ে মেখে উঠে এসেছে সবাসাচী দেব এর কবিতায়। তাঁর 'প্রতিশ্রুতি সময় স্বদেশ' এই সময়ের ক্রোধ এবং কামনা দিয়ে গড়া।

।। চার ।।

সত্তরের যে কবিরা আজ বিশেষভাবে স্বীকৃত, তাদের লেখায় রাজনীতি এবং সমাজবীক্ষণ একটু জটিল সংশ্লেষ রচনা করেছে। একটা প্রতিবাদের লগ্ন ছিল যখন প্রতিবাদ না করাটাই হত অপরাধ। তারপর যখন স্বদেশের বুকে রক্তরাগ একটু যেন ফিকে, প্রশমিত তার স্নায়ুর প্রবাহ। সেই স্বাভাবিক সুস্থতা আর সুস্থিতির ঋতুতে সত্তরের রাজনৈতিক কবিতার কণ্ঠস্বর বদলে গেল প্রত্যাশীর স্বপ্ন-নির্মাণে। এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রণজিৎ দাশের কবিতায়, যেমন :

মাটি ও সূর্যের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শেফালিশাখা তাই বেয়ে বেয়ে
প্রজাপোকাটির সঙ্গে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক তারই মতো
স্কুল ও মন্ত্রণা ও পাখিদের বাসা হয়ে আত্মবিষ সহ
যদি তার মতো কোনও অবিশ্বাস্য রূপান্তর পেয়ে যাই, শুধু এই লোভে।'

রাজনীতির মূলগত প্রেরণা অথবা তার মৌলিক উপাদান না বদলেও সত্তরের শেষ থেকেই অধিকাংশ সত্তরের কবির কবিতায় রূপান্তরের রং লেগেছিল। হয়তো তাই পরবর্তী কালে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন সৃজনের স্বতন্ত্র ধারা। উত্তর আধুনিকতা কিংবা প্রতি কবিতা, অথবা নারীবাদী বিতা ভাষ্য এই সময় তাদের চর্চার বিষয় হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে, তবে আগের মতো সোজা সরল রেখায় নয়। তাদের ঘুরপথে। ফলে কবিতার অবয়বে বিচ্ছিন্ন স্বভাবের ছাপ পড়েছে। যেমন কবি নির্মল হালদার যখন বলেন, 'বাবু মশাই আমি নির্মল হালদার' তখন তাঁর শ্লেষ অবস্থান চিহ্নিত হয় সেই সচেতন অভিপ্রায়ে। এই কবি অতঃপর যখন লেখেন 'অন্নমপিগুদ', যখন লেখেন :

"মাটি বিক্রি করতে গেলে মনে হয়
মাকে বিক্রি করছি
মায়ের চোখ নেই মুখ নেই হাতপা নেই
মা কেবল বুক পেতে দিয়েছে
এক কুড়ি মাটির দাম আটা আনা।"

সেটা তখন অনুপ্রসঙ্গক্রমে শহরবাসের গ্লানি, হৃদয়হীন নাগরিকতা এক জাতীয় বৈরী সময়ের স্বপক্ষ কখন হয়ে ওঠে। এই যে উচ্চারণ এর আড়ালে থাকা সময় ও সামাজের রাজনৈতিক মূল্যায়ণ পাঠকের আলোচনার বাইরে না। লক্ষ্য করা গেছে, সত্তরের অনুজ কবিদের লেখালেখির মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আগুন ক্ষীণ, এমনকি নির্বাসিত। কারণ বাবত কবিতায় তা নীতিস্পৃষ্ট অভিজ্ঞায় ফেলে পড়েছে। সুবোধ সরকারের একটি কবিতা বইয়ের নামে স্পষ্ট সেই নির্দেশচিহ্ন, 'রাজনীতি করবেন না'। তাঁর 'মরুভূমির গোলাপ' গ্রন্থের প্রথম কবিতা এইরকম :

" মাছ আলা কবিতা পড়ে না
মধু বিক্রেতাও কবিতা পড়ে না
মুমূর্ষু কিশোর, তাই তুমিও পড়ো না
জ্যোতিবাবু কবিতা পড়ে না।" (রাক্ষস খোক্ষস)

অ্যান্টি পোয়েট্রির সোচ্চার সমর্থক এই কবির এই অ্যান্টি পলিটিক্স হয়তো সত্তরের ক্রমাগত ভাঙাঘাতের এক প্রতিক্রিয়া বাক্যগাঁথা। একদিকে যেমন দ্রোহাত্মক উচ্চারণমালা স্তিমিত হয়ে আসছে, অন্যদিকে হৈরী যৌনতা ও হিংস্র অবচেতনের আখর মালা। অনন্য রায়ের সুররিয়াল সৌন্দর্য নির্মাণে তুষার চৌধুরীর স্ববিরোধী, সংকর চিত্রকল্পের বুদ্ধিদীপ্ত কারুকাজে।

এই নতুন নির্মাণ পথের দুই অসমান্য ক্ষমতাবান উত্তরসূরী জয় গোস্বামী এবং মৃদুল

গোস্বামী এবং মৃদুল দাসগুপ্ত। মৃদুলের 'জলপাই কাঠের প্রজন্ম' কিংবা 'এভাবে কাঁদে না'তে রাজনীতি দৃশ্যত নেই। আছে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। জয়ের কবিতাতেও অতি অনুভূতিশীল এক তরুণের পছন্দ অপছন্দের দুনিয়া মায়াবী আলো আঁধার নিয়ে উপস্থিত। সেখানে অনুপুঙ্খ বচনার অনবদ্য শক্তির সঙ্গে মিলেছে সুবিন্যস্ত ভয় ও ত্রাসের ধ্বনি— কখনো কখনো। উদাহরণ হিসেবে 'প্রত্নটীব' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা উদ্ধৃত হল :

'মুখ নেই পেট নেই। শুধু এক আস্বাদ
জেগে আছে। আরকের মধ্যে
শুয়ে আছি সারাদিন, সারাদিন
পাহাড় সুপুরি গাছ, শাওলা ও কুয়াশার
মাঝখানে থরথরে পেন্সিল (প্রত্নটীব : জিন্ন)

ভয়ঙ্কর ছিন্নমস্তা বক্তব্যটা এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেছে যে কিশোর তার স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নে এই ছেঁড়া খোঁড়া অনুভব অস্বাভাবিক নয় হয়তো। হয়তো এও একরকম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া। বিপরীত আবেগে ভারসাম্যহীন মেদুরতাই তার স্বভাব। আমরা দেখবো, এরকম প্রত্যাখ্যানের পথ ধরেই আশি নব্বইয়ের কবিতা প্রধানত হেঁটে এসেছে এবং তাদের কাছে জয় গোস্বামী একজন আইকন, মাইল ফলক।

।। পাঁচ ।।

আশি নব্বই, আশি নব্বই। এভাবে দুটো আলাদা দশকের কথা বারবার একসাথে উল্লেখ করা হচ্ছে কেন এই জিজ্ঞাসা অসঙ্গত নয়। আসলে গত পনেরো বিশ বছরে সত্যিই এদেশের আর্থরাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড়ো কোনও পরিবর্তন হয়নি। সামন্তধর্মী ফ্রন্ট সরকারের শাসন প্রক্রিয়া যেমন একই রকম থেকেছে, গ্রাম শহরের শ্রেণী বাস্তবতাও মূলত একই রকম থেকেছে, মাঝে কলকারখানা একটু একটু করে বন্ধ হয়েছে, বেকারী বেড়েছে, নগর ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে তার আয়তন, গ্রামীণ পরিবেশেও এসেছে নাগরিক দূষণ— শ্রমিকটাদের হয়েছে পোয়াবারো, জমির দালালি আর তোলাবাজি এক নতুন পেশা হয়ে উঠেছে—কোথাও কোনও সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ বিনা সন্ত্রাসের মতো বড়ো মাপের আন্দোলন আশি নব্বই দাবিয়েছে। দেখেছে মূলত শান্তির বাতাবরণ। দেখেছে কেরানিকুলের চমৎকার বাড় বৃদ্ধি, বর্ধিত মহার্ঘভাতা, কমপিউটার স্কুলে বাধ্য বালকের নিরুত্তাপ যাত্রা। এই অভিন্ন আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল আশি নব্বইয়ের কবিতাকে একটি অভিন্ন বন্ধনীর মধ্যে রাখতে পরামর্শ দেয় আমাদের। একই রকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা এই দুই দশকের কবিতার কথাভাষাও মোটামুটি একই রকম। পার্থক্য আছে হয়তো, কিন্তু তা যৎসামান্য।

সমাজের বুকে আগুন না থাকলে কবিতার মধ্যে তার উত্তাপ থাকবে কি করে? আন্দোলন বিমুখ আশি নব্বইয়ের কবিতায় রাজনীতি আবেগ কমে গেছে, কোথাও কোথাও শাসকের রাজনীতি হয়েছে বিদ্রূপবিদ্ধ। এই সময়ের প্রধান কবিদের একটি সম্ভাব্য তালিকা

এখানে প্রস্তুত করা হল :

আসরের প্রধান পুরুষ	প্রধান মহিলা কবি	নকশালের প্রধান পুরুষকবি	প্রধান মহিলা কবি
১ রাখাল পুরকায়স্থ	১ মহাশ্বেতা সরকার	১ বিমলেন্দু হালদার	১ মন্দাক্রান্তা চৌধুরী
২ জয়দেব বসু	২ সুকন্যা সরকার	২ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	২ শীলভদ্র সেনগুপ্ত
৩ অরুণাভ ভট্টাচার্য	৩ উজ্জ্বলী চট্টোপাধ্যায়	৩ বিমলেন্দু সরকার	৩ মন্দাক্রান্তা সেন
৪ অরুণ সেন মজুমদার	৪ মহুয়া দিনেশ	৪ অমিতাভ মিত্র	৪ সেমন্তী মিত্র
৫ সুবীর পাল	৫ মহুয়া বিশ্বাস	৫ কণক চক্রবর্তী	৫ কাকলী মিত্র
৬ নাসের হোসেন	৬ কল্পা সেনগুপ্ত	৬ সুচিত্রিত সরকার	৬ মৌলি মিত্র
৭ শুভ্রদেব চক্রবর্তী		৭ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য	
৮। সুমন্ত		৮। রমেন চট্টোপাধ্যায়	
৯। রক্তসমুদ্র ঘাটী		৯। রত্নশর্মা	
১০। অমিতাভ মৈত্রী		১০। বরাভয় মুখার্জী	
		১১। আনন্দ কুমার চিনি	
		১২। সুদীপ্ত মাজি	

লক্ষ্য যদি কবিতায় রাজনৈতিক ভাষা হয় মেনে নেওয়া ভালো আশি নব্বইয়ের দুয়োর রাজনৈতিক কবিতার নিশানা জয়দেব বসু জয়দেবের মেধাদৃপ্ত কিংবা ক্ষীণপাতা ঝরার বলায় যেন রাজনীতির এক বিপরীত প্রহরের আত্মদ্রুত প্রহরী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ হয় এই কবি আদি কবে মেনে নিয়েছেন ক্ষেত্র বিশেষে কবিতায় স্বাতন্ত্র্যসৃজনের পরিবর্তে যার দক্ষ কারিগরি অধিকারীজনের অজানা থাকে না তবে জয়দেব তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে একলোকা সবকারপন্থী বাসনালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই যে সময় পূর্ব ইয়োরোপ সমেত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র চোখের সামনে ভেঙে পড়লো সেই শ্রবণের শেষ এবং নব্বইয়ের শুরুর ক্রান্তিলগ্নে এদেশ এভাষায় সেই ভাঙনের কোনও মহৎ প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি কি? কবিতায় সমকালীন কবিদের কথায়। না, সেভাবে দেখিনি আশ্চর্য এই যে সব কিছু এই সময় কেমন অদ্ভুত গা সওয়া হয়ে গেছে - কোনও কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না আর এই নীরবতা আর শীতল সহনশীলতা কী এক ধরনের রাজনীতি নয়?

ঠিক এইরকম পটপ্রেক্ষিতে জয়দেবের 'সৌতিকথন' কবিতাটির তাৎপর্য আরও অসামান্য মনে হবে ইতিহাসের দুরন্ততম প্রান্ত থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার এই পতনের একটি অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছেন কবি খুব কী অতিরঞ্জন হবে যদি বলি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংবর্তের পর রাজনৈতিক দীর্ঘকবিতার এই জাতের মননশীল উন্মোচন আমরা 'সৌতিকথন'ই পেলাম আমরা 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মাথায় রেখেই একথা বলছি।

এই সময়ের অন্য প্রায় সকলের কবিতাতেই রাজনীতি এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার সমালোচনা হয়ে। এটা হয়তো অস্বাভাবিক নয় নকশালের বিশিষ্ট কবি শিবাশিষ মুখোপাধ্যায় এই সূত্রে এমনকি সুকান্তের চেনা কবিতাকেও কিছুটা অনুসঙ্গে বদলে নিয়ে লেখেন :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যাতে
সোনা ছিল [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে বিয়োলো
সুরমা
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেউ না
কোমরেশ
ইতিহাস [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ''

রাজনীতি যখন কবিতার সাম্প্রতিকের সেই [illegible] [illegible] কবি নিজেহারা [illegible] তার [illegible] [illegible] মুখ আর [illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible] নির্ভীক কবিদের বৃহৎ সংবাদপত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিক্রিয়াশীলতার চরিত্রও দুটি ভাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবি আর [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কবিতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি সাম্প্রতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ সময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যথার্থ রাজনৈতিক কবিতা [illegible] [illegible] [illegible] ক্রমশ [illegible] [illegible] এবং [illegible] হয়ে যাচ্ছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

|| ছয় ||

তিন দশকের [illegible] যখন নারীবাদের [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে নিয়ে নতুন ভাবনা এলেন তাঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ছিলেন না। বাংলা কবিতার এই নিরঙ্কুশ পুরুষতন্ত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নতুন মাত্রা সংযোজিত নারীকবিদের সংখ্যাগত বাড়বৃদ্ধিই শুধু নয়, তাঁদের কবিতার নান্দনিক উৎকর্ষও পৃথক আলোচনার গুরুত্ব দাবী করে।

অথচ নারীকবিরা রাজনীতির প্রচলিত ধরনে সাধারণত কবিতা লেখেননি না বরং পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি এবং তার সুবিধাভোগী [illegible] প্রতিবাদের প্রধান বিষয় হল। যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নারীর পরিত্রাণহীন সামাজিক অবস্থানের জন্য তাঁরা পুরুষতন্ত্রের [illegible] আগ্রাসনকে চিহ্নিত করলেন। ফলে তাঁদের নারীবাদী কবিতায় রাজনীতি এক নতুন মাত্রা এবং চেহারা পেয়েছে। এই সময়ের একজন প্রধান কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লেখেন :

'মজুরী যা পাই তার আধাআধা বাবু নিয়ে যায়
পরদিন এও মেয়ে আবার নেচে যাই ইন্দ্রলোকে
প্রথম ইন্দ্র ছিল পাশের বাড়ি [illegible]
মাটির তলার দেশ নেপালের নাম জানে সেই
এখানে আসবে এই সোনাগাছি, গাছি গাছি টাকা।'' (আবিয়া)

আজকের এই পণ্যমনস্ক পৃথিবীতে নগরের সমস্ত [illegible] বাস্তবীমুখীকেও বিকৃত এবং বিকট করে তুলে কবিতা লেখার নাম পণ্যসংস্কৃতি অনায়াসে সময়ের চতুর রাজনীতি নগরের কোন স্বকীয়তা তুলে নিজের বশে করতে চায় তা তাঁর একাধিক কবিতার উপজীব্য। আমাদের প্রাণপুরুষ কলকাতা তাঁর আত্মকেন্দ্র লগ্ন হয়ে থাকায় ভ্রান্ত বাসনাগুলি বিশেষ তুল সংগ্রহ কবিতায় নিরূপণ করেছে এই ভাষায়

> [illegible]
> [illegible]

> সময় এখন মসৃণ পশুদেশের
> সার্বিক সাফল্য লক্ষ্য করে [illegible]
> কেন না তুক সম্ভব হয় [illegible]
> কেন না তুক।"

এখানে অবসীলায় কবি বাজার [illegible] মধ্যে [illegible] সঙ্গে নির্বস্তুক এবং বর্ণাভিত্তিক রাজনীতির আগ্রাসনের [illegible] এই সময়ের [illegible] নারী কবির কবিতাতেই দয়া ও [illegible] এই [illegible] হয়েছে [illegible] রাজনৈতিক কবিতার এক অবশ্যই নতুন দিগন্ত।

।। সাত ।।

[illegible] আবেগে [illegible] চলে যায় [illegible] জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবি [illegible] সঙ্গে নিয়ে সত্যি সত্যি বিশশতকের নিষ্ক্রমণ ঘটিলো। বিশ্বায়ন [illegible] উত্তর আধুনিকতা ই কমাস [illegible] কবিতায় রাজনীতির উপাদান [illegible] কোলকুরেজ, কলোনিয়াল আইডেনটিটির অনুষঙ্গ [illegible] যেভাবে সত্তরে বজ্রনির্ঘোষ [illegible] আঁধারের গাঢ় নিকষেশে হারিয়ে যাওয়াই [illegible] আমরা অপেক্ষায় রইলাম। একবিংশের বাংলা কবিতা অপেক্ষায় থাকলো।

বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিনের ইতিবৃত্ত

সন্দীপ দত্ত

বাংলাভাষায় কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক কবিতার আন্দোলন, সংশ্লিষ্ট ভাষায় যদিও শুরু হয়েছিল, এর নক্সাকে তবু বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাস কবিতাচর্চার যে রূপ ধরে ছিল সেটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাভাষায় প্রকাশিত ৭ খানি সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপন সংবাদ পারিজাত সম্পাদকীয় সমেতই প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম 'সংবাদ নৃতনচন্দ্রিকা'। সম্পাদক প্যারীচরণ দাস। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বাংলায় বাংলা সাময়িক পত্রের পথ চলার শৈশবের বাধাবিঘ্নের পরিচয়ের একটি [illegible] দিক লক্ষ্য করি। ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত কবিতা কুসুমাবলী মাসিক পত্রিকাটি সম্ভবত একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাগজ। অনুর শহরে এর কবি কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকাটির সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষ সাধন ও বিষয়ক কবিতাবলী প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্ধনই এতৎ পত্রিকার উদ্দেশ্য। বাংলা কবিতার উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল কিংবা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্ধন হয়েছিল কিনা তা বিচারের বাকি। তবে এটি ঠিকই এতজন কাগজের মধ্য দিয়েই কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে বহুমুখী উত্তরণের সাধনের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ১৮৬৮ সালে ঢাকা কালেজের ছাত্র সাহিত্যরত্ন সন্ত চিত্তরঞ্জিনী নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যথারীতি উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ও অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ প্রকাশ পেত। এছাড়া এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কাগজের কাব্য প্রকাশ (১৮৬৪) পদ্য প্রকাশিকা (১৮৬৮), বীণা (১৮৭৮), কুসুম (১৮৭৮), মুকুল (১৮৭৮), কিরণ (১৮৮৩) প্রভৃতি। আধুনিক কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কবিতা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিনের বহুমুখী সাধ্য হবে আনুমানিক দুশো। এই যে শুধু কবিতা ও কবিদের কাগজ এর প্রথম শুরু কবিতা (১৯৩২) পত্রিকার মাধ্যমে। কবিতা পত্রিকার প্রকাশের পেছনে আছে একদিকে প্রতিবাদী ও অন্যদিকে সাংগঠনিক ভাবনা। বাংলাভাষায় প্রকাশিত বেশিরভাগ পত্রপত্রিকায় কবিতার স্থান ছিল তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যে। গল্প বা উপন্যাসের শেষে পাদপূরণ করতেই যেন সাইপদী বা চতুর্দশপদী পদ্য বা কবিতা। সম্পাদক (') কখনো বা আত্মপ্রচার কাল কাঁচি নিয়ে কেটে যতটা লাইন প্রয়োজন কৃপা করে জুড়ে দিতেন। এরই প্রতিবাদ কবিতার আত্মপ্রকাশ। পাঠশালী পত্রিকার গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস টুকিটাকি খবরের ভীড়ে হারিয়ে যেত কবিতা, যদিও একথা ঠিক যে 'কবিতা'র আগে প্রকাশিত কল্লোল (১৯৩২) কালিকলম (১৯২৬) পরিচয় (১৯৩১) পূর্বাশা (১৯৩১) কবিতার মর্যাদা দিয়েছিল যথাযোগ্য ভাবেই। তবু কবিতা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও কবিতার ইতিহাসে এটি বিশিষ্ট

অধ্যায় পত্রিকার শুরুতে প্রথম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক হিসেবে ছিলেন সমর সেন। পরে বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন সম্পাদক থাকেন ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত। এরপর বুদ্ধদেব বসুই কবিতার সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থাকেন। সম্পাদক হিসেবে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। কবিদের কবিতা প্রকাশের জন্য যে পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা হ'ল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আসা কবিতাগুলি তিনি নিজে পাঠ করে মন্তব্য লিখতেন। সম্ভাবনাময় কবিকে উৎসাহিত করতে অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠিয়ে অন্য কবিতা চাইতেন। অথবা কবিতার লক্ষ্য বা ভাবগত ভুল ত্রুটিগুলি যতটা সম্ভব ঠিকঠাক করে কবিকে দিয়ে পরিমার্জিত করে তবে সেই কবিতা প্রকাশ করতেন। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী সহিত্য ভাবনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটানোর দায়িত্ব নিয়েছিল পরিচয় পত্রিকা। কবিতা পত্রিকা বিদেশী কবিতার সঙ্গে পরিচয় করানোর দায়িত্ব নিয়েছিল অনুবাদ ও বিদেশী কবিদের সম্পর্কে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংখ্যা মার্কিন সংখ্যা ইংলিশ সর্পিমেন্ট সংখ্যা জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা আন্তর্জাতিক সংখ্যা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যা।

'কবিতা' পত্রিকার ধারায় পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রকাশ পেল প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিরুক্ত' পত্রিকা (১৯৪০)। আধুনিক কবিতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'নিরুক্ত' একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ৫ বছর স্থায়ী [illegible] কবিতা ছাড়াও অনুবাদ কবিতা প্রবন্ধ সমালোচনা প্রকাশ পেত। তৎকালীন প্রায় সব কবিরাই কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু সমর সেন কাজী নজরুল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিতা গোষ্ঠীর কবিরা 'নিরুক্ত'তে কোনো রচনাই দেননি। অর্থাৎ আধুনিক কবিতার যারা বিরোধী ছিলেন তাদের লেখা 'নিরুক্ত'তে ছাপা হতো। কবিতা গোষ্ঠীর নিরুক্ত আক্রমণ করাও হয়েছে সম্পাদকীয়তে। বলার কথা এই কবিতার অন্যতম প্রধান সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কবিতা' ছেড়েছিলেন মতানৈক্যের বিরোধিতার কারণে।

সমসাময়িককালে উল্লেখযোগ্য কবিতা বিষয়ক পত্রিকা শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকা (১৯৪১)। একক কবিতার নিজস্ব পত্রিকা। প্রায় ৫ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশ পেয়েছিল সম্পাদকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। পরেও দুটো সংখ্যা প্রকাশিত। একটি বিশ্ব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির তোয়াক্কা না করে বিক্রির ফললাভের আশা না করে বিজ্ঞাপন না পেয়ে শুধু কবিতাপ্রেমের এই স্বীকৃতি প্রণিত করে বাংলাভাষার লিটল ম্যাগাজিনের গৌরবকে।

৫ এর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিতা পত্রিকা অলোক সরকার, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্র সম্পাদিত 'শতভিষা' (১৯৫১) পরে অভিরূপ সরকার ও সুবাতিৎ ঘোষ এবং শেষভাগে মৃণাল দত্ত পত্রিকাটি কয়েক বছর সম্পাদনা করেন। এই দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিন 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩)। সম্পাদক ছিলেন দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী ও সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে শেষোক্তজন সম্পাদনা করেন। নানা

সময়ে অনেকেই সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। 'কৃত্তিবাস' প্রকাশ পায়েছিল তরুণ কবিদের মুখপত্র হিসেবে। প্রতিষ্ঠিত বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের পুরস্কৃত হওয়া হয়েছে। কবিতা নয়, তরুণ কবিদের টুটকা কবিতায় কৃত্তিবাস সাহিত্যের ছোটগল্প কবিতায় পৃথিবীর কিছু কবিতা অতি দ্রুত লেখা হচ্ছে। কৃত্তিবাস মূলত কবিতাপত্র কাগজ ছবি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গল্পকারও। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প প্রকাশ পেয়েছে কৃত্তিবাস। একটা 'প্রতি' সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কলমকুমার মজুমদারের 'সুহাসিনী পমেটম'। তবে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় গল্প ছাপার অবকাশ বিশেষ ছিল না।

৭ এর দশকে এই দুটি কাগজ 'কবিতা' ও 'কৃত্তিবাস' পর ৫ দশক ধরে প্রকাশ পেয়েছে। পাঁচের দশকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিন তরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'উত্তরসূরি' (১৯৫৯), মণীন্দ্র রায় ও অমলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সীমান্ত' (১৯৫৬), জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মুখ' (১৯৫৬), কার্ষ্ণ সেন সম্পাদিত 'কবিপত্র' (১৯৫৭)। 'উত্তরসূরি' বিজনকুমার রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রবন্ধ পত্রিকার কাগজ হিসেবেই প্রকাশ পায়। পরে তরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদক হওয়াকালীন কবিতাপত্র হিসাবেই প্রকাশ পায়। এদের জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সীমান্ত' ১ম পর্যায় প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত, ২য় পর্যায় ১৯৮৬ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম কবিতা 'সীমান্ত'। 'মুখ' জীবনানন্দ'র সহ কবিতা প্রকাশ করেছে। এদের জীবনানন্দ সংখ্যাটি আজও গবেষক পড়ুয়ার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে। 'কবিপত্র' আসলে প্রকাশ করেছিলেন, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, নিজেই। নানা সময়ে সম্পাদনার সূত্রে জড়িয়ে ছিলেন অনেকেই। কার্ষ্ণ সেন ছিলেন সাহিত্য উৎসাহী পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িওলা। শুধু সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তাঁরই নাম রেখেছিলেন। পরে 'কবিপত্র'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন তরুণ সান্যাল, তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, কখনো শৈবাল মিত্র, কখনো সমর চট্টোপাধ্যায়, কখনো সৌমিত্র বসু। ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে আজও কবিপত্র প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমানে বেশিষ্ট্যকৃত নাম কবিপত্র প্রকাশ গল্প সংখ্যা, শিল্প সংখ্যা, বিষ্ণু দে সংখ্যা এবং প্রকাশ করেছিলেন। ৮ এর দশকে ফাউ লিটলমেগাজিন আন্দোলনে 'কবিপত্র প্রকাশ' যুক্ত হয়।

বাংলা কবিতার লিটল ম্যাগাজিন ৬০ ও ৭ দশক বিশিষ্ট অধ্যায়। এই সময় পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, মফস্বলের ও গ্রামবাংলা থেকে কবিতা পত্রিকা প্রকাশের হার বাড়তে থাকে। কালকূটীটের রুচি হাইস্কুল মফস্বলের তরুণ কবিদের ভীড় বাড়তে থাকে।

৬ এর দশকে কত বলবেন যে পত্রপত্রিকা বেরিয়েছেন। একদিকে যেমন কবিতা পত্রিকা বেরোচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায়, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিন দিনে (কবিতা ঘন্টিকা, কবিতা সাপ্তাহিকী, কবিতা টেলিগ্রাম, দৈনিক কবিতা, কবিতা সাপ্তাহিকী প্রভৃতি)। অন্যদিকে চলেছে হাংরি, নাক্সালবিরোধী, ধ্বংসকাণ্ডীলন প্রভৃতি সাহিত্য আন্দোলন।

৬০-এর দশকের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের লিটল ম্যাগাজিন কম নয়। এগুলি হল যোগেন চৌধুরী, গৌরীশঙ্কর দে ও সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নান্দীমুখ' (১৯৬০), প্রফুল্ল কুমার দত্ত ও সুবল দত্ত সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' (১৯৬০), রোহিণী চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা' পত্র (১৯৬০), সুশীল রায় সম্পাদিত 'ধ্রুপদী' (১৯৬০), সামসুল হক ও প্রতিমা কর সম্পাদিত 'নক্ষত্র' পত্র (১৯৬০), দুর্গাদাস সরকার ও দিলেন দাস পরে শান্তনু দাস সম্পাদিত 'ঘাসফুল' (১৯৬১), প্রকাশ ভট্টাচার্য ও অরুণ কুমার সরকার সম্পাদিত 'উচ্চারণ' (১৯৬১), অসীমকৃষ্ণ দত্ত সম্পাদিত 'কবিকণ্ঠ' (১৯৬৩), শান্তিপ্রিয় ঘোষ ও মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' (১৯৬৪), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'অলিন্দ' (১৯৬৪), পুষ্কর দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'স্বর্ণ' (১৯৬৫), আনন্দ ভরদ্বাজ সম্পাদিত 'সিংহাসন' (১৯৬৫), জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' (১৯৬৫), শ্রীরাজ ভৌমিক সম্পাদিত 'অনুভব' (১৯৬৫), শুভঙ্কর ঘোষ ও অভিজিৎ সরকার সম্পাদিত 'অঙ্কুর' (১৯৬৫), বিমল রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'ঐকিক কবিতা' (১৯৬৫), মেধিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কড়চা' (১৯৬৫), শঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা সাপ্তাহিকী' (১৯৬৬), অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'কবিতা পত্রিকা' (১৯৬৬), মণিক রায় সম্পাদিত 'ঝা পত্রিকা' (১৯৬৬), বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'প্রবা' (১৯৬৬), বাণী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ত্রিবেণী' (১৯৬৭), মণিক চক্রবর্তী সম্পাদিত 'নিবেদন' (১৯৬৯) প্রভৃতি।

বর্তমানে যে পত্রিকাগুলি [illegible] এরকম সেগুলি হলো নান্দীমুখ (বর্তমান সম্পাদক ত্রিদিব চৌধুরী, নমিতা চৌধুরী), আধুনিক কবিতা, কবিকণ্ঠ, কড়চা ও ত্রিবেণী।

ষাটের আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী [illegible] ছিল কবিতা লিখে। ১৯৬১ সালে বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে এর শুরু। এদের মতে [illegible] মানবিক বিচ্ছিন্ন সার্বিক যন্ত্রণার বাহনই ভাষা। ভাষা শব্দে কোন শুদ্ধিমার্গিতা থাকবে না। যাহাই আক্রমণাত্মক কথা যায় তাই হবে। আমার মুক্তি ও সৃষ্টির সমস্তই বড় কথা।

প্রতি আন্দোলন বাস্তু নিরোধী আন্দোলনেরই অঙ্গ। প্রথম সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছিল না। প্রবক্তা : পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রমুখ। মৃণাল বসু চৌধুরী এদের মতে কোন রকম ব্যাখ্যা বিধান না করে পাঠকের দায়িত্ব বাস্তবতার প্রতিনিধি সমাজিকতা, যৌনকাতর জৈবনকতার স্থান কবিতায় নেই। কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবি বিশেষ মানসিকতা ও অভিজ্ঞতা।

ধ্বংসকালীন আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৬ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে। এদের মতে 'আমরা যা তাই আমাদের কবিতা', অমরা যা নই তা আমাদের কবিতায় নেই। অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য।

আর একটি আন্দোলন শুরু হয় ৬০-এর দশকের শেষে প্রকল্পনা সর্বাঙ্গীন কবিতা আন্দোলন (১৯৬৯) ভট্টাচার্য চন্দন, দিলীপ গুপ্ত ও শুক্লা মজুমদার স্বতোৎসার কবিমেলা

পত্রিকার মাধ্যমে এই কবিতার আন্দোলন শুরু করেন। এদের বিশ্বাস সাহিত্য স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য প্রবাহের (Stream fo cosciousnes, যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing)।

সুনীল রায় সম্পাদিত 'কৃপণ' মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কেন্দ্র করে নানা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। কবিতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে মূল্যবান প্রবন্ধ। অশ্বিনী লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা কবিতার মনীষা ঘটক সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা কবিতা প্রতি সংখ্যায় নির্ধারিত কবির পরিচিতি প্রকাশ করতেন কবির স্কেচ সহ। বাংলা কবিতার তরফে প্রথম আধুনিক কবিদের নিয়ে এই প্রথম বড় প্রকাশ পায়। 'কবিতা' পত্রিকাটি অনুবন্ধায় বিশেষ চমৎকার। এরা নির্দিষ্ট বিভিন্ন সময়ের কবি সম্মেলনের আয়োজন করতেন। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি ও কবিতা নিয়ে কবির কবিতাসূচক প্রকাশ করেছেন নিয়মিত। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ পেত 'কবি ও কবিতায়' বণিক রায় সম্পাদিত 'লা পয়েট্রি'র মিথ অভিধান প্রতীক বিদেশী কবিতা নিয়ে মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এরা বাংলা কবিতার উচ্চারণকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এ বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যা টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, শব্দ ও ধ্বনি সংখ্যা, কবিতা পরিচয় বিভিন্ন কবিদের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা ও মতামতের উত্তপ্ততা ছিল। নকসালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের জন্ম, প্রেসে ছাপানোর মূল্যবৃদ্ধি, কাগজের দাম বেড়ে যাওয়া জরুরী অবস্থা পরবর্তে বামফ্রন্টের পতন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের প্রকাশ, ঘটনাগুলি একে একে ঘটিতে থাকে।

পত্রিকা স্টলগুলি ভরে থাকত থাকে মিনি পত্রপত্রিকায় কবিতার মিনি ম্যাগাজিন ও বেরোতে থাকে। ৩ এর দশকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতার লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হলো অশ্বিনী সান্যাল নির্মল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অনাদিন' (১৯৭০) বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অদিষ্ট' (১৯৭০) অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত মাসিক বাংলা কবিতা (১৯৭০) শান্তিকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'কবিতা এবং কবিতা' (১৯৭০) পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্তরের কবিতা' (১৯৭০) সত্যরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'কঙ্কাল' (১৯৭০) পলাশ মিত্র সম্পাদিত 'জীবনানন্দ' (১৯৭০) মনীন্দ্র গুপ্ত ও নরেন্দ্র দাশ সম্পাদিত 'পরম্পরা' (১৯৭০), প্রদীপ বসু সম্পাদিত 'প্রতিভা' (১৯৭০) বাপী সমাদ্দার প্রদীপ বসু সম্পাদিত 'আজকাল' (১৯৭০) শম্ভু রক্ষিত সম্পাদিত 'মহাপৃথিবী' (১৯৭০) গৌতম ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেলা অবেলা' (১৯৭০) কার্তিক লোহার সম্পাদিত 'সমকালীন' (১৯৭১) দিব্যশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সাহিত্যচিন্তা' (১৯৭১) প্রদ্যুম্নপ্রসূন ঘোষ সম্পাদিত 'সংবাদ' (১৯৭২) পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল সম্পাদিত 'অক্ষরপুরুষ' (১৯৭৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শায়ক' (১৯৭৩) বেণু সরকার সম্পাদিত 'কবিতা পাক্ষিক' (১৯৭৫) ওয়াজেদ আলি সম্পাদিত 'ধ্বনি তরঙ্গ

(১৯৭৩) অঞ্জন সেন সম্পাদিত 'গাঙ্গেয়পত্র (১৯৭৪) গৌতম চৌধুরী সম্পাদিত অভিমান (১৯৭৪, দীপক কর সম্পাদিত ধানসিড়ি (১৯৭৫) শ্যামলবরণ সাহা সম্পাদিত বাল্মীকি (১৯৭৫) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও নিখিলেশ গুহ সম্পাদিত অন্তরীপ (১৯৭৫) গৌরাঙ্গদেব চক্রবর্তী সম্পাদিত 'তৃণাঙ্কুর (১৯৭৬) মুকুল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত জিরাফ' (১৯৭৬), বৃন্দাবন দাস সম্পাদিত 'আমি' বয়িক উদ্দ আলম সম্পাদিত গ্রহনগর (১৯৭৮) নিরঞ্জন মিশ্র সম্পাদিত 'সুচেতনা (১৯৭৮) অজিত দেব সম্পাদিত এক এক' কবিতা (১৯৭৯) প্রভৃতি

'অন্যদিন' পত্রিকায় বাংলা কবিতার পাশাপাশি প্রকাশ পেত ভারতীয় ও বিদেশী কবিতার নিয়মিত অনুবাদ 'অভিনব' উল্লেখযোগ্য সংখ্যার বিষয় জীবনানন্দ দাশ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পট রবীন্দ্রসঙ্গীত মুক্তা 'মন্দিক বাংলা কবিতা'য় কবিতার পাশাপাশি প্রকাশ পেত কবিতা বিষয়ক নিবন্ধ কবি বিষয়ক আলোচনা 'পরমা ব নির্বাচিত কবিতা সংগ্রহগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিবন্ধ ৭ এর দশকে প্রকাশিত কবিতার লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে যেগুলি আজও প্রকাশ পেয়ে চলেছে সেগুলি হলো কৃত্তিবাস আজকাল (বর্তমানে আজকাল টুইন্টিফোর) মহাপৃথিবী সীমান্ত সাহিত্য গাঙ্গেয়পত্র ধানসিড়ি অন্তরীপ, তৃণাঙ্কুর, জিরাফ আমি গ্রহনগর সুচেতনা এবং।

৮ এর দশকের বাংলা কবি সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত উত্তরসূরি, পত্রিকার প্রচ্ছদে লিখলেন তরুণ তরুণীদের কবিতার প্রতি অরুণ ভট্টাচার্য আবেদন জানাচ্ছেন ১৯৩০ ৮০ পঞ্চাশ বছরের অন্তিম লিখগুলি পাব হয়েছে। বন্ধুগণ এবার আপনারা বর্ষা বেদনার অথবা এরুয়ার মাতৃভূমি থেকে ফিরে আসুন মহাজন পদাবলী আর রামপ্রসাদের কবিতায়, শ্রীমন্ত সদাগর আর নিধুবাবুর গানে ৮ এর দশকে 'কবিপত্র প্রকাশ (পূর্বনাম 'কবিপুত্র) থার্ড লিটলম্যাগ আন্দোলন শুরু করলেন 'অন্ত্রী' পত্রিকার মাধ্যমে শুরু হলো মালোড্রা কালা আন্দোলন। অমিতাভ গুপ্ত অঞ্জন সেন ও বীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ উত্তর আধুনিকতা তত্ত্বটি নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করলেন জনপদ, আলোচনাচক্র সাম্প্রত, লালনক্ষত্র গাঙ্গেয়পত্র ক্যানভাস প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন সংখ্যায়।

৮-এর দশকে কবিতার লিটল ম্যাগাজিন কম প্রকাশ পায়নি বেরোতে লাগল দুফর্মা তিন ফর্মার কবিতার চটি পুস্তিকা এবং নানান ধরনের কবিতার সংকলন এই দশকের উল্লেখযোগ্য কিছু লিটল ম্যাগাজিন ব্রজ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ঋত (১৯৮০) ভগবতী রায়চৌধুরী সম্পাদিত অহঙ্কার (১৯৮০) ধীমান চক্রবর্তী সম্পাদিত 'আলাপ' (১৯৮০), দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'সময়গ্রন্থী' (১৯৮০), সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা কলকাতা (১৯৮০), উজ্জ্বল সিংহ সম্পাদিত 'ঘোড়সওয়ার' (১৯৮০), রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আনন্দম' (১৯৮১) কাজল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সাংস্কৃতিক সংবাদ পেরে 'সাংস্কৃতিক খবর (১৯৮১), শতরূপা সান্যাল সম্পাদিত 'অ' (১৯৮১) নির্মল বসাক

সম্পাদিত ইন্দ্রাণী (১৯৮২) মন্দিরা রায় সম্পাদিত একালের বোধিসত্ত্ব (১৯৮১) উত্তম দাশ ও মৃত্যুঞ্জয় সেন সম্পাদিত মহাকাব্য (১৯৮২) নীলাদ্রি ভৌমিক সম্পাদিত 'অভিষেক (১৯৮৩) নিকাই হালদার সম্পাদিত কালবেলা (১৯৮৩) অসিত সিংহ সম্পাদিত আকবিক (১৯৮৩) প্রণব পাল সম্পাদিত 'সৃষ্টি (১৯৮৩) কার্তিকেয় বসু ও বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্পাদিত কাকেন কাকেকাক (১৯৮৩) স্বপন নন্দী সম্পাদিত কম্পা (১৯৮৩) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত একেবার (১৯৮৩) তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত কলকাতার হ্যামলেট (১৯৮৩) অমরেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত লীকা (১৯৮৩), গৌতম সেনগুপ্ত সম্পাদিত জনপদ (১৯৮৪) সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চমৎকার (১৯৮৪) কুণাল নন্দী সম্পাদিত মুখোশ (১৯৮৪) তারাপদ হাজরা সম্পাদিত সংক্রান্তি (১৯৮৪) কপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নিরুক্ত (১৯৮৫) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দহন (১৯৮৫) মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পী ঘোষ সম্পাদিত স্ফুলিঙ্গ (১৯৮৫) অরুণাভ ভট্টাচার্য সম্পাদিত পাবু (১৯৮৫) দীপেন রায় ও অসিত বসু সম্পাদিত কালের সীমান্ত (১৯৮৬) গৌতম হাজরা সম্পাদিত প্রবর্তিত (১৯৮৬) নবীন সাহা সম্পাদিত কালবেলা (১৯৮৬) সন্তোষ সিংহ সম্পাদিত ঝমাঝম (১৯৮৬) বাসুদেব বসুমল্লিক সম্পাদিত পালকি (১৯৮৭) বাউ (১৯৮৭) স্বপনকুমার ঘোষ ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পুনরায় (১৯৮৭) কল্যাণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নিরুত্তর (১৯৮৭) মলয় মালিক সম্পাদিত অন্তী (১৯৮৮) মানস কুমার গিরি সম্পাদিত মানসিকতা (১৯৮৮) সুভাষ সরকার সম্পাদিত কবিকুঞ্জ (১৯৮৮) গৌতম ঘোষ দস্তিদার সম্পাদিত বজ্র মানস (১৯৮৮) সৈয়দ সমিরুল আলম সম্পাদিত মধ্যবর্তী (১৯৮৯) বুবুন চট্টোপাধ্যায় মলয় মৈত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাত (১৯৮৯) সিদ্ধার্থ সেন ও শঙ্কর দাস সম্পাদিত কাতরব (১৯৮৯) জামিল সৈয়দ সম্পাদিত এমনেও কবিতা (১৯৮৯) প্রভৃতি

বলা বাহুল্য কবিতার মাধ্যমে অনেক কাগজই সময় বেঁধেছে। বর্তমানে এরকম অনেক কাগজই বন্ধ হয়ে গেছে। যেগুলি পুরোনো আছে সেগুলি হলো কবিতা কলকাতা, আনন্দম, সাংস্কৃতিক খবর ও নিহান হন্দ্রা একালের বোধিসত্ত্ব, মহাদিগন্ত নৌকা, জনপদ (বর্তমান সম্পাদক বিলাস বৈদ্য) তৃতীয়ক সংক্রান্তি কবিতা সীমান্ত প্রবর্তিত পালকি কবিকুঞ্জ একেবারে সাত্তা

৯ এর দশকে ছাপাখানায় এলো নতুন প্রযুক্তি DTP পুরনো মেটাল প্রেসের পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির ডিটিপি তে ছাপা কবিতা পত্র শুধু বেরোলোই না সংখ্যায় বাড়তে লাগল। বেরোতে লাগল লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার নানা কবিতা গ্রন্থ।

৯ এর দশকের উল্লেখযোগ্য কবিতার লিটল ম্যাগাজিনগুলি হলো প্রভাত কুমার মিত্র সম্পাদিত প্রতিমা (১৯৯০) সৈয়দ খালেদ নোমান সম্পাদিত অন্বেষা (১৯৯০) অজিত বাইরা সম্পাদিত 'প্রতিমুখ (১৯৯০), দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভাষাপৃথিবী (১৯৯০) কবিতা ক্যাম্পাস (১৯৯০) স্বরূপ চন্দ্র সম্পাদিত 'বামকিরণ'

(১৯৯০) অনির্বান ধরিত্রীপুত্র সম্পাদিত 'অনুবর্তন' (১৯৯১) কুমারেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত মধ্যদুপুর (১৯৯১) বিষ্ণু অবস্থাপিত ও চঞ্চল দুলে সম্পাদিত অন্তরঙ্গ (১৯৯২) বিপ্লব নায় সম্পাদিত উত্তরাধিকার (১৯৯২), সমীরণ ঘোষ ও কবিতা সেনগুপ্ত সম্পাদিত সনাতনী (১৯৯১) নন্দন দত্ত সম্পাদিত কুঁড়ুল (১৯৯২), বিশ্বজিৎ সাহা সম্পাদিত ঝিনিঝিনি (১৯৯৩) স্বপন বাগ সম্পাদিত মন্ত্রী (১৯৯৩) পৃথ্বীশ চক্রবর্তী সম্পাদিত কবিতা পাক্ষিক (১৯৯৩) দীপঙ্কর বাগচী ও সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙ্ময়পন (১৯৯৩) পঙ্কজ মণ্ডল সম্পাদিত 'দীপশিখা' (১৯৯৩) সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থি কঙ্কাল (১৯৯৪) সোমনাথ, হাজরা সম্পাদিত হিমযুগ (১৯৯৪) পার্থপ্রতিম বসু সম্পাদিত 'চিত্রক' (১৯৯৪) বিজয় মাহাত সম্পাদিত পুনর্মুদ্রণ (১৯৯৪) [illegible] (১৯৯৪) জগদীশ মণ্ডল সম্পাদিত 'মুখ নবপর্যায়' (১৯৯৪) অশোক চক্রবর্তী সম্পাদিত বাসাবদল (১৯৯৫) চিরঞ্জীব বসু সম্পাদিত কবিতাবা (১৯৯৫) প্রসেন [illegible] সম্পাদিত বিকল্প (১৯৯৫), সব বৃষ্টিরা ১৯ দিনে (১৯৯৬) শঙ্কর মণ্ডল সম্পাদিত 'মু' [illegible] (১৯৯৭), [illegible] সম্পাদিত সুন্দর (১৯৯৫) উৎপল মণ্ডল সম্পাদিত মাতৃভাষা (১৯৯৬) সন্দীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পরশু (১৯৯৭) ভবপ্রসাদ সাহু সম্পাদিত 'সোনাকাকা' (১৯৯৭) প্রদীপ কর সম্পাদিত সমাকৃতি (১৯৯৭) কমল কুমার দত্ত সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৮), সুশান্ত মুখোপাধ্যায় কবিতা যাপন দিবাকর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত [illegible] কবিতা (১৯৯৯) [illegible] চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি (১৯৯৯) সমরানন্দ মণ্ডল সম্পাদিত 'অন্তরীক্ষ' (১৯৯৯) বাসুদেবানন্দ চুল সম্পাদিত কবিতা [illegible] (১৯৯৫) প্রদীপ ঘোষ সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৬), দুর্গাদাস মিত্র সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৭) গৌরসত্য বাগ সম্পাদিত অমরাবাদুনী (১৯৯৭) বিশ্বনাথ ঘোষ সম্পাদিত বিষয় কবিতা' (১৯৯৭) বিকাশ বাগ সম্পাদিত 'জ্ঞানপ্রকাশ' (১৯৯৭) সাবিত্রী মিশ্র সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৭) তপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রথম [illegible] (১৯৯৮), [illegible] সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৮) বণিক রায় সম্পাদিত পৃথ্বি (১৯৯৮) গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত শিল্প সমাচার (১৯৯৮) কবিতা কালপুরুষ (১৯৯৯) [illegible] সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৯) [illegible] দাস সম্পাদিত ক্রমমুক্তি (১৯৯৯) [illegible] দাস সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৯) অজিত ঘোষ সম্পাদিত [illegible] (১৯৯৯), অবিনিন্দম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৃষ্টিদিন' (১৯৯৯), সমসুল আলম সম্পাদিত 'অভিনব' (১৯৯৯) [illegible] সম্পাদিত পাঠচেষ্টা (১৯৯৯) কাশীনাথ মণ্ডল সম্পাদিত কবিতা [illegible] (১৯৯৯) অনীক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা ও সমাজ' (১৯৯৯) শামল [illegible] সম্পাদিত কবিদ্বয় (১৯৯৯), নিতাই জানা সুকান্ত সহপাঠ সম্পাদিত 'কালবেলা' (১৯৯৯) [illegible] ঘোষ সম্পাদিত 'অনুভব' (২০০০) নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিমন (২০০০) শ্যামলেন্দু মজুমদার বিজয় সিংহ সম্পাদিত 'বাতির কোরাস' (২০০০)

পঁচিশে বৈশাখকে কেন্দ্র করে পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে পঁচিশে বিদগ্ধ বৈশাখ মাসি,

চন্দ্রদাস প্রভৃতি নানা কবিতাপত্র প্রকাশ [illegible] আরো কবিতাপত্র।

[illegible]

উপনিবেশবাদ, বিশ্বকবিতা ও বাংলার কবিতার ধারা

তরুণ সান্যাল

বিশ শতকের গোড়াতেও এদেশে যাবতীয় সাহেব সুবোধ ভক্তি ছিল তা রবিঠাকুর কথিত 'বড় ইংরেজ ছোট ইংরেজ' বিচার করে নয়, ছিল নির্বিশেষে। ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার বিশাল এক ভাষা পরিবারের মধ্যে উত্তর ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীকে স্থাপন করে বলেছিলেন। এসব ভাষা আর্যভাষা। অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক সেই ভাষাবিদরা কিন্তু কখনও ভারতে আসেননি। কিন্তু আরেকজন সংস্কৃত ভাষে বারাণসী গঙ্গা নদীর কথা বলছেন। আমরাও স্মরণি 'মোক্ষমুলার বলেছে আর্য জেনে, ইংরেজ ও সাদা মানুষজনকে আত্মীয় জ্ঞান করে স্বদেশী কালোদের প্রতি একটু নাম কুঁচকিয়েছি। শোনা যায়, বারাণসীর সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাঁকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করে উপবীত উপহার পাঠিয়েছিলেন। যাঁদের কথা কবিতায় আমরা 'রণধারা বাহি জয় গান গাহি, যারা এসেছিল সেই শুভ্রকায়, দীর্ঘনাসা কৃষ্ণ বা হিরণ্যচক্ষু, রক্ত বা স্বর্ণকেশ অভিযাত্রীদের বংশধর বলে। শেষ জীবনে অক্সফোর্ডপ্রবাসী ম্যাক্সমুলারের জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা এবং বিশেষভাবে একদা 'দ্য কনফিডেন্ট অব সার্সি' খ্যাত নীরদ সি চৌধুরীর তো ধারণাই ছিল, ইংরেজরা এদেশে এসে নিজ কৃষ্টি ও পরিবেশের কারণে সার্সি সুন্দরীর দ্বীপে ওদেসিয়ুসের সহনাবিকদের মতো অকেজো অকর্মণ্য বাতুল হয়ে পড়েছে। আর হাজার দু তিন বছর ধরে শুভ্রকায় মানুষজন আমাদের যে নৈসর্গিক প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের চরম অকেজো হয়ে গেছি ভারতে, আমরা মানে 'উঁচু বর্ণের' হিন্দুরা ইংরেজ ও আমাদের স্বজাতিই। দুগোষ্ঠী শুধু শীত ও গরমের দেশে বসবাস করে দু ধরনের হয়েছি। ঐ চৌধুরী বাড়িয়াড় দি পলিং এর 'প্রাচী প্রাচী আর প্রতীচী প্রতীচীই' দু দিক কখনো মিলবেনা'র প্রশান্তিও গেয়েছেন কি পলিং-এর বহু পংক্তিই তো উদ্ধৃত হয়ে রয়েছে 'East is East and West is West' 'The white man's burden' 'East of Suez' 'The female of the species is more deadly than male' 'of lesser breeds without the law' এর ইত্যাদি। আমরা যারা ভারতীয় উচ্চবর্ণের কি 'আর্য' হিন্দু কি মুসলমান আশরাফ পূর্বপুরুষদের আমরা চিহ্নিত করতে ভালোবাসি এদেশে জন্মী হিসাবে। তাঁরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন বা এলেও বঙ্গদেশতো ঢের পরেই তাঁরা আগমনই করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এনে বর্ণাশ্রম গড়ে, জাতপাতের বিভাজন সৃজন করে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে উত্তরের মেরু অঞ্চল থেকে, কেউ বলেছেন মধ্য উত্তর এশিয়ার তৃণভূমি থেকে, কেউ বলেছেন বর্তমান যুক্রেনের নীপার তীর থেকে আর্যরা এসেছিলেন। তা যেখান থেকেই আসুন, 'আমরা রণধারা বাহি জয়গান গাহি' দেরই পূর্বসূরী জ্ঞান করি। কোল ভিল মুণ্ডা বা

দ্রাবিড়দের নয়। অথবা হিমালয় পাদদেশবাসী কিরাত মেঙ্গলদের ও নয়। আমরা বাঙালিরূপে আবার বহু শোণিতের মিশ্রণ ধারণ করেছি আক্রমণকারীদের জয়গানের বিচিত্রসুর একসময় মান সিংহ হিন্দুস্থানের পাতশাহর সিপাহি সহিলার হিসাবে এই জনগোষ্ঠীর নামকরণ করে 'ত্রিপুর মগ বাঙালি কাকুলি চাকুলি সকল পুরুষেতে ভাগ নাও পলায়ী।' তখনতো আর ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত নামের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ছিল নানা অঞ্চলে স্বাধীন রাজশক্তি। তবে, যারাই ভারতে এসেছিলেন, তারা সময় ধরে এই উপমহাদেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এদেশকে পথমঞ্জিল উপনিবেশ হিসাবে দেখেছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের সাংস্কৃতিক ও লোকায়ত চরিত্রের মূল শিকড় ছিল ভিন্ন দেশে। এক সময় এদেশের আলো মাটি রমণী আপন হলো, এদেশটা তাদের মাতৃভূমি হলো (পিতৃভূমি নয়)। এই যে মাতৃভূমি হলো, তার পেছনে রয়েছে সম্ভবত এদেশের মোহিনী মায়া, অঢেল মাতৃদুগ্ধের মতো অন্নসম্ভার। টি এস এলিয়ট কিপলিং এর একটি নাতি বৃহৎ সঙ্কলনের পরিচয় লিখতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন দুই কিপলিংকে। ভারতে জন্মেছিলেন কিপলিং শিশু ও বালক বয়সে তাঁর মন যে স্বভাব বেয়েছিল তা তাঁর ভারতকে ভালোবাসার নিদর্শনমূলক রচনা বিশেষভাবে কিম (Kim) বইটিতে বলা আছে। কিন্তু সাতরো থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ভারতেই জীবিকা অর্জন করা কিপলিং Wrote the rather cocky and acid tales of Delhi and Simla, but it was the former (অর্থাৎ বালক বেলা) who loved the contry and its people In his Indian tales the Indian characters who have the greater reality because they are treated with the understanding of love T S Eliot of poetry and Poets, Faber & Faber P 242 বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অতিনিষ্ঠ ধারক ইংরেজ কবি ও কথাশিল্পী কি পলিং ও তাহলে ভারতে ভালোবেসেছিলেন। এমন ভালোবাসা বিষয়ে, এলিয়টের ঐ ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, 'We all live by robbing Asiatic Coolies, and those of us who are enlightened' all maintain that those Coolies ought to be set free but our standard of living and hence our 'enlightenment', demands that the robbers shall continue He (Pipling) sees clearly that men can only be highly civilized while othermen, inevitably less civilized, are there to guard and feed them (Introductor The works of Rudyard Kipling, The wordsworth Poetry Library 1994 PP XIX XX)

এই যে guard and feed করার জন্যে রয়েছে যারা জানা দেশে বাহির ভিতরের উপনিবেশের মানুষ বাহির উপনিবেশিক মানে ভিন্ন দেশের মানুষ, যারা পুরনো দিনে অভিবাসন করতো বিদেশে, বৌ-বাচ্চা গোরু-বাছুর, সব কিছু নিয়ে স্থায়ী ভাবে বসত

করার জন্য। মার্কিন দেশের আদি বাসিন্দাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে যারা রিজার্ভে তাদের নির্বংশ করার প্রায় শেষাশেষি ঢুকিয়ে দিয়ে 'চলো পশ্চিমে' Westward Ho যাদের ধ্বনি ছিল, তারাই আদিকাল থেকে উপনিবেশিক। এমনি পেলোপনেসীয় উপদ্বীপ থেকে বহু মানুষ এশিয়া মাইনরে বসত গড়েছিল, যেমন ইলিয়মে বা ট্রয়ে কিংবা আলেকজান্দারের সঙ্গে প্রবাসে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত বাকট্রিয়ার মতো বহু জায়গায় নিজেদের এবং তাদের ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শোণিতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল জনপদ। রোমান সৈন্যবাহিনী ও তাদের প্রধান এবং রোমান ব্যবস্থাপকেরা নেটিভ জনগোষ্ঠীর আয়ত্তের বাইরে গড়তো তাদের কলোনি। প্রাচীন রোম থেকে ইতালিয়ান একদল মানুষ ভূমধ্যসাগর পার হয়ে লিবিয়ার এক কোনে গড়েছিল কার্থেজ। কতই না এই বাইরের থেকে এসে বসত করার উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভিতরেও এক ধরণের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আগন্তুক বিজয়ী ও দেশের আদি বাসিন্দা বিজিতদের মধ্যে। বিজিতদের শ্রমের উদ্বৃত্ত, জমি জিরেত এখন কি জানমান সবই আগন্তুকদের অধিকারে এসে যায়। এ বসবাসের উপনিবেশ নয়। অন্য জনজাতিকে দলিত রেখে, তাদের ঘাড়ে চড়ে জীবনযাপন, 'মানুষ মানুষকে জীবিকা করে'। নিয়মে পেশে তাদের শ্রম উদ্বৃত্ত আগন্তুকদের ও তাদের বংশধরদের দিকে ধাবিত করে। যেমন ভারতে শূদ্র সমাজে, স্পার্টায় হেলটেরা এথেন্সে দাসরা, রোমে প্লেবিয়ান ও দাসরা লাতিন আমেরিকায় বিজয়ী এনকুইস্তেদোরদের উল্টো দিকে পুয়েবলো বা নেটিভ আদিবাসীরা। বর্তমানে এইসব নানা দেশের আদিবাসীদের সম্মিলিত অভিযান নিয়েছে জাতি সংঘ, ইনডিজেনাস পিপল, পৃথিবীর ছশো কোটি জন সংখ্যার মধ্যে এদের সংখ্যা নাকি হ্রাস পেতে পেতে দাঁড়িয়েছে ত্রিশ কোটিতে। কালো আফ্রিকার, বিশেষভাবে সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে এক সময় আরব, পরের যুগে ইংরেজ-হিস্পানি প্রভৃতি দাস ব্যবসায়ীরা গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করেছে শিশু-নারী নির্বিশেষে কালো মানুষ তাদের ছাগল গোরুর মতো বেচেছে লিভারপুলের বাজারে, বিও ডিজানিরো বা এমনি নানা নামের দাস হাটে। প্রথমে মানুষ, তারপর নানা খনিজ অরণ্য ও পশুসম্পদ লুঠ করে নেবার জন্য, এক একটি অঞ্চল সৈন্য দিয়ে দখল করেছে নানা ইউরোপীয় রাষ্ট্র আফ্রিকায় এবং তাদের চালিকা ছিল বণিককুল। এই অঞ্চলগুলি আদি বাসস্থান থেকে চলে এসে বসতি স্থাপন নয়। এই অঞ্চলগুলি এক এক দেশের অধিকৃত অঞ্চল যেমন ভিন্নদেশে অভিবাসিতের বসত, এসব দেশের সব সম্পদ সম্ভারের অধিকার তখন দখলকারী দেশটির। আবার, শুধুমাত্র পণ্যকেনাবেচার জন্য এসে ইংরেজ ভারতের মতো এতবড় দেশটাই দখল করে বসলো। এটাও বৃটেনের সম্পদ নিষ্কাশনের উপনিবেশ। ১৯১৬ সালে লেনিন লিখেছিলেন 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' বইটি। তাতে লিখেছিলেন, কোনো পুঁজিপতিদের ভিন্ন দেশের সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুর, বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজ দেশ থেকে পুঁজিতে কাজে লাগায় রপ্তানি কম সেই

ভিন্নদেশটিকে বলা হবে পুঁজিরপ্তানিকারী দেশের উপনিবেশ। এই রপ্তানি করা পুঁজি নিজ দেশের অতিরিক্ত শিল্প মুনাফা মেলে পাওয়া উদ্বৃত্ত ও ব্যাঙ্কের ঋণপুঁজি দিলে ফিনান্স পুঁজি গড়া কোনো দেশ দখল করে নানা সম্পদ লুঠের জন্য বড় লাটের ছোট লাটের শাসন কার্যকর করা দেশটি হলো ধ্রুপদী উপনিবেশ। এই লগ্নিপুঁজির আধিপত্যজনিত উপনিবেশ অর্থনৈতিক উপনিবেশ। এই উপনিবেশ নামে স্বাধীনও থাকতে পারে। কাজে বিদেশী পুঁজির প্রায় পাহারাদারে রূপান্তর হয় এই 'স্বাধীন' প্রশাসন। বর্তমানে আবার বিশ্বায়নের যুগে, উদারনীতি, বেসরকারী মালিকানা ও সীমান্তভাঙা বিপণন ও পুঁজির গমনাগমন দুর্বল দেশগুলিকে শক্তিশালী ধনীদেশের অনুগত বা মিত্র (crony) পশ্চাৎপদ করে ফেলছে। এ আরেক ধরণের উপনিবেশ রচনা। আমাদের দেশ কেন, নানা দেশে ও একদল বিদ্বান আছেন, যাঁরা বলছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পরই ধ্রুপদী দখলদার সাম্রাজ্যবাদ শেষ হয়েছে ফলে উপনিবেশ ও ব্যবস্থাও শেষে হয়ে গেছে। তখন এই 'স্বাধীন' দেশগুলিতে উপনিবেশ উদ্ভব সৃষ্টি ও সাধনার সময় বিদেশী দখলদাররা এসব দেশ দখল করার আগে, এসব দেশের নিজ বিকাশের ধারা ছিল। প্রায় দুশো বছর বিদেশী আধিপত্য ঐ বিকাশধারাকে ঢেকে দিয়েছিল। যেন এক মজা জলা হয়ে, হয়ে পড়েছিল জীবন্মৃত মৃত। কিন্তু স্বাধীনতার পর, ঐ দুশো বছরের প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু বাদ দিয়ে, আবারও আবহমানতায় ফিরে যাবো আমরা যেন এ দুশো বছরে দু ব্যবস্থায় কোনো মিথস্ক্রিয়া ঘটেনি।

আমাদের বিচারে, এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ঠিক নয়। উপনিবেশ এখন আরো প্রবল নবা উপনিবেশের রূপ নিয়ে এসেছে।

ক্লদ লেভি স্ট্রাউস তাঁর নিরক্ষীয় অঞ্চলে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন, মানব সমাজের প্রতি প্রচলিত সমাজ উদ্ভবের ধারণাটি সঠিক নয়। উদ্ভবের নাকি সব সময় ভালোর দিকেই চলে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা শিখিয়েছে। কালো হলদে মানুষগুলিকে সুসভ্যতার, মানে পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতায় উত্তীর্ণ করাই The White Man s burden লেভি স্ট্রাউস বলছেন আধুনিক দ্রুতগামী যানবাহন বা বহু গ্যাজেট ব্যবহার না করেও পশ্চিমী বিলাস বাসন বিবৃত যে কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে ঐ নিরক্ষীয় আদিবাসী সমাজ যথেষ্ট বেশি কল্যাণ পেয়ে থাকে। কোন সমাজ ভালো কোন সমাজ খারাপ, এসব বিচার করা যায় না কি নিরিখে করা হবে? কত ধরনের কত বেশি পণ্যভোগ করছে বলে? শ্রম লাঘবের জটিল যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে বলে? নতুন নতুন খাবার পোষাক পাচ্ছে বলে? বরং, যারা তথাকথিত পিছিয়ে থাকা উপজাতীয় ব্যবস্থা বাতিল করে তাদের আপন স্তরে নিয়ে আসতে চায়, তারাও ঔপনিবেশিক মানস ঔপনিবেশক। বরং, যারা তথাকথিত পিছিয়ে থাকা উপজাতীয় ব্যবস্থা বাতিল করে, তাদের আপন স্তরে নিয়ে আসতে চায়, তারাও ঔপনিবেশিক মানস ঔপনিবেশক ট্রাইবাল সমাজে বাইরের ছাপ পড়ে, সে সমাজ

বিকৃত করে দেয়। ঐ বিকৃতিটা দূর করা মানে নানা সংস্কারের কাজ। তার যারা 'ইতিহাসের স্তর' বিভাগ করে বিশেষ স্তরে পৌঁছে দেওয়া যারা সামাজিক দায়িত্ব মনে করে একে আধুনিকোত্তরবাদী দর্শনিকরা বলেন গ্রাণ্ড ন্যারেটিভ। তা 'গণতন্ত্রবাদী পশ্চিমীরাই হোক বা সাম্যবাদী প্রাচীই হোক। আমাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস যেমন শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, তেমনি বিপরীতভাবে বলা তা যায় উপনিবেশিকতার ইতিহাসও, পৃথিবীর প্রতিটি এপিকই ঐ উপনিবেশিকতাকে তুলে ধরে। তা ইলিয়াস বা ওডিসি, এনিদ বা গিলগামেশ কাহিনী, রামায়ণ বা মহাভারত এ সবইতো উপনিবেশবাদকে চিনির মোড়কে ঢেকে দেখানো এমন কি ব্যক্তির যেমন স্বপ্ন, নৃ-গোষ্ঠীর তেমনি কপকথা কপকথা শ্রেণীটির দৃষ্টিভঙ্গী। ইলিয়াসের বাজপুত্র প্যারিস। দেবরাজ জিউস ও লেদার অবৈধ মিলনে জন্মেছিল ক্লাইটেমেনষ্ট্রা ও হেলেন দুভাই আগামেমনন ও মেনেলাসের সঙ্গে যে দু'বোনের বিয়ে হয়েছিল। মিনেলাসের রাণি হলেন প্যারিসের সঙ্গে ট্রয়ে চলে গেলেন তার পুরনো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গ্রিক নানা দেশের রাজা রাজপুত্ররা জাহাজ ভাসিয়ে চললো ট্রয় ধ্বংস করে হেলেনকে ছিনিয়ে আনতে। লুটিন, লক্ষ্ছিল হলেন উদ্ধারের সুযোগ গিয়ে সম্পদশালিনী নগর রাষ্ট্র ট্রয়কে ছারখার করে বা সম্পদ দামী দামী সংগ্রহ করা রাণি চোরদের ধ্বংস যারা করণে এসেছে, সেই আগামেমনন ও এবিলিস ও তো একটি তরুণীর উপর অধিকার নিয়ে পরস্পরের শত্রু হয়ে পড়ল। অর্থাৎ, উপনিবেশকারীদের নীতি তাদের সুযোগ সুবিধা মতো বদলায় এমনি ওডেসিয়াস তারও কোনো নীতি নেই এক চক্ষু সাইক্লোপস, মায়াবিনী সার্সি, চমৎকার তরুণী নসিকা - সবাইকেই সে প্রতারণা করে উপায় একটাই চালানি। এনিদওতো স্বচ্ছন্দে দিদোকে পথে বসিয়ে ইটালির তীরে পৌঁছবার জন্য জাহাজ ভাসিয়ে দিয়ে কার্থেজের রাজবাড়ি পুড়ে যাওয়া দেখেও। এমন রামায়ণ মহাভারতেও। রামায়ণের ইক্ষাকু বংশীয় রামচন্দ্র আর্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সীতা চুরির বাহানাকে ব্যবহার করে বালী ও সুগ্রীব বিভীষণ ও রাবণদের ডিভাইড অ্যান্ড রুলের কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন এমনি ভারতের নানা রাজ্যকে এক সাম্রাজ্যশক্তির অধীনে আনতে কি ভারতীয় এপিক সাহিত্য - দুই ই নানাভাবে নানা বিদ্বান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন অদ্যাবধি। আন্দ্রে জীদ ও টমাস মান লিখেছেন। ওয়াদিপাস নিয়ে, সার্ত লিখেছেন, ওরেস্টেসের পিতৃহত্যার শোধ নিতে 'মাছি', এমনকি গ্যাব্রিয়েলতো 'ইফিগেনিয়া লিখেছেন। এইতো সেদিন গ্রীক কবি কাভাফিস লিখলেন নতুন করে ওডিসি, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নির্ভর জনগোষ্ঠী নিরক্ষরতার মধ্যে ধরে রেখেছে ঐ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন কর্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ইত্যাদির আইকনগুলি। প্রতিটি প্রত্ন পুরাকথা, লেজেন্ড, মিথলজি ঐ উপনিবেশিকতার জন্মদাতা বহন করে একদা যা ছিল জনজাতির জীবনসত্য, শ্রেণীবিভাজনের পর, সে সব করে নেয়

নিজেদের, স্বার্থ রক্ষার প্রধানবাহিনীরা ঐ প্রতীক ইমেজ আইকনগুলি যুগে যুগে একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিকে একই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় reflex এ নিয়ে যায়। বিশিষ্ট হাঙ্গেরীয় নন্দন তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী জর্জ লুকাচ তাই বলেছিলেন কোনো জনজাতির মধ্যে ঘুমন্ত বহু প্রতীকই গণতান্ত্রিক উপলব্ধিকে উজ্জীবিত করে নতুন সৃষ্টিতে আবার বহু মানববিদ্বেষী প্রতীককে জাগিয়ে তুলে ফ্যাসিস্টদের মতো ভয়াবহ ঘটনার সূত্রপাত ঘটাতে পারে আমাদের দেশে টিভি, থিয়েটার, যাত্রা, চলচ্চিত্রগুলো নিয়মিত মাঁও নিয়ে ব্যস্ত। বর্তমানেতো আবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানরা প্রত্ন ট্রাইবাল আগ্রাসকদের মূলাবোধ আমদানি করতে, মাঁওগুলির নিজ স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন। এজন্য ইতিহাসে 'মানসিক উপনিবেশের' একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

ভারতের সবচেয়ে পুরনো বই ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলে ১০৮ সূক্তে সরমা ও পণিদের কাহিনী বলেছে, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন বেদ রহস্যের সমস্ত মূল তত্ত্ব বর্তমান সূক্তে বীজ হইয়াছে। সাইংহাক কাহিনীটিতে বলা হয়েছে সরমা ইন্দ্রের দূতী হয়ে 'রসা'র জলরাশি পার হয়ে পণিদের দেশে এসেছে। কেননা "ইন্দ্রের দূতী আমি, হে পণিবৃন্দ! ইন্দ্রের প্রেরণায় ফিরিতেছি তোমাদেরই মহান গুপ্তধনের অভিলাষে"। পণিরা সরমাকে বলে ইন্দ্রকে তারা মিত্র করে রাখবে "সে নিজেই আসুক না, তাহাকে আমরা মিত্র করিয়া রাখিব, সে আমাদের গো যূথের হইবে গোপতি" সরমা ভয় দেখায় ইন্দ্রের অস্ত্রশস্ত্রের, ভয় দেখায় অগ্নিদেব অঙ্গিরা ঋষিদের যারা ইন্দ্রের সঙ্গী। পণিরাও শক্ত ওরে জানায়, তারাও বলহীন নয় তাদেরও আছে নিশিত আয়ুধাদি সরমা ক্ষিপ্ত হয়ে শাপশাপান্ত করে পণিদের, "ভাতৃত্ব ভগ্নীত্ব আমি কিছু জানিনা জানে ইন্দ্র আর দারুণ অঙ্গিরা ঋষিরা ভালো চাওতো পালাও এখান থেকে পণির দল" (বেদমন্ত্র, পৃ ৭, নলিনীকান্ত গুপ্ত মনে হয় আগন্তুক আক্রমণকারী আর্যদের আগ্রণী বাহিনীর প্রতিনিধি সরমা (কুকুরীর প্রতীক) অনার্য সম্পদশালীদের ভয় দেখাচ্ছে

দূরস্থিত পণয়ো বলীয় উদগাবো গন্তু মিনতী ঋতেন

ধর্মব্যাখ্যা তারা যাই বলুন না কেন উপনিবেশবাদীদের অগ্রবাহিনীর ভূমিকা সরমা চমৎকারভাবে পালন করছে। শোনা যায় নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতারা অসভ্য নরখাদকদের কাছে খৃষ্টের মহিমা প্রচারের জন্য পাদ্রি যাজকদের প্রথমে পাঠায়। নরখাদকেরা তাদের খেয়ে ফেলে। তখন 'ধর্ম সংস্থাপনায়' অসভ্যদের টিট করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। দেখছি এই ব্যাপারটা পণিদের সময় লেকে 'পরিত্রাণায় সাধুনীয় বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম' আঠারো উনিশ শতকের opening of Africa পর্যন্ত খুবই চলেছে পণিদের কাহিনীতে দেখছি, পণিরাও তাদের জেদ ছাড়বেনা যুদ্ধ একটা হবেই।

এইটি হলো উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইঙ্গিতবাহী। স্বদেশ স্বভূমি আপন সম্ভ্রম ও সম্পদ রাখবার সঙ্কল্পের দিক। নিগ্রোহত্যাকারী সেনেগালের কবি লিওপোল্ড সেদার সেংঘর লিখছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে জুলু বিদ্রোহের নায়ক শাকাকে (চাকা) নিয়ে এক কাব্যনাট্য। ঐ নাটকটিতে রয়েছে উপনিবেশবাদী 'শাদা কণ্ঠস্বর' নামে চাকার কথোপকথন। উপনিবেশবাদীরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলের' পথে জুলু বিদ্রোহ শেষ করে দেয়। চাকা গ্রেপ্তার হন। আজও হয়ে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন। এই কাব্যনাট্যটিতে রয়েছে শিল্প, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম ও এখন যাকে সাহিত্যে মাত্রা দেওয়া হচ্ছে, সেই সেক্স বা আমাদের পুরনো অভিধাবক প্রেম। চাকাকে দেশমুক্ত করার কাজে, ব্যক্তিক প্রেমের আবেগ থেকেও মুক্তি পেতে হয়েছে, নৈশপাখী বা স্ত্রী নোনিজেলাকে খুন করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে চাকা গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার অজস্র উপজাতিকে সংহত করেন। উপনিবেশবাদীদের হিংসা, প্রেম ইত্যাদি শোষণের বিপরীতে মুক্তিপথযাত্রী চাকার মহত্ত্বও আমাদের কাছে স্পষ্ট হলে বুঝব, কৃষ্ণ আফ্রিকার মানুষদের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্তর্মূল। সেই উদাহরণটি তখন চুয়া থেকে লঙ্কা থেকে, বঙ্গদেশ থেকে সব দেশেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

যে নোনিজে মধুমতী
প্রেয়সী তোমার বধূ
শুন যায় মাখনে তৈরি চোখ নীলপদ্ম পাপড়ি
মধুর মর্মর উৎসমূলে কণ্ঠস্বর।
চাকা, তাকেই খুন করলে, সেই মধুর রমণীকে
এখন বিবেক থেকে মুক্তি পেতে তার নাম মুখে নিচ্ছ কেন

চাকা। চমৎকার! বাহবা বাহবা! তুমি বলছো বিবেকের কথা
আমিই করেছি, আমি খুন করেছি
সে তখন শোনাচ্ছিল সুনীল দেশের গল্প।
ঠিক তখনি খুব করলাম তাকে এই হাতে, না হাত কাঁপেনি
ধারালো ইস্পাত গেল দুরন্ত বিসুহলাকে
বাহুমূলে সুগন্ধী আতুর গুল্ম ঝোপে।

শাদাগলা। তুমি মেলে নিচ্ছ অপরাধ
কেবল তোমারি জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে?

গর্ভভার মন্থর নারীরা, দুধের শিশুরা?

শকুন হায়নার জন্য মড়া যোগানদার তুমিই,

ভেবেছিলাম তুমি যোদ্ধা দেখছি তো কসাই ওহে জুলু

তুমি মাথা মড়কের চেয়ে ঢের ঢের ভয়ঙ্কর

তুমি গর্জে ওঠা দাবানল।

ঢাকা। পাছদুয়ারে হাঁস-মুরগির ডাক

মস্ত এক খাঁচা বাতি মুরগি খাচ্ছে ঠাকরে ঠুকরে জোয়ারের দানা,

চমৎকার বড়ো চমৎকার সেই মাংসাসা ভেলভেট চিকন

রেশমি পালক, ঢেল চকচক লাল ঝুমরো দেহ?

আমি সেই মরা বনে কাঠুরের কুড়োল চালাই

বাজা এই বলে আমি আগুন দিয়েছি

আমি এক হিসাবি মালিক

ছাই জমেছে শীতের বীজ বইব বলে।

নোলিডের প্রেম লেকে

গেলাম আমার কালো জনতার প্রেমের দাবির কাছে

সংবাদবাহীরা বলতো

ওরা সমুদ্রে টাউস জাহাজ লেকে

হাতে গজকাটি হাতাটি স্কয়ার কম্পাস সেক্সটান্ট

দেখলাম। এদেশ ওদেশ সবদেশ

হাঁটু মুড়ে বসেছে ঐ গজকাঠির স্কোয়ার কম্পাসের সামনে

বনভূমি করে উঠলো মিটারে উঠলো পাহাড় পর্বত

গুঁড়িয়ে গেল উপত্যকা, নদীদের পায়ে জুলো লোহার পায়েল,

দেখলাম দুনিয়ায় শব্দ দিকে নানা দেশ

জোড়া জোড়া রেল পথের লোহার হাতকড়া বন্দী

দেখলাম দক্ষিণদেশী লোকজন

পিপড়ের ঢিবির স্তব্ধতায় মগ্ন পিঠবাঁকা কাজে,

কাজ? সেতো চড়ই পবিত্র, কিন্তু
ওদের কাজের শুরু কিংবা সাদা মাদল জানেনা
কি করে একটির পর একটি মাস ঋতুচক্রে ঘুরে আসে
সে সবও দেখলো না।
দক্ষিণদেশীয় বড় কাজে ব্যস্ত ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে
খনিতে বন্দরে কারখানায়। আর
রাত্রি এলে বন্দী দশা ব্যারাকের পিঞ্জরাপানে
ভিনদেশীরা জমায় কালো কিংবা রাঙা সোনা পাহাড় পাহাড়
একদিন সকালে দেখি
ভোরে কুয়াশার মধ্যে কোঁকড়ানো চুলের বন
শুকনো বাহু পেটপিঠে ঠেকা
চোখে আর ঠোঁটে তাদের ভাষাহীন প্রার্থনা চলেছে ঢালা
কোনো এক অসম্ভব ঈশ্বরের কাছে
তখন আমার আর চুপচাপ একেলা হয়ে বসে থাকা চলে?
সাদাস্বর সমস্ত দক্ষিণদেশ জুটিয়ে আনলে তুমি
সাদাদের বিরুদ্ধে
চাকা। আহ্, —এইতো চেনা কথা ফুটেছে সাদা কণ্ঠস্বর
ও স্বরতো সাগরপারের মালিকের বিবেক
এক সময় ঈশ্বরের দূত বলে আমরা যাদের জেনে নিয়েছিলাম
তারা চেয়েছিল মানপত্র। আমরা তা দিয়েছি
মশলাপাতি সোনা দামি পাথর
বাঁদর বা কাকাতুয়া কি দিইনি বলো
বিনিময়ে মরচে পড়া লোহার, সস্তা কাচ, পুঁতি
... হাঁ তাদের কামানের এল জেনেও
হয়ে উঠলাম দুঃখী মানুষের নেতা।
যন্ত্রণাই হয়ে উঠলো নিয়তি আমার
আত্মায় ও হৃদপিণ্ডে নিয়তি।...

(কৃষ্ণ আফ্রিকার কবিতা। অনুবাদ তরুণ সান্যাল। সারস্বত, পৃ ৮ ১০)

ওপারের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট কবিই কি টাকার কণ্ঠস্বরে আমার তো মনে হয় সাহিত্যের মতো কবিকে নোবেল পুরস্কার দিলে পুরস্কার চাই সম্মানিত হতো মনে পড়বে, তাঁকে এক সময় ভারত থেকে এক বড়ো পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পণিদের তিনহাজার সাড়ে তিন হাজার বছর আগে গাভীকুল (গরাম, ছিল সম্পদ। তখন "বসা" পার হয়ে এসেছিল সরমা (এক সময় ঈশ্বরের দূত আমরা পণিদের মেনে নিয়েছিলাম— চাকা), তখন 'ইমা গাব সরসে যা ঐচ্ছ পণি নিপ্রা অন্তানংসুভগে পরস্বী; কস্তু এনা অবসৃজাদযু ধ্রু তাস্মাকমায়ুধা সন্তি তিগ্মা। (এই যে গোযুথ তোমার অভিলাষ সরমা সুন্দরী! যাহাদের জন্য তুমি স্বর্গের পথ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছ, বিনাযুদ্ধে কে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে? আমাদেরও তো আছে নিশিত অস্ত্র তীক্ষ্ণ। নিশ্চয়ই সেই হাজার হাজার বছর আগে ইন্দ্র ও তাঁর সঙ্গী অঙ্গিরাদের সঙ্গে পণিদের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত গোরাজী দখল করেছিলেন আর্যরাই। ঐ দেখ সোমরসে প্রমত্ত আসিতেছে ঋষিরা —আসিতেছে অঙ্গিরা অয়াসা। নবযুবক গোরাজীর এই বৃহৎ সম্পদ ইহারাই লুটিয়া উপভোগ করিবেন তখন আর পণিদের মুখে এমন কথা সরিবে না। ৮ ঐ) বোঝা গেল ঋষিরাও 'সোমশত্রু' (সোমপানে বা রসে বাধিত) হয়ে এসেছেন। 'চাকার' কাহিনীটি অনুসরণে কি আধুনিক নাম করণ হবে অসাসা আর্য সভ্যতাদের এবং নানা ঋষিদের গুলদাস (যারা পরে বুঝা হবে,) ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, জার্মান ফলাদি ইত্যাদির বলা হয় বহিরঙ্গে বেদের যা অর্থ অন্তরঙ্গে তা নয় 'ভগ' একটা কপকের আবরণে ঢাকা। কবিতার গুণই তো তার শব্দের অর্থ ছাপিয়ে যাওয়া, এবং পাঠক নানা আনন্দিত্বই কপকও সবা থেকে পারে যে কোনো কবিতাই, যে কোনো কবিতাই কবিকে দ্রষ্টা বলে ধরে নিতে পারে, বেদের ঋকগুলি অবশ্যই কবিতা। কবিরা তা চর্মচক্ষে না অন্তর্দৃষ্টি সাপেক্ষ হয়ে কল্পনায় মানস চক্ষে দেখেছেন। সেই স্মৃতি বংশ পরম্পরায় শুনেছেন সেই আবার স্মৃতিতে ধরা আছে কবিতাগুলি স্থান হবার বহু বহু বছর পর তা লিখিত রূপ নিয়েছে। ঐ কবিতার ছন্দ, শব্দ তার উৎস ছাপিয়ে যাওয়া, অজস্র শব্দের বিলোপ হাস কবিদের নানা সুখদুঃখ সব নিয়ে এক অতিনৈসর্গিক ঘটনা হয়ে পড়েছে এক একটি ঋক কবিতা স্বয়ংই বলতে পারেন 'কিমিদং বাক্ষতরম্যা' 'আমার দ্বারা কি উক্ত হলো?' যেমনটি বাল্মীকি মুনি 'মা নিষাদ ' আবেগমন্থিত কণ্ঠে শব্দ, ছন্দ, যতি ইত্যাদির তাৎপর্যে প্রকাশ করে নিজেই চমৎকৃত হয়েছিলেন

ইয়োরোপ কেন্দ্রিক ইতিহাসই বেশ কাশা বছর হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরানো দিনের মিশর চিন ইনকা মেক্স ও আজটেক মেক্সিকো দ্রাবিড় সিন্ধু অববাহিকার ইতিহাস নিয়ে ভাবনা শুধু পত্র গবেষকদের বিষয় হয়ে রয়েছে এমনি আল্তাদ কুথের দেবও ইতিহাস। প্যাপিরাসের কিছু পাতা কিছু মাটির হিটলিকস লিপিতে আঁচড়, ইহুদিদের ওলভ

টেস্টামেন্টের কিছু লেখা এমনিই রয়েছে পুরনো দিনের ইতিহাসের লিখিত রূপ, নেপোলিয়ান নাকি মিশরের রণক্ষেত্রে তাঁর সৈন্যদের বলেছিলেন, ঐ পিরামিডগুলির আশা থেকে চার হাজার বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। পিরামিডগুলিকে দাসশ্রম দিয়ে তৈরি দাসেরা বীভৎস মরু অঞ্চলে বয়ে এনেছে দূরদূরান্ত থেকে পাথর, সে পাথর মাপ মতন কেটেছে। ঠিকঠাক মাপ মতন সেগুলি বসিয়েছে একেকটি পদানত জনজাতির নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে বন্দী করে দাস বানানো হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের এসোভাসে ইহুদি দাস, মুশা ও ইহুদি ঈশ্বর জেহোভার নির্দেশ নামা সব লিপিবদ্ধ রয়েছে, এক এক প্রত্নমিশরীয় শাসনতন্ত্রের উপনিবেশবাদের ফলিত চিত্র

রোম সাম্রাজ্যের আধিপত্যের তলায় ছিল প্রাচীন জুডিয়া। এই জুডিয়া থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল খৃষ্টধর্ম। পরাধীন ইহুদি যুবক ঈশার চিন্তা এবং স্বাধীন রোমক পলের সাংগঠনিক চিন্তা এবং সমাজের তলানি দলিতদের বিনীত অভিব্যক্তি এই দিনে মিলে জন্ম নিয়েছিল আদি খৃষ্টধর্ম। এই ধর্ম রোমেও ছিল দাসদের ধর্ম। নিপীড়িত মানুষ হয় পশুদের মতো। চাকার মতো সশস্ত্র প্রতিশোধ করে মরে বা বাঁচে নইলে ভারতীয় শূদ্রদের মতো, ইউরোপীয় দাস ও পরের সার্ফদের মতো নিপীড়নের অতি কষ্ট সহ্য করে ভুলের মতো ঘাস পায়ে মাড়িয়ে গেলেও তা বেঁচে থাকে। ঈশা বলেছিলেন দুর্বল ও বিনীতের জন্যেই রয়েছে স্বর্গ রাজ্য। ইহজগতে যে শুদ্ধ চিত্ত ও অচিন্তনে একদিকে ভগবানে আত্মনিবেদন অন্যদিকে বিনীত নিরহঙ্কার ও নিবেদিত দাসত্বে আত্মপরিচয় নিষ্ঠি দুর্বলকে এক সময় স্বর্গ পাইয়ে দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো দাসরাও এক সময় ভাবতো এই বিনীত সরলা খৃষ্ট সাধনা বলে। বেদনার্ত আর্ত দাসত্ব তারা ভুলতে চাইতো ঈশ্বরের করুণা মনে করে। তারা তখন গাইতো নিগ্রো স্পিরিচুয়াল, গাইতো ব্লুজ।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন 'জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে, যুদ্ধে শহীদ হলে স্বর্গ পাবে।' কোরানেও বলা হয়েছে, ধর্মযুদ্ধে যেজন গাজী হয়েছে, যে শাহাদাত পেয়েছে তার জন্য বেহেস্তবাস সুনির্বাচিত হয়েই আছে। যে বিনীত জন্য বেহেস্তবাস সুনির্বাচিত হয়েই আছে। যে বিনীত 'meek' সেও যেমন, শহীদ যে হবে সেও। সবার সামনেই স্বর্গের টোপ রাখা হয়েছে। এই স্বর্গ চিন্তা, ওপারেতে উপবনে। কত খেলা কত জানে। এপারেতে ধূ ধূ মরু বালি বিনারে' —এ চিন্তা প্রতিরোধী যোদ্ধাদেরতো বটেই। বিশেষ ভাবে নিবেদিত চরিত্র দুর্বলেরই। উনিশ শতকে শারীরিক বেদনা নিবারণের একমাত্র ওষুধ ছিল আফিম-নির্যাস। মার্কস তাই বলেছিলেন 'ধর্মমত অফিমের মতো ধর্মমত এ পৃথিবীতে নিপীড়িতদের দীর্ঘশ্বাস।' ঈশাতো শুধু meek হবার উপদেশই দেননি। দিয়েছিলেন দলিতদের কমিউন গড়বার প্রতিরোধী ধারণা, বলেছিলেন এমনকি, এক সময়ে নিপীড়নের

উৎসাদনে আসবেন তিনি 'তরবারি ও অগ্নি' হয়ে। এখনকার লাতিন আমেরিকায় 'লিবারেশন থিওলজি'র অনুসারী ঐ 'তরবারি ও অগ্নি'র সৃষ্টি। তারা বাইবেলও ধরেছেন লাঠিকুদ্দিয়া, খনি ইত্যাদির মালিকদের আশ্রয়দাতা মার্কিন পুঁজির বিরুদ্ধে। যেমন ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মপথিক টমাস মুনজার তাঁর বাহিনী নিয়ে অস্ত্র ধরেছিলেন নিপীড়নের বিরুদ্ধে, এমনি রেনেশাঁসের সূত্রপাতে ফ্লোরেন্সে ফ্রাঁ সাভারো রোলা মেদিচি পরিবারের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

ইয়োরোপ কেন্দ্রিক ইতিহাসকে বড় বিভাগ করতে চান গ্রীক রোমক প্রাচীন সমাজে, খ্রীষ্টীয় গ্রীক খ্রিষ্টধর্ম প্রভাবিত মধ্য যুগ। রেনেসাঁস, ধর্ম সংস্কার ও প্রতি ধর্ম সংস্কার, শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব রুশ বিপ্লব মহাযুদ্ধ, উপনিবেশ বিপ্লবের ধারা বাহিকতায়।

এক সময় গ্রীকরা অন্যান্য পরাক্রান্তদের পরাস্ত করেছিলেন পরে রোম জয় করেছিল গ্রীসকেই। পরাস্ত গ্রীস জয় করেছিল রোমকে বহুবিধ জ্ঞান ও শিল্প সৃষ্টি দিয়ে বিজয়ী রোমকে। আর্য বেদান্তবাদীদের মতে দাসও কখনো প্রভুকে তার মতে আসতে বাধ্য করে। যেহেতু প্রভু দাসদের উপরে ক্রমে ক্রমে নিরঙ্কুশ নির্ভরতায় চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদী রোমকেও প্রভাব করেছিল প্রাচীন গ্রীস। আবার মধ্যযুগ ভেঙে দিয়ে ইয়োরোপে রেনেসাঁস উদ্ভবের পছনেও কাজ করেছে রোমান পেরিক্লিসের এথেন্সের ইহবাদী (মানবতাবাদী) চিন্তা প্রাচীন গ্রীসের ভাস্কর্য স্থাপত্য-সহিত আদর্শ ইত্যাদি। এভাবে দুবার গ্রীস ইয়োরোপীয় মনন ধারায় প্রভাব ফেলেছে করেছে 'মানসিক উপনিবেশ'। এমন উপনিবেশ হওয়া অগৌরবের নয়।

শোনা যায় অগাস্টাস সীজার তার বহুদেশ বিজয়কে সদাজাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে ভার্জিলকে বলেছিলেন তাঁর কল্পিত পূর্বপুরুষ ঈনিয়াসের অভিযান কাহিনী লিখতে। ভার্জিল তা লিখেওছিলেন লাতিন ভাষায়। যেমন কালিদাস লিখেছিলেন সমুদ্রগুপ্ত পুত্র ভারত সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনাবলী, রঘুবংশের মুখচ্ছদে সেওতো উপনিবেশ বণিকের কাহিনী জানা যায়। রোম সম্রাট অক্টাভিয়াসকে নিজেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করার আকরগ্রন্থ হিসাবে ঐ বইটি ব্যবহার করবেন জেনে। তিনি বইটি পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন পোড়ানো যায়নি। এনিয়াস ইয়োরোপীয় রোমক 'শিষ্ট' জীবনের মহাকাব্য হয়ে আছে। উপনিবেশ জয়ের মহাকাব্য হয়ে ইলিয়াদ ও ওদিসিতো 'অশিষ্ট' আদি উপজাতীয় সমাজের, যখন ক্রনোসের বিশ্ব শাসনের নৈরাজ্য পর্ব হয়ে জিউসের আপাত নিয়ম কানুনের অন্তর্গত হয়েছেন জননী ধরিত্রী গালা।

হোমার এসকিলাস সোফোক্লেস ইউরিপিদিস আরিস্তফানিস ভার্জিলদের সময়ের পর যে ইয়োরোপ, সেই ইয়োরোপ মহিমায় চিহ্নিত হয়ে আছে আলেসবি দান্তে, উইলিয়ম

সেকসপীয়র ও ওলফগাং গ্যায়টের অবদানে। এমনি বলেছেন টি এস এলিয়ট। এলিয়ট বলছেন "The great poets of greece and Rome, as well as the prophets of Israel, are ancestors of Europe, rather than European in the mediaeval and ueodera sense It is because of our Common background in the literatures of Greece, Some and Isral, that we can speak of European literature at all and the survival of European literature, dependion our conntinual veneration of our ancestors" [T S Eliot Goethe as the Sage on poetry and poets p 211. বিশিষ্টতা চিহ্নিত করতে এলিয়ট ধরেছেন প্রথমে Permanennce ও Universality এবং তারপর Abundance, Amplitude and Unity এই দাবি, শেকসপীয়র ও গ্যায়টের যুগ বিচার করা থাক করে খুন করা হয়েছে বে ইণ্ডিয়ানদের। রেড ইণ্ডিয়ানরা ' যা চেয়েছো তার কিছু বেশি দেবো, বেনীর সঙ্গে মাথা'র মতো না খুন হয়ে বেণীটি কাটতে দিতো না। উপনিবেশের গভর্ণর বলেছিলেন, এক এক রেড ইণ্ডিয়ান বিনুনি কেটে আনলে এক এক পয়সা পাবে।' 'A sou for a pagtail' সেই পয়সাপাবার জন্য উপনিবেশের ডাকাবুকোরা নির্বিচারে না হত্যা করেছে অবশ্য ঐ 'নরে'রাতো আর খৃষ্টান ছিলনা। দান্তের সাহিত্য কৃতি অবশ্য এই অতিখৃষ্টানি সলিল করতে পারেনা। সেকসপীয়রের সবচেয়ে পরিণত বয়সের লেখা নাকি 'দা টেমপেস্ট' প্রসপেরো মিরান্দা ফার্দিনান্দের মূল চরিত্র সেখানে। তাছাড়া আছে অশরীরী মৎসব এরিয়েল এবং অতিশরীরী ক্যালিবান। ক্যালিবান কালো। স্থূলদেহী, অপরিশিড মন ও মনন। শুধুই সে সেবক। ক্যালিবানের মা সিকোরাক্স। ক্যালিবানকে এত দেখভাল করে, কথা শিখিয়েও প্রসপেরো তাকে পুরোপুরি বশ মানাতে পারেনি এখানে ভার্জিল হয়েছেন যেন প্রসপেরো বিয়াত্রিচে হয়েছেন মিরান্দা। মিরান্দা কিন্তু মানুষ দেখেছে তার বাবা প্রসপেরোতে আর জন্ম জন্তুসদৃশ ক্যালিবানে। ফার্দিনান্দকে দেখে সে জানলো, Man what a beautions thing কোন মানুষ? শাদা চামড়ার আর 'O brave New world এ brave new world-এ ক্যালিবানরা পৃথিবী জুড়ে থাকবে উপনিবেশের মানুষ, আর প্রসপেরোর 'অদৃশ্য' আইনের মতো এরিয়েল তাকে নানা ভাবে শাসন করবে। কিউডাল ও ব্লেড সোসাইটিতে শাসন ও শোষণ প্রত্যক্ষ, দণ্ডধারীর চণ্ডতায় তার প্রকাশ। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পুঁজির অদৃশ্য শোষণ-শাসনে মানুষের শ্রমসৃষ্ট সম্পদ পুঁজির মালিক 'আইন সম্মত' ভাবে পেয়ে যায়। শেকস্পীয়রের ঐ কাহিনীকে এখন ঘুরিয়ে ধরছেন আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীরা। তাঁরা বলেছেন, প্রসপেরো কার্দিনাদ-মিরান্দাদের সমাজ সভ্য ভাবে ধরে আছে পিল সুজ হয়ে ক্যালিবানরাই। অর্থাৎ সাহিত্য সংস্কৃতি বিচারে প্রতিবাদী স্বর শুনছি। শেকসপীয়রের যুগে আফ্রিকার থেকে লুঠ করে আনা দাসদের নিয়ে জাহাজ ভিড়ছিল লিভারপুল বন্দরে। তখনতো সব মঙ্গল ভালো করতে

পাবতো টাকাই। টাকার দামই হয়ে উঠছে প্রবল হয়ে তখন ক্যালিবানরাই সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের শ্রম দিয়ে। সেই সৃষ্ট সামগ্রী বাজারে বিনিময় হয়ে টাকা আনতে সক্ষম। দ্বীপে নির্বাসিত প্রসপেরোদের উপনিবেশ জোটে ক্যালিবানদের মধ্যে। যেমন রবিনসন ক্রুশের ফ্রাইডেতে। কিন্তু সভ্যসমাজে ফিরলেই ক্যালিবানের শ্রম আনতে পারে সোনা। মানে টাকা। 'Gold ? Yellow, glittering precionsgold ? No, gods I am no idle votarist' Thus much of this will max black white foul fair, wrong right base nobie, old young, coward valiant (Timon of Athens)

গায়টের শীলার বিটোফেন প্রভৃতিকে গটফ্রিড হেরডার বলেছিলেন, লোকজীবনে ধরা রয়েছে অজস্র মানবিক প্রতীক। লোকমুখের ভাষায় আছে জীবন্ত দিনচর্চা। তা ছাড়া পূর্বদেশ—ভারত ইরান থাকেও আনা চাই সে সব দেশের মানবচর্চার মহিমা। গায়টের কাউন্টের বয়েছে প্রসপেরোর যাদুবিদ্যা নয়, বিজ্ঞান চর্চা। কাউন্টের সাধনা অমৃত উপার্জনের জন্য। সে আপন আত্মা বন্ধক রেখেছে শয়তান মেফিস্টোফিলিসের কাছে। সে নীতিহীন ভাবে খুঁজেই নানা সুখের অভিজ্ঞতা। বয়েছে মার্গারেট গ্রেটচেনের মতো সরলা শকুন্তলা। ফিরাত্রেচে-সিরাজদ্দৌলা রূপ নিয়েছে স্বর্গবাসিনী (ফিরাত্রেচে), নবীন ভূস্বামীর প্রেমাস্পদা (মিরান্দা) সম্পদশালিনী হয়ে নয়। হয়েছে পরপরিতা প্রেমিকের কর্তৃক গ্রেটচেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা অপরাধিনী। আপন শিশুকে খুন করার অভিযোগে। ফাউস্ট এখানে শুধুই বিজ্ঞানী, তার পরানো সমাজের উপরে বিষ না অমৃত বর্ষণ করবে সে বিষয়ে সে নিস্পৃহ। 'ends' এবং 'means' বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। ends ই সব। গায়টে দেখাতে চেয়েছেন, প্রেমময়ী সরলা মার্গারেটরাই স্বর্গে যায়। তাদের জন্যই মহৎ জীবনের সিংহদ্বার খুলে যায়। ফাউস্টদের জন্য নয়। ফাউস্ট হলো শিল্পবিপ্লবের শাসক নীতিহীন ও সুবিধাভোগী বুর্জোয়া।

এই যে ইয়োরোপীয় মূল গ্রীক ইসরাইলীয় খৃষ্টীয় ধারা, তার বিপক্ষেই চলে যান গায়টে। রেনেশাঁসকে ছাপিয়ে গিয়েছিল যে জার্মান ফরাসী আলোকপ্রাপ্তি। তা শেষ পর্যন্ত বৃটেনের রোমান্টিক আন্দোলন হয়ে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিকশিত হয়েছে। এধারাতে বিশেষ ভাবে ফরাসীরাই বুর্জোয়া ঘৃণ্য লোভ ও লাভ পিচ্ছিল সমাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, লোভ ও লাভ পিচ্ছিল সমাজকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, যেমন শার্ল বোদলেয়র, যেমন আর্তুর র‍্যাঁবো উনিশ শতকের শেষে। বোদলেয়রতো বলেই ছিলেন, 'আমি (বুর্জোয়া) জঞ্জাল ক্লেদ অসুন্দর থেকে সুন্দরকে ছেঁকে নিতে চাই।' এইভাবে জন্মেছিল 'আধুনিক কবিতা। কিন্তু ইংরেজের উপনিবেশ বাংলায় যে ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিতা পৌঁছেছিল, তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ভুবনের পুঁজিবাদের সঙ্কট মানুষের জীবনে যা নোংরাতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেইটুকু। পৃথিবী হয়ে পড়েছিল এলিয়টের কাছে 'পরিত্যক্ত

ভূমি' কবিও সেখানে রাজতন্ত্রী, অ্যাংলো-ক্যাথলিক—সে অর্থে ঔপনিবেশিকেই. এ জন্য পাউণ্ড তো খোলাখুলি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন তবে যুদ্ধ বিরোধিতা হিস্পানি গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে মনের যোগ রচনা ইত্যাদি নিয়ে ভিন্ন এক আধুনিক ধরা সৃষ্টি হয়েছিল বৃটেনে। আমাদের ভাষায় বিশ-ত্রিশ দশকের কয়েকজন ইংরাজি ভাষা ও পশ্চিমী সাহিত্য সম্পর্ক সাহিত্যের অধ্যাপক, আধুনিক কবিতার পত্তন ঘটিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশরই বাঙালি সাহিত্যের প্রাপ্তবাসী ও মূলধারার পরস্পর বিরোধী চরিত্রটা ঠিক ঠাওর হয়নি। এঁদের মধ্যে স্বদেশী ভাবনা চিন্তার চেয়ে জীবিকা ও আলোকিত বৃত্তে আলাপ চারিতার প্রয়োজনে যা যা ইংরাজি সাহিত্য ও মধ্য ইয়োরোপীয় সাহিত্য পড়তে হতো, তাঁরা তা পড়তেন কিছু প্রমান আছে (১৯৩১ সালে আগস্টে প্রথম প্রকাশিত) 'পরিচয়' পত্রিকায়, ইংলণ্ডে কয়েকজন কবি ছিলেন সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তাঁদের সেটা ফিজিকাল কবি বলা হতো। কোনো অর্থেই তাঁরা অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স চর্চা করেননি কিন্তু তাঁরা খুব পণ্ডিত ছিলেন। লেখা লেখিতেও তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেতো তবে, তাঁদের বইপত্র তেমন ছাপা হতো না। জন ডানের মতো কবিরও কবিতা বাতাই করে তাঁর বন্ধুরা কবির বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের চাঁদার টাকায় ছেপেছিলেন। আমাদের ত্রিশের দশকের আধুনিক কবিরাও অমনি মেটাফিজিকাল তাঁদের বইপত্র ঐদশকে নিজেরাই ছেপেছেন দু তিনশো করে। অথচ এঁদের নিয়েই এখনও এত হৈ চৈ। এ হৈ-চৈ কেন? আসলে এঁরা আবিষ্কৃত হয়েছিলেন পশ্চিমী অর্থনৈতিক সঙ্কটে থেকে যে রাজনৈতিক সঙ্কট সাহিত্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি মানুষকে থাকবে তুলেছিল অর্থহীন শূন্য সেই শূন্যতার বর্ণনাকারী হিসাবে রাষ্ট্র ও দেশে নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থান, বাজারে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য চক্র অবদমন এবং সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদির দায় নিচ্ছিল। অথচ যুদ্ধের দামামা বাজছিল। ফ্যাসিবাদ নখ দাঁত বের করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল এসময়ের কেইনসীয় অর্থনীতি ছিল সঙ্কট নিরাময়ের তত্ত্ব। ফ্যাসিবাদ এই সঙ্কটের দায় দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কোনো কল্পিত শত্রুর (যেমন জার্মানিতে ইহুদি) ঘাড়ে চাপিয়ে, যুদ্ধের ভেতর দিয়ে উপনিবেশ ধরাবার প্রস্তুত করা হল। এসব ছিল অর্থনীতির সঙ্কটে দেশের যুদ্ধ বিরাক্ত হয়ে ওঠায় এ অঙ্গে ও অঙ্গে বিস্ফোট। আমাদের দেশ ছিল বৃটেনের উপনিবেশ। এই সঙ্কটের দায় ভারতেও এসে পড়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের, আধুনিক কবিতায় ভারতীয় জীবনের সঙ্কট ধরা পড়লোনা। দু একটা 'উট পাখী' কবিতায় দায় নেবার ইঙ্গিত আছে কিন্তু 'হেলেনের বুকে সোনার বাটি' দেখল তপশীরা শুধু নিরাময় ভাবলেন কেউ সেকসে কেউ বা অনির্দেশে মানস ভ্রমণে বোধ নিয়ে খুব আর্ত হয়ে, রুশ বিপ্লবের পক্ষে 'অঙ্গে অঙ্গীকার' খুঁজে। কিন্তু লোগোপিয়া, মেলোপিয়া, ইসেজিসকে এঁরা পাঠকদের কাছে সুদূরই রেখে গেলেন। এই

বাঙালি আধুনিক ও 'মেটাফিজিক্যাল' কবিরা কার্যত দেশের জনগণের কাছে দীর্ঘ অনাদৃত রইলেন। এঁদের ভেতরে সংখ্যায় সবচেয়ে ফলন্ত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি কবিতায় এমনসব আধুনিকতার চিহ্ন ধারণ করার সুপারিশ করলেন, তার অনেকগুলি বাতিল করেই আধুনিক কবিতার বিকাশ ঘটেছে। এই দ্বিশব্দ 'আধুনিক লচ্ছ' কে একটু সরিয়ে রেখে বাঙালি কবিতার আবহমানতার কথা ভাবা যাক

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির উপর ঔপনিবেশিক চাপ বারবার এসে পড়েছে। প্রাচীন যুগে বিশেষ ভাবে আর্যীকরণ, মধ্যযুগে হিন্দি অবলী পারসিক চাপ এবং আধুনিক যুগে পশ্চিমী দাপট। মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। তবু মূল অবস্থানে তা বাঙালির উপনিবেশ বিরোধী মনোসঙ্গীই।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব দশম শতক থেকেই। বাঙালির কৌম জীবন, নদীনালায় বিভক্ত অজস্র গ্রামে ছড়ানো সংসার যাকে একীকরণ করবে, ভাষাকেই মূল ভিত্তি করে একটি 'জনগণের (People) পত্তন হতে চলেছিল তখন এই বাঙালিদের বড় অংশটাই ছিল ধর্ম আচরণে নাথপন্থী বৌদ্ধ। ড শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে পূর্ববঙ্গ থেকে। অর্থাৎ পদ্মা নদী বেয়ে যে দেশ যাওয়া যায়। যে অবাঙালি ভুসুকু 'বাঙালি' হয়েছিলেন, তার একটি চর্যার দেখছি :

বাজ ণাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ।

অদয় বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।

অর্থাৎ বজ্রযান নৌকায় পদ্মাপাড়ি দিয়েছিলেন ভুসুকু। যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃজিত হয়েছে উদ্ভব ভারতের আর্য সংস্কৃতির বাহন 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', ড শহীদুল্লাহর মতে চর্যাগুলির উদ্ভব তেমনি 'বঙ্গদেশে' আর্যীকরণের বিপরীত প্রবাহ ছিল ইই চর্যাগুলির ধারা।"

"পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথ পন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদ সাগরের তীরে চন্দ্র দ্বীপে, বর্তমানে সম্ভবত থাকে সন্দীপ বলে। ৬৫৭ নেপালে উপস্থিত হন। মৎস্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জালন্ধর পা, কৃষ্ণপা, ডোম্বী, সরহ শবরী প্রভৃতি বহু সিদ্ধাচার্য চর্যাগীতি বা পারমার্থিক গান রচনা করেন। তার কতকগুলি আমরা পেয়েছি। এই গানগুলির একটি বিশেষত্বপদের শেষে ভণিতা। (নীচে দাগ উদ্ধৃত কারের) যেমন ধরুন।

সরহ ভণন্তি বর সুত্র গোহালী কি সো দুঠ বলদেঁ।

একেলে ছগা নাসিঅ রে বিহরঅ সুচ্ছন্দে

'এই ভণিতার রীতি প্রাচীন বাংলা থেকে সংস্কৃত যায় যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দে। সমস্ত মহাজন পদাবলী চর্যাগীতির বৈষ্ণব সংস্করণ। নাথপন্থের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতির রীতি পঞ্জাবি পর্যন্ত উত্তর ভারতের পরমার্থিক গানে চলতে থাকে। পঞ্জাব থেকে এই রীতি পারশ্যে যায় পারসী গজল আরবীর অনুকরণে নয়। তা চর্যাগীতিরই অনুকরণে। আরবীতে কসিদা আছে গজল নাই

ত্রিপুরার মেহেরকুলের রাজা গোপীচন্দ্র গুরু জালন্ধরী পা-র নিকট নাথপন্থে দীক্ষিত হয়ে বৈরাগী হয়ে যান নাথপন্থের সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যান ভারতময় বিভিন্ন ভাষার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, শ্রাবণ ১৯৪৮ ডিসেম্বর)

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতির একটিই লক্ষ, উত্তরভারতের আর্যিকরণের ধারার বিরুদ্ধে প্রাগ্‌বাসী বাঙালির বিপরীত ধারা সৃজন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা বেদ, উপনিষদের যদি কোনো আর্যিকরণের ঔপনিবেশিক ভূমিকা থাকে এই প্রতিধারাটি তার বিরুদ্ধে উপনিবেশ বিনাশক ধারা শুধু তাই নয় বিভিন্ন দেশের লোক উপাসনা ও লোকপ্রেমগীতির ভণিতায় রয়েছে ব্যক্তিস্রষ্টার নাম এইটিকে আমরা ব্রাহ্মণ্য জাত পাত বর্ণধর্ম আশ্রমধর্ম বর্ণাশ্রম ধর্মের বিপরীতে, ঔপনিবেশিকের বিপরীতে লোক প্রতিরক্ষা ও লোক প্রতি আক্রমণ বলছি। পানিদের ধারা বলছি জুলুমবিদ্রোহের ধারা বলছি বহুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা বহিত্র নিয়ে লড়াই করেছিলেন, কাশ্মীরে পরিহাস কেশব মন্দির যারা ভেঙেছিলেন পদের রাজার সঙ্গে কাশ্মীররাজ বিশ্বাসঘাতকতা করে সর্বশেষ ভাঙবার জন্য—সেমনটি রাজতরঙ্গিণীতে রয়েছে এঁরা সবাই সমাজের সাধারণ মানুষ, ভারতীয় উচ্চবর্গের চোখে হীন, পঙ্গীর ভাষায় যারা কথা বলে, অঞ্চলের আড়ম্বর অক্ষরভঙ্গির গৌড়ীয় রীতিতে বলছে, পাণ্ডবর্জিত তাদের দেশ, সেই প্রান্তদেশ বঙ্গ, সাবালটার্নদের দেশ এই সাবালটার্ন বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে আদি বামপন্থা বলব। শিষ্ট সমাজের, ব্রাহ্মণ্যের শাসকদের লক্ষ্য ছিল "বেদাধ্যয়ন, ব্রতানুষ্ঠান (মনু সংস্কারবর্জন) সায়ং প্রাতঃকালে হোমানুষ্ঠান, বেদত্রয় অধ্যয়ন, দেবলোক ঋষিলোক পিতৃলোকের তর্পণ, গার্হস্থ্যাশ্রমে অপত্যোৎপাদন, পঞ্চমহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অপরাপর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাতে এই দেহাভ্যন্তরীন আত্মা ব্রহ্মপদ লাভের উপযুক্ত হয়।" ৮ মনুসংহিতা-দ্বিতীয়খণ্ড। এই ব্রহ্মপদ লাভ, পুরুষ প্রকৃতি বিচারে 'বেদাহমেতম পুরুষ'। মহাজন কিন্তু বঙ্গভূমি ছিল দেবী উপাসক। প্রকৃতি বলতে শুধু নারীশক্তিই বোঝায় না প্রজ্ঞাসক্তিও বোঝায়। তাই বলছিলাম বঙ্গীয় ধর্মপ্রতিক্রিয়া যা আদি বৈষ্ণব, সাক্ত প্রভৃতি ধর্মে দেখছি, অজস্র লোকধর্মে যা দেখছি—নারী শক্তি উপাসনাই সেখানে প্রধান। বৈষ্ণব মহাজনপদ, শাক্তমালসী এবং বাউল ও নানা সহজিয়া ধর্মের গান—প্রথার চেয়ে সমষ্টি আচরণ ও গানকেই বড় করে তুলেছিল। এমনকি মুসলিম ধর্মও বঙ্গদেশে

মারকাত মুক্তি জীবপন্থী সুফীধর্মও প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতাকেন্দ্র আল্লাহর তুলনায় প্রেমময় কোদার কাছে আত্ম নিবেদনে অলঙ্কৃত। বাঙালি কাব্য ছন্দে ছড়ার চন্দ বা স্বরবৃত্ত শূদ্রছন্দ। অক্ষরবৃত্ত পয়ার ব্রাহ্মণছন্দ, বাঙালি রমনীকুল। গ্রামের চাষা ভূষা ও সমাজের নিম্নবর্গীয় অংশগুলি নিত্যব্যবহৃত জ্ঞান ভাষ্যে স্বরবৃত্ত ব্যবহার করে বাঙালির রাম একান্ত বাঙালিই। এমনি মহাভারতের নায়ক নায়িকারাও। এবং শ্রীমদভাগবতেরও। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লেখেন যখন 'তেল বিনা কৈনু স্নান উদক করিনু পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে' তখন ঔপনিবেশিক নিপীড়নের চিত্র পাই। প্রসঙ্গত ভাসান গানের লক্ষ্য বলা যেতে পারে, লোকদেবীকে স্বর্গের প্রথম শ্রেণীর দেবদেবীদের পাদপীঠে প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক সাবলিইন দেবদেবীর এমত প্রতিষ্ঠা প্রায় সবগুলি মঙ্গলকাব্যেরই মূল বিষয় এমনি চরিত্র সাহিত্য ও প্রথা অনুসারী পাষণ্ডীদের ভূমিকার বিরুদ্ধে, এবং প্রবল কেন্দ্রীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা হওয়ার তত্ত্ব দিয়েছেন চৈতন্যদেব যেন খ্রীষ্টীয় বিনয়।

আমাদেরতো মনে হয় গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে যাকে রেনেশাঁস বলা হয়, সেই কাল জুড়ে প্রতিবাদের সাহিত্যই জন্মেছে স্বদেশ অভিমান কি ইংরাজি কি বাংলায় ভাবাবেগেই বাঙালিরা কবিতা লিখুক না কেন তা ছিল ইংরেজকে বা পশ্চিমকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। ডিরোজিও, তরু দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ এমনিই করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে শিলাইদহে বাউল লোকগীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেই বদলে গেছেন ১৯৩০ সালের অক্সফোর্ডের হিবার্ট বক্তৃতায় 'মানুষের ধর্ম' নিয়ে বলতে গিয়ে লালন ও হাছন রাজার গান উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পত্রপুটের একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'আমি বাউল বলে।

এই উপনিবেশ বিরোধী বিস্তৃত প্রবাহে স্বচ্ছ ধারা এসে মিশেছে কাজী নজরুল ইসলাম বিপ্লবী কণ্ঠস্বর তাতে যোগ করেছিলেন চল্লিশ দশকে এই বাঙালি মূলধারায় কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অন্তর্বর্তী সময়ে রামধনু। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরো অনেকে।

পঞ্চাশের দশকে বিশেষভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ছাপ এসে পড়েছিল পশ্চিমের নানা অনুবাদ এবং কিছু কিছু ভিন্নতর কাব্যবোধ বাংলা কবিতায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলে। ও বাংলায় আবার ইসলামিকরণ ও বাংলাভাষা উৎপাদনের চেষ্টা চলে এসবের বিপক্ষে কবিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছিল এবং তারা ভাষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যার পরিণতি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা দেশ অর্জন যে অঞ্চল নিয়ে একদা ছিল ভূসুকুর

বঙ্গাল—ও মহীদুল্লাহ সেই বাঙ্গালাদেশকেই ১৯৪৩ সালে স্বাধীন দেশ বলে মন্তব্য করেছিলেন। এদেশে পরিবর্তনের কবাদের প্রচেষ্টা পথটি ছিল ভিন্ন বেদলেয়রকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েই, বিকৃত অর্থে, যৌন অভিব্যক্তির মূল হিসাবে। রিলাকেও অনুবাদ করা হয়ে জন বিযুক্ত রূপ সন্ধানী কবি বলেই এমন কি কাফিও নাৎসী গার্টফ্রিড বেনকেও এরাজ্যে পরিচিত করার চেষ্টা চলে। অর্থাৎ কি ভাবে বাংলা কবিতার মূল ধারা থেকে কবিদের সরিয়ে নিয়ে সঙ্কীর্ণ মজা খাতে তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে। ইরাকে বোমা পড়ে, সিয়াটেল—জেনোয়ায় মানুষ প্রতিবাদ করে নানা ধর্মীয় লাঞ্ছনা চলে উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ গুজরাট উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিজ্ঞানহীন বিষয়কে বিজ্ঞান বলে পড়ানোর ব্যবস্থা হয় বহুভাবে গো বলয়ের মূল ধর্ম ও দর্শনের ধারা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত ঘটাতে চায় যখন আমাদের তরুণ কবিরা অনেকেই এসব না বুঝে, হাল্কা চালে তখন পদ্য লিখছেন, বিষয় একটাই—দুর্বল ও সহজলভ্য এক পুরুষ বা নারী বিপরীত লিঙ্গকে প্রত্যাশা করে ব্যর্থ হয়েছে তবু মূলধারাটি প্রতিবাদী বামপন্থীই থেকে গেছে শুধু রাজনীতি নয় সংস্কৃতিতেও এবাংলায় বামপন্থাই এখনো মূল বিষয় কেউ যদি সদর্থক ভাবে সমালোচনা করে তার কোথায় কোথায় রয়েছে ব্যর্থতা, তাতে বাংলা কবিতার অবস্থান উপনিবেশ বিরোধিতা সমালোচিত হয় না সমালোচিত হয় অসিদ্ধান্ত বৃত্তে নিযুক্ত কবিদের যারা পথ ভ্রষ্ট করে। তাঁদের চরিত্রে চ্যুতি ঘটাতে চায় যারা তারাই।

'চিলেকোঠার উন্মাদিনী' ঃ নব্য নারীর কলমে

ঋর্ণা সান্যাল

'তাহলে প্রথমে সব ছোট ছোট কথাদের লিখি

ছোট ছোট জিনিষের কথা। .....'

যে সব 'ছোট ছোট কথা' এতকাল প্রতিকূল আবহাওয়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল, উত্তর আধুনিকতার উন্মুক্ত পরিবেশ আজ তাদের আত্মপ্রকাশ। আজ নিম্নবর্গের — নারীর দলিতের, প্রান্তবাসীর কথা —, সব কথাই আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের কথা। সে কথা অনভ্যস্ত শ্রবণ পছন্দ না হতে পারে কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই।

দেশ' পত্রিকার ২৭শে মার্চ ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিলেকোঠার উন্মাদিনী' এমনই একটি কথা যার বিষয় 'নারীসত্তা'। কবিতাটি কেন্দ্র করে উত্তর আধুনিক নন্দনতত্ত্বের দুটি দিক নিয়ে আমার আলোচনা (প্রবন্ধ নয় — কারণ বাংলা সাহিত্যে এই ভাবনা এখনও এত সংহত হয়নি যে প্রবন্ধের দাবী মেটাতে পারে) : পাঠের আন্তগ্রন্থি বা Intertextuality এবং শব্দের অর্থের বহুমাত্রিকতা বা তার অনন্ত দ্যোতনা।

আন্তগ্রন্থি : কবিতাটির নাম আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ The Mad Woman in Alice Walken he color purple (1979) এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ। ১৯শ শতক থেকেই ইংরেজী কবিতা বাংলা কবিতাকে অণুপ্রাণিত, সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বিদেশী সমালোচনা গ্রন্থের নামে যখন কবিতার নামকরণ হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গ্রন্থটির তাত্ত্বিক ভঙ্গী সংযুক্তার কবিতার বক্তব্যকে সংহত করতে সাহায্য করেছে, সেই সঙ্গে কবিতাটিকে বাংলা কবিতার অঙ্গন থেকে একটি বৃহত্তর পরম্পরায় স্থাপিত করেছে। বাংলার কাব্যপরম্পরার ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে কবিতাটি আন্তর্জাতিক নারীকথার ভুবনে পৌঁছোবার চেষ্টা করেছে।

The Mad Woman in the Attic এর আলোচ্য বিষয় ১৯শ শতকের ইংরেজ ও আমেরিকান লেখিকাদের সাহিত্য কল্পনা। স্যান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুসান গুবার, এই গ্রন্থটির দুই লেখিকা, ১৯শ শতকের কিছু বিখ্যাত উপন্যাস, কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ঐ সময়ের পরিমণ্ডলের সামাজিক নির্মাণে, পিতৃতান্ত্রিক অবরোধের ঘেরাটোপে নারীর মুক্তিবাসনা, আশা, যৌনচেতনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা, এমন কি তার সৃষ্টিশীলতা — সামাজিক বিচারে যা অস্বাভাবিক', অ-'সামাজিক' ডাকিনীসুলভ — তা প্রকাশিত হয়েছে এক দ্বৈতসত্তার

কল্পনায় প্রথম সত্তাটি 'স্বাভাবিক', 'সামাজিক' 'সাংসারিক' যেমন শার্লট ব্রন্টের 'জেন এয়ার' উপন্যাসের নায়িকা জেন এবং তার 'অন্ধকার' দ্বৈত সত্তাটি ক্যারিবিয়ান মেয়ে বার্থা, যে চিলেকোঠায় বন্দিনী উন্মাদিনী, অস্বাভাবিক, অসামাজিক' অসাংসারিক' সমাজে তার জায়গা নেই অতএব একদিন বাড়ীতে আগুন লাগলে বার্থা পুড়ে মরে।

এই গ্রন্থটির আরো একটি রচনা, ক্রিস্টিনা রসেটির কবিতা 'গবলিন মার্কেট' যা এখনও শিশুপাঠ্য হিসেবে কবিতা সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এটি দুটি বোনের গল্প : একজন চপল, প্রলোভনে দুর্বল নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ পাবার জন্য প্রায় উন্মাদিনী অন্যজন তার বোন যে নিজে প্রায় ধর্ষিতা হয়ে তার বোনকে সর্বনাশের পথ থেকে সরিয়ে আনে কবিতাটির শেষ লাইন কটি উদ্ধৃত করছি :

"For there is no friend like a sister

In calm an stormy weathers;

To cheer one on the tedious way,

To fetch one if one goes astrary,

To lift one if one totters down

To strengthen whilst one stand."

সংযুক্তার কবিতায় এই পুড়ে মরা এবং ভগ্নী সখীদ হাত ধরে বাঁচার সম্ভাবনা — এই দুই ভাবনাই আছে। যে তন্ত্রে পুরুষ 'প্রভু' যেখানে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে প্রতিরোধের চিন্তা আছে যেমন মল্লিকা সেনগুপ্তা কৃষ্ণাবসুদের মত কবির কবিতায় বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে 'মনোচিত্রিত স্বামী শব্দটি অতি আশালীন, তাঁর প্রার্থনা 'বন্ধুকে দাও বন্ধুর হাত' (দেশ, ১৮ জুন, ২০০১) 'পুরুষবন্ধুটি যাতে সংসারের প্রভু হয়ে না – বসে কখনও, সেই বর দাও', লিখছেন সংযুক্তা ('নাচ, ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা) একই আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা ভারতীয় নারীদের লেখা ইংরেজী কবিতায়, সরোজিনী নাইডু, কমলা দাসের কোন কোন রচনায়।

নারীসখা এই পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ মনে হয়েছে সংযুক্তার মত হয়তো আরো কারুরএর মধ্যে তাঁরা দেখেছেন প্রতিরোধকের সম্ভাবনা, ক্রিস্টিনার রসেটির ভাষায় 'fiery antidate' (গবলিন্ মার্কেট)।

সময়ের মানচিত্র : 'কথা'র অবস্থান / চরিত্র

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত চিলেকোঠার উন্মাদিনীর কথা, যার কথক 'আমি' পরিচয়ে এক মানবী ব্যক্তিত্ব। কথার শুরু - 'তাহলে দিয়ে, যেন হঠাৎ কোন সংলাপের মাঝখানে থেকে শুনতে পেলাম নারীর সেই কথা যা যুগ যুগ ধরে নৈঃশব্দে প্রবাহিত

হচ্ছিল, যা শব্দে ব্যক্ত হলো তখনই যখন 'অক্ষরহীনা' পা বাহলো শব্দের শরীরে 'তাহলে' সেই সময় চিহ্ন : অচেতন আর সচেতন সময়ের মধ্যে অব্যক্ত আর ব্যক্ত কথার মধ্যে একটা 'হাইফেন'।

১৯শ শতকে বাংলায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বাসনা ও আগ্রহ, তার যৌনচেতনা, তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আভাস প্রতিবিম্বিত কবিতার অন্তরে একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত কবিতাটির প্রতি কথা চরিত্র : 'পিতৃতান্ত্রিক প্রভু বাক্য' এককাল রূপকথা লোককথায় বলেছে ডাইনী রাক্ষসী, সৎমা সর্পিণী নারীর কথা। আমার দিদার জিভ থেকে ঝরা আলোক কুয়াশার রূপকথা আড়ি পেতে শুনে নিয়ে পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে চারণ পুরুষ' কথা', ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা'। এরই উত্তরে আজ এই 'ছোট ছোট কথা

সেই অস্ফুট সময়ের আপাত তুচ্ছ, ছোট, 'ওড়ো ওড়ো' কথা, প্রায় অ দৃশ্য 'পিপড়ে অক্ষরে disposable কাগজকমলে লেখা ইঁকারেঁকি লেজনামচা, অদৃশ্য' বা অ 'পাঠ্য' হলেও মৃত নয়। সে কথা শীতঘুম শেষ করে সঠিক সময়ে প্রাণবন্ত হওয়ার প্রতীক্ষায় মেয়েদের সেই সব কথা 'আজ হঠাৎ অতীত থেকে ভেসে আসে বর্তমানের জলাতে

সময়ের তিনটি ক্ষেত্রকে কবি তুলে দিয়েছেন সুকৌশলে: বর্তমানের দর্পণে অতীত প্রতিবিম্বিত তার 'অতীতত্ব' নিয়ে বর্তমানের যা অতীতের ভবিষ্যৎ—স্বীকৃতির আশায় (' তাহলে আমাদের চিনবে না ?') বর্তমানের সচেতন সময়, সেই অতীতের কথাকে পুনরুদ্ধার করেছে সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে নিম্নবর্গের দৃষ্টিতে, পিতৃতন্ত্রের সমাজরক্ষকদের পালপুণ্যের বিচার কর্তাদের মুখোশের নীচে উদ্ঘাটিত 'জল্লাদ' এর মুখ।

ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে লোককথার ঢঙে কবিতা ব্যঞ্জনায়, অনুষঙ্গে, উপমায়, রূপকে কবি দুটি 'অকাল বিধবা পিসি ভাইঝির বঞ্চিত জীবনের আবরুদ্ধ বাসনা, কামনা, আকাঙ্খার আভাস দিয়েছেন, —যার কথা অনবদ্য ভাবে প্রকাশ করেছেন আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বৈধব্য সংক্রান্ত ছোটগল্পে, বিশেষ করে 'বাসনার নেশা' বা নেশার মত গল্পে আশালতা সেন বলেছেন তাঁর কবিতায় এই 'অকাল বিধবা পিসি ভাইঝির 'বর্ষজীবনে' 'গ্রীষ্মের দুপুর' আছে, আছে চিলেকোঠার নিভৃতি তারা মনের কথা বলে, পরস্পরের কাছাকাছি আসে

অকাল মানে যে ঘোর গ্রীষ্মের দুপুর একাদশী—

তুমি তো জানতে সব, কেন আগে বলে দাওনি পিসি ?

তোমার গায়ের ঠাণ্ডা, তোমার বুকের ঠাণ্ডাখানি

সেই গায়ে জড়িয়েছি, শুনেছ বুকের ধকধকানি।

গল্পটি নারীর 'চুল খোলার গল্প' লক্ষ্মণের 'আঁশবটির আড়ালে' ফুটিয়ে দেওয়ার শাস্তির কথা : অবধারিত ভাবেই যেন ইতিহাস আর পুরাণকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে কবিতার প্রথম লাইনে সীতার প্রসঙ্গে।

দুটি নারীর শরীরীচে ওনা 'আমি কি শুধুই একা ? অক্ষরহীনার রুদ্ধ প্রাণে শরীর লেখে যে কী কী ডাক ওঠে, দুপুরই তা জানে , নাকের ভাইঝি এর পরেও 'শব্দের শরীর নিয়ে মেলা করে। যে অভিজ্ঞতা 'ডাইনী গোপনতায় হারিয়ে যাওয়ার কথা তাকে সে লিপিবদ্ধ করে, —এও যেন আর এক নেশা ('না লিখে পারিনা, পিসি)। নারীশরীর আর শব্দের শরীর যেন এক বীণার ঝঙ্কার ('সরস্বতী আঙুল না ডোলে নিজে যদি নিজেকে বাজাও দেবীমূর্তি খোলাও দড়িতে বীণা ভেঙে করো খান খান) সুতরাং সমাজের উচ্চারণ 'এক পাপে কুমারীপণ ওদের , লিখতে শেখা আরও এক পাপ'।

পাপের বেতন মৃত্যু ডাইনি সন্দেহে খুঁটিন ধর্মিতাকেরা যেমন এক সময় পুড়িয়ে মেরেছে অনেক অ-'স্বাভাবিক' মেয়েকে তেমনি শুধু তোমাকেই নয়, 'পিসি কথাকেও পুড়িয়েছে ওরা /জীবনে, জীবন বিবৃতিতে আছে নিষেধাজ্ঞা ভাবী কথা' আবার ক্ষেত্রান্তরে ছিন্ন stage setting এও একই ঘাতকের আবির্ভাব ' গায়ে ধুতি নিয়ে জল্লাদ পশুকে টেনে আনে পশুর পরনে সাদা থান, চোখে জল নেই, শুধু ধোয়া ভরইনি মাথা ইঁটকাঠে মাথাভরা কলঙ্কের বোঝা '।

এর পরের কথা ছোট ছোট কথা জমতে জমতে ইতিহাস হয়ে ওঠার কাহিনী 'ভীষণ উন্মাদাগার থেকে/কোনমতে পালিয়ে এসেছি কাগজকে ভুমি সেজে আজ লিখে রাখছি চোরা ইতিহাস'। ইংরেজী আমেরিকান বা ইউরোপীয়ান সাহিত্যে যে female friendship sisterhood-এর ভাবনা সেই নারীসখ্যের বা নারীসংহতির আহ্বান এই 'গুপ্ত ইতিহাসে' —এ আহ্বান সব নিগৃহীতাকে।

যে তোমাকে কয়েকটি কড়িতে
বিক্রি করে দিয়েছেন বাবা
যে তুমি প্রভুর মারে ম'রে
উপপত্নী থেকে হলে দাসী
আর যে-তুমি ঠিক আমার মতো
দু'চোখে লুকোনো রক্ত ভরে
এক গাড়ি লোকের সামনেই
হাত থেকে রুমাল খসে গেলে

ভাবাক্রান্ত হয়ে বসে আছ

আর যে-তুমি ঠিক আমার মতো

প্রতিরাতে মৃত্যু বেছে নিয়ে

রোজ সকালে পুনরুত্থিতা —

নারীজীবনের এই সব দি সম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সব ছন্দ সব প্রতিষ্ঠান অর্থহীন 'আজ আমি পুড়ে ফেলব সব আলো আর উৎসবের গায়ে যেখানে ফ্লুরোসেন্ট হরফে লেখা থাকে বিবাহার্থী আর উদ্যোক্তাদের নাম'

অতীতের এই বঞ্চিত নারীরাই —'যারা মেঘ দেখবে বলে মাটি খুঁড়ে জল আনতে গিয়েছিলো আজকের নিগৃহীতা মেয়েদের প্রপিতামহী'। কবিতাটির প্রান্তিক প্রশ্নে 'তোমরা আমাদের চিনবে না ?' — উত্তরআধুনিকতার সংশয় ও বিপন্নতার আভাস, কিন্তু নারীর দৃঢ় স্বরক্ষেপণে উচ্চারিত।

এই কবিতাটি তাই গন্তব্যে পৌঁছে শেষ হয় না গন্তব্যে পৌঁছোয় না,—তার সন্ধানে বা প্রতীক্ষায় থাকে : 'হাওয়া একটু তীব্র বইলে আলো স্বচ্ছ হলে জাগে দ্বীপ, সে-কবল খোঁজা লেসবস্।'

এই কবিতা-কথা দুটি স্থানোন্নে বিস্তৃত 'শুকনো চিলেকোঠা' এবং শেষের 'লেসবস্'—দুটিই মূল কুখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ : একটি বন্দীদশার উন্মাদাগারের , অপরটি মুক্তির, শুশ্রূষালয়ের ।

পুরোনো দ্বীপ / না নতুন দ্বীপমালা শব্দের বহুমাত্রিকতা

কবিতাটির শুরু তার নামকরণের বিদেশী অনুষঙ্গে, শেষও তাই গ্রীসের লেসবস দ্বীপের উল্লেখে। এই দ্বীপের সঙ্গে জড়িত কবি বীণাবাদিনী, সঙ্গীতজ্ঞা, আফ্রোদিতি পূজারিণী সাফোর নাম। এই স্থান ও পাত্রীর নাম থেকে এসেছে ইংরেজী 'lesbian ও 'sapphic' শব্দ দুটি — নারীপ্রেমিক নারী বা woman loving woman' অর্থে।

ইংরেজীতে এই শব্দদুটির বিশেষ করে lesbian' শব্দটির (যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'সমকামী' বলে) একটি সাধারণীকরণ বা অতিসরলীকরণ করা হয় যদি শুধুমাত্র দেহজ আকর্ষণ সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সাফোর লেখায় একটি মায়াময়তা, আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ ছিলো তাঁর লেখা বলে যে একটি কবিতা পাওয়া যায় তা ভাষান্তরে এ রকম

Come to me now again deliver one from

the appressive anxieties , fulfill all that my heart longs to fulfill, and you yourself will be my fellow fighter

'সহযোদ্ধা' এখানে পরিহাসের ভাষা। সাফোর লেস্‌বস এক পটীকী অর্থে 'an island of artistic perfection where lovers of ancient beauty may yet find foothold and dream of yet unexplored continents and realms of future artistic achievement :

উত্তরসূরী কবির কাছে সাফো Sister mother/free souled, fire hearted আমেরিকান কবি এ্যাড্রিয়ান রিচ তাঁর কবিতায় ভূতাত্ত্বিক ধর্মের আধ্যাত্মিকতা সংস্কারের সঙ্গে মিশেছে নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা ফরাসিনী জর্জ সাঁদ নারীর কল্পনাকে স্থাপন করেছেন বন্ধুত্বের বৃহত্তর আঙিনায়, কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে লেসবিয়ানিজমের যে একটি সামাজিক, আধ্যাত্মিক দিক আছে তা বহু যুগ ধরে চেপে রাখা হয়েছে। আর এক ফরাসী কবি কোলেত তাঁর lesbian প্রতিমাগুলিকে নির্মাণ করেছেন বোদলেয়ার এর 'femme damnee' বা 'damned woman' এর প্রতিরূপ হিসাবে তাঁর কাছে নারীসঙ্ঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার "healing effect its maternal overtone which functions as an antidote to man's harsh treatment of women "

পরিশেষে : বাংলার মুখ

ঐতিহাসিক বা ধারাবাহিক ভাবে বিশেষ কিছু দেখে উঠতে পারিনি। তবে হবে ভিন্ন বাঙলায় তিনটি উদাহরণ at random হাজির করতে পারি বিচারের জন্য

রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র' — মৃণালের জবানীতে, "আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙলো তখন ওকে আর এক পেরোয় ধরল আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে, ভালোবাসার এমন মূর্তিতে সংসারে দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, জেন ও মেয়েপুরুষের মধ্যে আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ মিটতো না। জীবনানন্দ : 'কল্যাণী', নবম পরিচ্ছেদে কল্যাণী ও মিনুর অন্তরঙ্গ কথোপকথন। 'দেশ' পত্রিকার ২৮শে নভেম্বর, ১৯৯৮, 'জীবনানন্দ ১' সংখ্যায় ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত এই রচনাটি প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায় ২৯শে মে, ১৯৯৯ সংখ্যায় এক পাঠক 'বিস্ময়ে হতবাক' হয়ে লেখেন 'এখনকার কোন লেখক এই ধরণের কথোপকথন লিখলে তাঁকে লেখায় সমকামিতা প্রদর্শনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা উচিত।' চিঠিটির সম্পাদকীয় শিরোনাম— 'কল্যাণী আর মিনু — তারা কি সমকামী ?' (এই চিঠির এবং

শিরোনামে ব্যবহৃত সাধারণ প্রচলিত সমকামী শব্দটি ইংরেজী homosexual বা same sex love-এর অনুবাদ বলে — আলোচ্য কবিতায় ব্যবহৃত 'লেসবস' শব্দের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাবহিত একারণে আমি 'নারীসখ্য' কথাটি ব্যবহার করছি 'সমকামী'র পরিবর্তে।)

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, দেশ' ৪ এপ্রিল ২০০১ এ প্রকাশিত যশোধরা রায়চৌধুরীর 'দুই বোন'। এমন একটি সুন্দর কবিতা সবটা উদ্ধৃত করতে পারলে খুশী হতাম, পাঠককে অনুরোধ করবো পড়তে। শেষ লাইন দুটি উদ্ধৃত করছি — 'হবে কি গোপনে দিদির সঙ্গে আমারই / প্রেম ছিলো কোনও একদিন, কেউ জানিনি ?'

তিনটি উদাহরণে নারীসাম্যের তিনটি ব্যঞ্জনা — চিলেকোঠার উন্মাদিনী হার আন্তর্ঘাতিক, বহুমাত্রিক চরিত্র নিয়ে, ইতিহাস পুরাণ ব্যবহার করে নারীসাম্যের সংহতির আরো একটি দোতনা সংযোজন করেছে।

ভারতে, দীপা মেহতা প্রযোজিত, শাবানা আজমী অভিনীত 'ফায়ার' (১৯৯৮) ছবিটি এ প্রসঙ্গকে প্রকাশ্য প্রতিবাদের বিতর্কের বিষয় করে তুলেছে — সে ছবির ব্যঞ্জনাও ভিন্নতর। পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের negotiation ও power relation এর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ, পরিবর্তিত বিকৃত হবে নারীসাম্যের সংজ্ঞা।

কবিতাটি হোক সংস্কৃতির এক চিহ্ন : আরো ভয়াহা কবিতা লেখা হবে, হয়তো বা কেউ ভিয়ারেন আশাকরবে সাঁতা সমাজের সখা নিয়ে

কিছু প্রাসঙ্গিক লেখা :

বাণী রায় : স্যাফো

সংযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা, আরবা উপন্যাসের বা মেয়েদের গ্রন্থকতা ; অবিদ্যা।

বর্ষা ঘোষ : কালো মেয়ের ডানা, জলের উদ্ভিদ।

Gilbert & Gubar — Mad Woman in the Attic The Woman writer and the Nineteenth Century Imagination (1979)

Taderman Lilian — Surpassing the Love of Men Romantic friendship and Love between Woman from Renaissance to Present 1981.

অস্তিত্বের সংকট ঃ কবিতার সংকট

রাম বসু

অস্তিত্বের সংকট বলতে আমি কবির বিস্ময়ের কথা মনে পড়ে যায়। সময়ের তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে বিস্ময় তাঁকে বিদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গিত বিদ্ধে তিনি নিজের পরিচয় জানতে চান তখন প্রশ্ন সেই আইডেনটিটির আত্ম আবিষ্কারের, নিজেকে চেনা ও জানার। শুধু কবির নয়, এ সেই নিখাদ সমস্ত মানুষের প্রশ্ন কে আমি? কেন আমি? কোথায় আমি? উত্তর পেতেই হবে বাঁচার জন্য। এই উত্তর বিদ্যালয় অথবা অভিধানে আত্তাম নেই, এর উত্তর খুঁজতে হয় অভিজ্ঞতায় পুড়তে পুড়তে নিজেকে পোড়াতে পোড়াতে। যে যার মতো উত্তর খুঁজে পেতে চায় তার সত্তার পূর্ণতার জন্য। এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন আমার ভাল লাগা এবং আমার যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবিকে। তাঁর নাম পাবলো নেরুদা। "Solitude and multitude will go on being the primary obligations of the poet in our time. In solitude the bottle of The surf on the Chilean coast made my life richer. I was intrigued by and loved the passionately boiling waters and the roche they bottled against the teeming ocean of life, the impeccable formation of the wandering birds, the splender of the sea's foam".

কিন্তু এই পর্যন্ত যদি হতো তবে বলা যেত ঐ তো শুদ্ধ নিসর্গ প্রেম, এটুকু হলে আমি বলতাম, এতো নিসর্গ নয়। মৃত নিসর্গের স্তুতি। নিসর্গ তখনই প্রকৃত নিসর্গ হয়ে ওঠে যখন সে যুক্ত হয় বাস্তব মানুষের বাস্তব সংগ্রামে। নিসর্গ এবং মানুষ এই যে দুটি আপাত পৃথক অস্তিত্ব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক এবং এতেও বিভিন্ন হয়ে অন্য মহিমায় দৃপ্ত। তাই ঠিক তার পরের অনুচ্ছেদে নেরুদা বলেন : 'But I learned much more by the luge t de of lives. from the tenderner I Saw in thousands of eyes watching me together. This masage may not come to all poets but anyone who has felt it will keep it in his heart. will work it into his poems." (Memoirs Pable Neruda A condor Book, Souvenir press (E & A) ltd 1977, P 335 6)

এই আমি, একও অনন্য। যুক্ত বিশ্বের সঙ্গে এবং ফলত, সে নিত্য জীবনের স্ফীত স্রোতের মত্ততায়।

আমি মানুষ এবং কবি। আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিই মানুষ এবং পৃথিবীকে এবং চির অতৃপ্তির আশ্লেষে তাকে আবার শুষে নিই। এই মানুষটি সামাজিক মানুষ। বিশেষ আর্থ-সামাজিক

পরিস্থিতিতে আছে তার সক্রিয় ভূমিকা। তাই বিচার বিশ্লেষণের মাপকাঠিও বাস্তব। সে শুধু অহং নয়। এই মানুষ নায়ক বা Subject। সে বেঁচে থাকে নিজস্ব শক্তির জোরে, বাঁচার তাগিদে, এটাই তার 'Subjectivity of objective power' Economic and Philosophic Manuscript। এ মার্কস খুবই শিল্পীত ভাবে কথাটা বলেছেন Man as an objective sentient being is a suffering being and since he fals his suffering, or passidnate being Passion is man's facolties striving to a toin their objects (ঐ, মস্কো পৃ ১৫৭) কিন্তু মানুষ পাথর নয়। অন্য মানুষ তার 'নীড়'। সে স্নেহ সুবাস। To be Sensous is to suffor এই আছি, আমার অস্তিত্ব, অস্তিবাদীদের মতো নিছক আত্মসচেতনতা এবং ক্ষণ ভঙ্গুরতার আত্মসচেতনতা নয়। এই অস্তিত্ব সার্বিক সামাজিক বা সোসাল মানুষের অস্তিত্ব। মার্কসের মানব চিন্তা আমার কাছে সব চেয়ে ব্যাপক ও অখণ্ড মনে হয়। কারণ সম্পূর্ণ মানুষ বলতে তিনি তিনটি গুণের কথা বলেছেন "টোটাল" "পারসোনাল" আর "অটো এ্যাকটিভ"। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মে ঋমুখীনতা ও নহিমুখীতার সকর্মক সহযোগে মানুষের গভীর সংযোগের কথা বলেন তখন অস্তিবাদীর অহং ঘুচে গিয়ে আমাদের সামনে তাঁরা এক গভীর ও একান্ত বিশ্ববোধ। সে তখন হয় 'এক মানুষ', 'মহামানব', 'বিশ্বমানব', যে The Eternal Man। এই মানুষ হল মানবতা বোধ। শুদ্ধ চেতনা ও পার্থিব বস্তুর মত ধৃত চেতনার কথা। রবীন্দ্রনাথের মানুষ পরিজ্ঞিত এবং অপরিজ্ঞিত। দ্বৈতা দ্বৈতো নিত্য। কোথায় এই নিত্য ও অপরিমিত? সমাজে। সেই সমাজটাই বা কি? 'Above all we much avoid postulating society again as an abstraction vis-a-vis the individual The individual is the social being (Marx, EPM International Publishers New York P 137-138) রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য আর মার্কসের মানববাদ মেল মহামানবের পারাবারে।

কিন্তু এই মানুষ তার সামগ্রিকতা পেল না ব্যক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা থাকার জন্য। সে হয়ে পড়লো অনমিত বা atranated। বিশ্ব প্রকৃতি হল বিমুক্তি। সমাজ থেকে হল বিভাজিত। সে যে উৎপাদন করে তা আর তার থাকলো না। সর্বোপরি সে হল বিচ্ছিন্ন নিজের মত থেকে। অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী সংকট হল এখানে।

এই যে সংকট, সে হল সার্বিক সংকট। পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় তার জন্ম। এই সার্বিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি জনিত আর এক সংকট। পরাধীনতার সংকট। উপনিবেশের সংকট। প্রথম যুগে ছিল উপনিবেশের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। পরে পশ্চিমী ভাব ধারার বিরোধী পরম্পরা। নানা ঘাত প্রতিঘাতে উনিশ এখনো বিতর্কিত অধ্যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, উচ্চকোটিতে পাশ্চাত্যায়ন এবং নিম্নবর্গীয় সমাজের ক্রম দূরত্ব। এই সব যেন বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন ভুবন। ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীল এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকার কথা মার্কস

বলেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে মার্কসের মধ্যে পশ্চিমী উপহারের যে কথা উঠেছে, তা আপাত দৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হলেও বলা যায় যে মার্কস পশ্চিমের কথা নয়, পশ্চিমের মধ্য সভ্যতার মুস্কিলের কথা বলেছেন পরবর্তী কালে মার্কস উপর এই মতও সংশোধন করে নেন।

কিন্তু অনিল শীল এই সময় সম্পর্কে যা বলেছেন তা খুবই সত্য। Between Brahmins, Kayastha and Baidyas an the one hand, and the rush of the Hindu Society on the other there was a considanable gull in social Status and ranking for all their squabbles among themselves they still had a common interst in preventing arrivistes from arriving (nationalism without a Nation in India G Aloysios Oxford P 49 এ উদ্ধৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি উনিশ শতকের মনীষীদের দ্বন্দ্বলোক এবং বহির্লোক ও সামাজিক জীবন কত মারাত্মক ভাবে বিভক্তিত ছিল কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদের সমাজের আধুনিকতা ও পশ্চাদ্বায়ন ছিল সমার্থক এই অর্থে যে তারা পশ্চিমের পুষ্টিপক্ষ হতে চেয়েছিলেন পশ্চিমের ভাবাদর্শকেই গ্রহণ করে পশ্চিমী ইতিহাসে পশ্চিমের পরিবেশ আদর্শ এই সাধনাই সত্তার নিটোল ঐক্য নষ্ট করে ফলে আপনে প্রাণিক সংকট সমগ্র অস্তিত্বই হয়ে ওঠে বিপন্ন। ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া বড় সূক্ষ্ম

অন্যদিকে ঔপনিবেশ আমলের ভিন্ন ভারতবর্ষকে পাক ঔপনিবেশের ভারত আর ঔপনিবেশের ভারত– দুটি ভিন্ন জগৎ

ইংরেজীওয়ালাদের চিনতে ভুল করেনি নইপুল অনুবাদের চার দশক পরে হলেও নইপুল বুঝেছিলেন, 'We pretended to be real to be learning to be preparing ourselves for life we mimic men of the New World one unknown carnes of it, with all its reminder of the corruption that came so quickly to the new ' (The Mimic Men N S Naipal, Pangum P 146) অস্তিত্বের কবি aimecessire নিগ্রোবাদকে তুলে ধরতে বলেন :

To leave

As thereare hyena-men and panther men

So I shall be a gew man

or Kaffir man

or Hindu-from-Calcutta Man

or man from Harlem-sho wan't got the Vote

(Return to my Native Land Aime Cessire Paengiune P 23)

এ কি উগ্রজাতীয়তাবাদ? রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব বোধ এই ধারণাকে সমর্থন না করলেও সভ্যতার সংকটের ক্রোধের কথা মনে পড়ে। শক্তি মদমত্তদের তিনি ধিক্কার হেনেছেন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য — সমস্যা কিন্তু পূর্ব পশ্চিমের নয়। সমস্যা হল সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতার। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নয়। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাই প্রশ্ন যেখানে কবি ফিরে পান যুদ্ধ বিবেক, মুক্ত হতে পারেন দেহজ সংস্কৃতির মধ্যমূলে। এবং সাথে সাথে গ্রহণ করতে জাতীয় মর্যাদার গৌরব দাঁড়িয়ে বিবেকবান, মানব মুক্তির জন্য আহ্বান ধ্বনিত বিদেশী সাহিত্যের সাবাৎসার অনুকরণে নয়। মিথিক মানব হয়ে নয়, সত্যিকারের মানুষ হয়ে সোসাল মানব হয়ে। কিন্তু আমাদের ত্রিশ দশকের আধুনিক কবিরা পুরোহিত ও পদ্মা কবি কুল কোন দর্পন ও অস্তিত্ব প্রশ্নের সমাধানের জন্য লরেন্স এলিয়টদের দোরে দোরে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে ঘুরলেন দেশ যখন মুক্তির জন্য, উত্তাল? শুধু নতুন কৃষ্টির জন্য? কৃষ্টি আর সঙ্কটে এক কথা নয়

অকতাভিও পাজ একটা চমৎকার কথা বলেছেন — প্রত্যেকটা রাজনৈতিক সংকট আসলে একটা আত্মিক সংকট। আজ আত্মিক সংকট থেকে মুক্তির পথ সম্ভবত বিযুক্ত বা এ্যালিয়েনেশন থেকে মুক্তির জন্য অন্তরে বাইরে নিরন্তর সংগ্রামের ফলে নতুন মানুষ হবার প্রচেষ্টা। জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া এবং নিজেকে বিশ্বলোকের সঙ্গে গ্রথিত করা। প্রসঙ্গক্রমে, সিঙ্গ নিজের কবিতার ভূমিকা থেকে শিক্ষা নিই। — Even if we grant that exalted poetry can be kept successful by itself, the strongthings of life are needed unpoetry also to show that what is exalted or tender is not made by feeble blood. It may almost be said that before a verse can be human again it must learn to be brutal again." (Plays, Poems and Prose, John M. Synge, London, Every Man's Library, Ed. Ernest Rhys, 1946, P. 219)

উত্তর-উপনিবেশিক জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে ষাটের বাংলা কবিতা

গণেশ বসু

সূর্যোদয়ের আগে যেমন আকাশ গভীরভাবে লাল হয়ে ওঠে তেমনি উপনিবেশ বিনাশের আগেই উত্তর-ঔপনিবেশিক কবিতা যা হওয়া উচিত তা আধুনিকতার তাৎপর্যে জন্ম নিয়েছিল আমাদের ভাষায় চল্লিশের দশকেই। সে সময় লক্ষ্য করেছি উপনিবেশবাদের ছিন্নমস্তা চেহারা, ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের নগ্নরূপ বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের ধুন্ধুমার। সেই ঘনঘটার দিনে বিষ্ণু দে সমর-সুভাষ সুকান্ত মণীন্দ্র মঙ্গলাচরণ রাম বসু প্রমুখ কবিরা, উপনিবেশবাদ বদলে দিয়ে কী ব্যবস্থা আমরা অর্জন করতে পারি তারই সুস্থিতীল ভূমিকা নিয়েছিলেন কবিতা ও জনগণের সৃজনশীল ভূমিকা মিলে মিশে ভাষা পেতে চেয়েছিল তাদের রচনায়। এই দশকটি ছিল বিশ্বের শালমুক্তির দশক। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল পৃথিবীময় উপনিবেশ ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার ঝড় বইছে। সেই ছাপ আছে বিষ্ণু দে স অধিষ্ঠে, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবিকেশ এ, রাম বসুর তোমাকে মঙ্গলাচরণের মেঘ বৃষ্টি ঝড় — তরুণ সান্যালের মাটির দেওয়াল যা সুকান্তের ছাড়পত্র তো ছিলই।

স্বাধীনতার পরে উদ্বাস্তু প্রবাহ কংকাল খেলেঙ্গানা আন্দোলন ভারতের সংবিধান রচনা, প্রথম পরিকল্পনা, প্রথম সাধারণ নির্বাচন— সব মিলিয়ে ভারতের অর্থনীতি স্থিতিলক্ষ্যে অবিচল থাকবে আশা করা গিয়েছিল কিন্তু তা হল না। খাদ্য সংকটের সুযোগ নিয়ে ও পি এল ৪৮০ ব নিয়মানুযায়ী কুলি ঋণের সহায়তায় নয়া উপনিবেশবাদের নতুন প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার ছায়াবিস্তার ঘটায় এদেশে। মার্কিন প্রচার দপ্তর ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতির উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করল নিপুণভাবে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হল ভারত চিন সংঘর্ষের কালে ও পরে 'শিল্পীর স্বাধীনতার মুখচ্ছদে'। শুধু তাই নয় ১৯৬৪ সালে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের দ্বিধা বিভাজন ও ১৯৭০ সালে ত্রিধা হয়ে যাওয়া আমাদের উত্তর উপনিবেশিক সাহিত্যকর্মটি পথভ্রষ্ট হতে শুরু করে অন্যদিকে কসমোপলিটান সাহিত্য কর্ম মুখ হয়ে দেখা দেয়।

উত্তর উপনিবেশিক উজ্জ্বল কবিতা মানবিক স্বভাবকে প্রাধান্য দেয় এবং জাতপাত গাত্রবর্ণ দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে মানুষকেই প্রাধান্য দেয়। এই কবিতার শিকড় থাকে স্বদেশি জনমৃত্তিকার মধ্যে অর্থাৎ জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, লোকস্মৃতি, লোকপ্রতীক ও আইকনগুলি এই কাব্যরচনায় উপমা প্রতীক রূপক চিত্রকল্প ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে মুহূর্তের স্মৃতিলাঞ্ছনা বিপুল মানবিক ভূমি জাগিয়ে তোলে। উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য চিন্তা লেভি স্ট্রস ফ্রঁসোয়া লাকাঁ এবং বিশেষভাবে সাসুরকে মনে রাখে।

উত্তর উপনিবেশিক সুস্থ ভাবনাটিকে অনুসরণ করছে—

১ স্বদেশ তার ঐতিহ্য ইতিহাস ও শিল্পকর্মের মানবমুখীনতা।

২ কবিতার সাধারণ দিকটি হল শব্দকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীল শ্রম বিজ্ঞান প্রকৌশল নান্দনিক বিষয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

৩ প্রকাশের উপায় হিসেবে স্বাভাবিক প্রকৃত প্রতীক, আইকনগুলি ব্যবহার করে, নিছক চিহ্ন বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার নয়।

৪ সমস্ত ক্ষেত্রে এই কবিতা শোষণবিরোধী সন্ত্রাসবিরোধী ও আন্তর্জাতিক

৫ ভিন্ন দেশ থেকে মানবমুখীন সত্তা ও শিল্পের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে পক্ষান্তরে বিশ্ববিরুদ্ধবাদ বা কসমোপলিটানিজম।

১ অবস্তু সহজ সরল ভাষা শব্দ ও ছন্দ উপর ভিত্তি করা মানসভঙ্গির কাজে লাগায়

২ মানুষের সমাজ ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বদেশ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিক বিযুক্তকে মুখ্য করে তোলে

৩ মৃত্যু বীভৎসতা এবং করুণ কাতরতা মানুষের অধঃপতিত জীবন দেখানোর জন্য ঘৃণ্য প্রতীক ব্যবহার করে।

বর্তমানে উত্তর উপনিবেশিক কবিতার ভাবনা যেমন রয়েছে আন্তর্জাতিক, তেমনি রয়েছে কসমোপলিটান কবি। যাঁরা বিশ্বায়ন ও বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ভূমিকা নেন, জাতির নিকট বিষয়ে সজাগ থাকেন, জাতির জাতির মৈত্রীর লক্ষ্য কামনা করেন অর্থাৎ শোষণশূন্য মুক্ত মানুষের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক। পক্ষান্তরে যাঁরা রাষ্ট্রের সব কিছু নির্দ্বিধায় মানেন, যে পুঁজির শক্তি গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে এক অদৃশ্য বিশ্বরাষ্ট্র তৈরি করার কাজ করে চলেছে তাদের ভাবাদর্শ ও ভূমিকা নির্দ্বিধায় যাঁরা মানেন জীবনে প্রয়োগ করেন এবং কবিতায় তা দোতিত করেন তাঁদের আমরা বলি বিশ্ববিরাজবাদী।

উভয় ধারারই প্রতিফলন দেখা যায় বাংলার বাংলা কবিতায় উত্তর উপনিবেশিক আন্তর্জাতিক কবিতার বিপরীতে বিশ্ববিরাজবাদীদের আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল পঞ্চাশের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' সহ সেই সাপ্তাহিকটি (বর্তমানে পাক্ষিক) যেখানে থেকে একদা মুদ্রিত হত "আমেরিকান রিপোর্টার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বহু ওয়ার্কশপের ভিতর দিয়েও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে বাংলা কবিতায় বিশ্ববিরাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে পুঁজির প্রকট বিকাশ এবং তা থেকে সৃষ্ট ব্যক্তিক বিযুক্তি বাংলার কবিদের মধ্যেও কখনো কখনো সংক্রমিত হয়েছে সন্দেহ নেই। অলক্ষ্যে বিশ্ববিরাজবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বা তাঁদের প্রশ্রয়দাতা হবার মানসে, বা স্রেফ চটকদার হবার প্রলোভনে বিশ্বাস্তি যে আসেনি তা নয় শুধু কবিতা ক্ষুধার্তদের কবিতা, ধ্বংসকালীন

কবিতা আন্দোলনের মধ্যে কেউ কেউ সেই বিবর্তনের রকমফের দেখতে পাবেন বা দেখে থাকেন। কিন্তু তাতেও ধরা পড়ে সময়ের কণ্ঠস্বর

ষাটের বাংলা কবিতা আলোচনায় আমি ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ এই বারো বছরের সময় বিস্তৃতিকে মানা করছি এই সময়বৃত্তে যাঁরা কবিতা লেখা শুরু করেছেন বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন কম বেশি যাঁরা ক্রোধী, অভিমানী নিরপেক্ষ, ভালবাসার প্রার্থী বা সমাজ বদলানোর স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, মলয় রায়চৌধুরী, বদ্রেশ্বর হাজরা, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, কমলানিল্লু দে, প্রিয়ব্রত গুহরায়কুলতা, পুষ্কর লাহা গুপ্ত, বুদ্ধদেব লাহা গুপ্ত, তুষার রায়, শান্তনু দাস, মন্মথ লাহা গুপ্ত, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত লাহা, মৃণাল বসুচৌধুরী সহ অনেকেই রয়েছেন কবিপত্র এই দশক, শ্রুতি সম্প্রতি দশাপট সীমান্ত (নব পর্যায়) বহ্নিশিখা প্রভৃতি পত্রিকা এই কালবৃত্ত বিশেষে ভূমিকা নিয়েছিল কবিতা আন্দোলনে। মিনি পত্রিকা কবিতা সাপ্তাহিকী দৈনিকী ঘণ্টিকী ইত্যাদিও বের হয় চমক দিয়ে। আশিস সান্যাল বের করেন বেঙ্গলি লিটারেচর, কাগজ কলকাতার হিন্দি, উর্দু ওড়িয়া কবিদের শূন্য সম্পর্কভিত্তিক কবিতায় ভাবইমেজের দিক প্রকাশ পেতে থাকে এতে মলয় রায়চৌধুরী সমীর রায়চৌধুরী প্রমুখ ঢাকা আন্দোলনের নেতারা নানা ছোট ইশতেহার ছোট ছোট সংকলন প্রকাশ করেন। এঁদের সম্পর্ক ছিল মার্কিন দেশের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠান বিরোধীর সঙ্গে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবস্থান আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে। এঁরা ব্যক্তিগত যৌন সম্পর্কের পরিচয় নীতি ও বিশ্বরাজনীতি ধরতে চাইতেন দীপেন রায়, শিশির সামন্ত প্রমুখ পরিচয়, সীমান্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে উত্তর উপনিবেশিক আন্তর্জাতিক ধারাটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন প্রিয়ব্রত তাৎপর্যে এই ধারারই কবি গোপীনাথ দে। দ্রোণাচার্য ঘোষ তো অকালেই পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন।

ষাটের পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে যাঁরা কসমোপলিটান তাঁদের স্মার্টনেস, চালচলন ভাবভঙ্গি যৌনতা ইত্যাদি এই সময়ের দু একজন কবির মধ্যে ভুল করে উঁকি ঝুঁকি দিলে তা ষাটের কবিতার চরিত্র নয় আসলে, যখন লেখা হত 'চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা' কিংবা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রমে যজমানি, কিংবা 'একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা নারীর উরুর ঘোড় খোলা তন কীরকম আশ্চর্য করল, কিংবা 'ভালোবাসা ততদূর যতদূর লিঙ্গের প্রভাব', কিংবা 'ধ্যান ও অস্থিরতা / এক জীবনে, উরুর সামনে উরু, উরু নয়, বেদি সামনে লিঙ্গ', কিংবা 'কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে' কিংবা কেউ যখন ছোট মাসির বুকে মুখ লুকিয়ে প্রথম যৌন আস্বাদ পাওয়া অনুভব করে বলে জানায় তখন সেইসব কবি দেশের ঐতিহ্য, লোকস্মৃতি ইত্যাদি অস্বীকার করেউত্তর উপনিবেশিক বিরাজবাদের প্রস্থানভূমিই বাংলা কবিতায় নির্মাণ করে দেয়। এভাবেই পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি যখন তিন জোড়া লাথির

[illegible] রচনাবলী [illegible] কবি [illegible] এমন বুঝতে অসম্ভব হয় না মার্কিন বিদ্রোহবাদী [illegible] কাছে কাঁদবে এসব কবি আত্মসমর্পণ করে আমাদের মনীষীদের চরিত্র হননে গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকা নেন। যাটের কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষ দেখা যায়নি বলে এই সময়ের কবির ব্যবসায়ী পত্রিকা কুলের ও আনুকূল্য তেমন পান নি

যাইহোক যাটের কবিদের মূল ঝোঁকটাই ছিল স্বদেশি মন্ত্রকে বিশ্বভাবনায় সংযুক্ত করা ব্যাপক সম্ভব। অন্বয় ও অনন্বয়ের দোলাচলও ছিল কারো কারো মধ্যে অবশ্য এই দুই ভাবনাই রয়েছে কারো মধ্যে আবার অন্বয়ের সাধনাটি বেশি যাঁরা অন্বয় ও অনন্বয় দুটি বিষয়ই কবিতায় আকর্ষিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। আমরা মনে হয় পবিত্রর মতোই অনেকের নিয়তি ছিল এক, যাঁদের জন্ম পূর্ববঙ্গে এবং অবস্থা বিপর্যয়ে যাঁদের শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে এঁরা বাংলা দেখেছে ঐ বাংলার স্মৃতিময় মানবিক ভূগোল অন্যদিকে হঠাৎই অন্য দুর্গত সমাজ ও ভূগোলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাওয়া এই মানস সংগ্রামে পবিত্র অবশ্যই বিনষ্ট হতে পারতেন কিন্তু তাঁর ভিতরে স্পর্শপ্রবণতা ও তাঁর কবিতাগুলোই তাঁকে বাঁচিয়েছে এবং সফল কবিকৃতির কলাকুশল ঘটিয়েছে। আমার যতদূর জানা পবিত্র, [illegible], আশিস তুলসী এমনকি আমিও ঐ সময়েই তাড়িত হয়ে এই বাংলায় এসেছিলাম। পবিত্র উত্তর ২৪পরগনার কাঁকীনাড়ার বাসিন্দা ছিলেন নিতাই সেখানে শরণার্থী দেখেছেন। দেখেছিলেন চারদিকের সংগ্রামী অজস্র মানুষের মুখাবয়বও। জানিনা কবির ব্যক্তিজীবন কবিতার ভূগোলকে থাকে কিনা নাকি বাস্তব জীবন দূরে সরিয়ে কবিজীবনই গড়ে তোলা যায়। পবিত্র তাঁর কবিতায় তরুণ বয়সে কালো চেনা বলিষ্ঠালের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে কলকাতার সংগ্রামী অথচ ভাসমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বেঁচে থাকতে থাকতে জীবনকে বহু ক্ষেত্রে বাজিও ধরতে চেয়েছিলেন। অনেক পরে তিনি 'আগুনের বাসিন্দায়' তাঁর যে শ্রেণীদ্বন্দ্বময় দেশে বালক বলেও ক্ষমা ছিল না 'অভিমন্যু' কবিতায় তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেন লেখেন—

লড়ছি তো আমি প্রাণপণে নেই অস্ত্র
ধনুকের ছিলা সারথী অশ্ব রথের চূড়া
মাটিতে লুটিয়ে রক্তের নদী পায়ের তলে
সূর্য এখন অস্তাচলে
নিরস্ত্র আমি। শিশু বলে কোনো ক্ষমা নেই

পবিত্র পুরাণ বিষয়ে যথেষ্ট মনস্ক। দহন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হয়েও আসক্ত। বরং তাঁর কাছে মনে হয়েছে,

আমি স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন বাষ্পিত গোলাপ

অশান্ত অতৃপ্ত এক দেবশিশু পরম সুন্দর

কোথায় এলাম? এই শাপদগ্ধ প্রাচীন পাথরে?

এবং দেখা গেছে ইহা পতন শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে যায়

মিলিয়ে যাবো ঐ শূন্যে অবিরল শূন্যে,

বাতাসে অগ্নিতে ছড়াবো দেহ শেষ ভস্ম,

মাটিতে রেখে যাবো শয়তানের শেষ শর্পিল

দেবতা নয় আমি নারকী চুল্লিতে দগ্ধ।

এবং বারবারই তিনি এক সুন্দরের সাধনা করেন যে সাধনা সুন্দরকে কোনো অভিজ্ঞান দেবার সুন্দর এবং নিরাকার মানসিক অস্তিত্ব যার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা

বিযুক্তি ও সংযুক্তির দুই অভিজ্ঞানই পবিত্রের কবিতার অন্যতম দিক। আবার তিনি সুন্দরকে জয় করে নেওয়ার অস্ত্র ভেবেছেন শিল্পকেই পুরাণ তাঁর রচনায় নতুন মাত্রা সংযোগ করে অনাগত তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। পুরাণের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক রচনা এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সুন্দরের স্বপ্নকল্পনা তাঁকে এক বিশেষ কবিচরিত্র দিয়েছে। এই প্রবাহমানতাই তাঁর উত্তর উপনিবেশিক চরিত্র তিনি পশ্চিমের সহযোগী ভারতীয় ক্রমি পুঁজিবাদের সমালোচক তাঁর ধ্বংসকালীন কবিতা বা তৃতীয় সাহিত্য কার্যত বামপন্থাকেই গ্রহণ করে কিন্তু পবিত্রর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যৌথ জীবনচেতনা বিষয়ে সংশয় সন্দেহ বিশেষ ভাবে বারবারই মানুষের ক্লিন্ন মৃত্যু অসহায়তাবোধ তাঁকে বোধহয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী করে তুলতে পারে নি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রয়েছেন অশিস সান্যাল। তিনি বামপন্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েও পবিত্রর সংশয়িত অভিব্যক্তিসমৃদ্ধ কাব্যকলার কাঙ্ক্ষিত পৌঁছন নি। পবিত্রর রচনায় যে কাব্যময়তা রয়েছে তাতে মনে হয় পবিত্রর জীবন কবিতার জন্য সমর্পিত, আশিসের তেমটি নয় সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ে তিনি অনেক সচেতন। তাঁর কাছে আধুনিক জীবন হল

অতীত জেনেছি তাই সময়ের পরাভূত স্মৃতি আর শ্রুতি

গতিময় শুধু বর্তমান—

আমাদের এই জন্ম অন্য এক জন্মের প্রস্তুতি।

তবু রোজ চেয়ে দেখি আমি

বাড়ছে বুকের ক্ষত।

চতুর্দিকে স্ফীতমান আমাদেরই প্রভূত মন্থামি

একরকমই বলা যায়, বুদ্ধদেব গুহকে। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম 'বিষণ্ণ ঋতু'। তাঁর কাছে সময়কে মনে হয়েছে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। ইতিহাস যেন —

দীর্ঘায়ু মানুষ মারা গেলে

জনশূন্য প্রান্তরে একলা আমি

ইটি কিছুক্ষণ [illegible] নয় [illegible]

তোমার অথবা কোনো সম্রাটের নয়

তার দেহ এবং বিষাদ খুঁজে ইটি

সমস্ত মিছিলে একা—

অন্নবেতনের নিচে অবাঞ্ছিত শিশু

দুহাতে খেলা করেছে দেখি।

এই পংক্তিগুলি [illegible] মূল বিষয় [illegible] অন্নবেতনের নিচে অবাঞ্ছিত শিশুর [illegible] ইটি যেতেও সীমারেখা মুছে [illegible] মানচিত্র [illegible] বারবার [illegible] এবং নতুন করে নির্মাণ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিজেরই। অসীম মরণের বারবার বেঁচে ওঠাই তো জীবন

আমাকে আর [illegible] [illegible]

সেই যে জীবন।

বারবার কবি তার প্রতিটি [illegible] মনে হয়, কিন্তু তার পংক্তিবিন্যাস আপাতদৃষ্টিতে নিয়ম আরোপনীয়, [illegible] মনে হলেও আসলে তা খুবই সুবিন্যস্ত পংক্তিতে রচিত, তাঁর অক্ষরপুঞ্জ ও স্বল্পাক্ষর পংক্তিগুলি খুবই অর্থপূর্ণভাবেই রচিত। শুধু পংক্তিগুলি ভেঙে দেওয়ামাত্র, তাঁর কবিতায় প্রতিটি পংক্তি এক একটি স্বতন্ত্র চিন্তার অভিব্যক্তি। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসায় আছে একা হয়ে যাওয়া বা যৌথ জীবনে বাঁচা যাই হোক না কেন, সব মিলে কোনো পরমজীবনকে আকাঙ্ক্ষা। —

দুঃখ ভোগ [illegible] উপেক্ষা [illegible] নামে—

[illegible] জন্য জল এবং [illegible] জন্য [illegible]

বাঁচার নামে উৎসর্গ করলাম আয়ু

আমি আমার জন্য আমাকে রোজ

বিলিয়ে দিই—

বাস্তবের সব সময়েই চেয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান সত্ত্বেও একটাই মানুষ হয়ে ওঠা।

রবীন্দ্র সুর আমৃত্যু মানুষের জন্য পৃথিবী রচনার স্বপ্নই দেখে গেছেন, দেখিয়ে গিয়েছেন তাঁর চরিত্র 'অন্তুজ' নদীতেই উজ্জ্বল। তিনি সব সময়েই ছিলেন অথক সন্ধানী। এই বাংলার এক শিল্পাঞ্চলে বসবাস করে তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা ছিল মানুষের অপরিমিত প্রকৃতি, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ। যে পটিকলের জগাতে তিনি জীবনপঞ্জীকার জন্য একদা শ্রমিকদের সামান্য মজুরির ছবি দেখেছিলেন সেই জীবনটি ছিল তাঁর কাছে প্রবল অনুভূতি।

শোণিত লোলুপ যারা

সকলেই বাঘ নয়,

মশা আর ছারপোকার অসামান্য কামড়েও

বহু রক্ত খরচ হয়েছে ঃ

তবে জন রোকেফেলার কোনোক্রমে পৃথিবী মানুষটান নিশ্চিহ্ন হবে না। উত্তর উপনিবেশিক জীবনে, পুরনো আত্মসম্মানহীন ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের স্বপ্ন ও স্বপ্ন তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল উপনিবেশিক ও উত্তর উপনিবেশিক সমাজ অর্থনীতির সংঘর্ষে বিশৃঙ্খল এক নিষ্ফলা ব্যবস্থারই প্রবর্তন ঘটেছে। তাঁর কাছে মনে হয়েছে।

গণতন্ত্রে কার কতখানি কপট নির্মোহ

এখন ভারতবর্ষে কেউ তা জানে না।

কিংবা

অস্থিত শূন্যতা এক মানসিক পক্ষাঘাত প্রাণান্ত প্রমাদ

ফানুসের মতো ফাটে মানুষের শেষ ভালোবাসা

তাঁর প্রার্থনা, ঐতিহ্যের স্বীকরণে—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে

উদয়াস্ত অন্নোদয় স্বেদরক্তে জীবন জোনাকি

ভোজালি পুরিশি দাঙ্গা অতিক্রান্ত এবার সহসা।

অনিকেত জীবনে ছিল তাঁর সুস্থ নিকেতন পাবার সাধ। এই সাহিত্যে সাধ্য সাধনতত্ত্ব জীবনবিতৃষ্ণার দিকেও কখনো ঠেলে দিয়েছে, আবার কখনো জীবনমুগ্ধ ঝঞ্ঝাময় পুরুষে রূপান্তর ঘটিয়েছে। মাটির কবিদের এই একটি বড়ো দিক, তাঁদের পায়ের তলায় যেন ছিল সর্ষে, কোথাও দাঁড়াতে পারাই ছিল অসম্ভব, থিতু হওয়া তো দূরবস্থান

পরেশ মণ্ডল, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্পের নিরিখে যুদ্ধ কবিতার সাধনা করেছেন। এঁদের হয়তো মনে হয়েছিল চারদিকে অভিজ্ঞতার বলি চিহ্নিত অস্তিত্বের উর্ধ্বে আছে মানুষের যুদ্ধ ও অযুদ্ধের জীবন, যে জীবন কিছু কিছু শব্দের অনুষঙ্গেই ধরা পড়ে। শব্দব্যবহারে এঁরা প্রত্যেকেই মিত। আঙ্গিকের নতুনত্বে আস্থাবান চিত্র নির্মাণেই মগ্ন যেমন—

১. বললুম যাও

গেল না

পর্দায় ছাপা পাখির চোখে জল

বললুম থাকো

পাখিটা উড়ে গেল (পরেশ মণ্ডল)

২. প্রথমে ১

তারপর ২

তারপর ৩

তারপর অসংখ্য কড়া নাড়ার শব্দ

শব্দ ১

শব্দ ২

শব্দ ৩

শব্দ শব্দ শব্দ (পুষ্কর দাশগুপ্ত)

৩ 'ভাল আছি' বলতেই

থার্মোমিটার দেখতে পাই

'চললুম' আর সঙ্গে সঙ্গে

দরজা বন্ধ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

কংকালটাকে প্রশ্ন

কে বেঁচে আছে?

মন্মথ দাশগুপ্তের কবিতার বিশিষ্টতা শিষ্ট কিশোর উদ্বেলে বেড়ে ওঠা স্মৃতিমগ্নতায় মেদুর। শব্দ প্রয়োগে খুঁতখুঁতে, সচেতনতা লক্ষণীয়। অনায়াসে তিনি বলেন

তোমার মুখের গাঢ় লাবণ্যকে ছেঁড়ে বলতে গিয়ে

'সুন্দর' শব্দটি আমি বহুবার ব্যবহার করে

করেছি মলিন কত ভালোবাসি 'ভালোবাসি' বলে

চিৎকারে ছেঁড়েছি আমি শব্দের নিখুঁত নীরবতা।

মনুষের মধ্যে আত্মিক প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়—

শব্দ তুমি হাত ধরো

মৃত্যুর

নিঃসঙ্গতার

রক্তাক্ত হৃদয়ের

এবং

অসহায়তার

অনন্ত দাশ ছিলেন যুক্ত ও স্পষ্ট জীবনবিষয়ে সংগ্রামবদ্ধ কালের দুইধারার ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত লিখেছেন

সময়, আমার কাছে বিষ হয়ে আছে

আমি তার উৎকণ্ঠিত নীলে

একরাশ দুঃখালোক ঘৃণা ও ব্যর্থতা নিয়ে

যন্ত্রণাজর্জর হয়ে ঘুরি।

ব্যক্তিজীবনে নিকলিত সুশৃঙ্খল কর্মে যুক্ত থাকার জন্য তাঁর কবিতাতেও এক ধরনের সুশৃঙ্খল শব্দবিন্যাস আছে। বাচবন্ধে গ্রামীণ জীবনের স্মৃতি তাঁকে মথিত টানে তবু যেহেতু তাঁর বাংলা দেশবিভাগজনিত যন্ত্রণার ছাপ নেই তাই বলেন,

না, আমি নদী হতে চাইনি

সমুদ্রও নয়

আমি এক শিউলি ফুলের শান্ত স্নিগ্ধতা বুকে মেখে

শরতের হাল্কা নীল নির্মল কুট্টিমে

পাহাড়ি হয়ে ভেসে বেড়াতে চেয়েছিলাম
চেয়েছিলাম মানুষের বিসালতাকে
বুকে ধরে রাখতে।

তিনি লিখছেন,

ধমনীর প্রতিটি স্পন্দনে
পাইনি কি বিচ্ছিন্নতার কাতর যন্ত্রণা?
আমি সেই পাপড়িগুলো
একে একে সাজাতে গিয়ে দেখি
আগাছায় ভরে গেছে ফুলের বাগান
এক অর্থহীন ভীরুতার বোঝা কাঁধে নিয়ে
হতাশায় ভেঙে পড়ছে অসংখ্য মানুষ।

বলা যেতে পারে, অন্তত তাঁর কাব্যের [illegible] শান্ত স্নিগ্ধ ভাবের বিদীর্ণ করা নিয়ে আধুনিকতার পদক্ষেপে আত্মই হয়েছেন। সুস্থ ভাবনা ও বিশ্বব্যাপী মনস্কতা দুই ই তাঁকে কবিতায় নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে।

তাঁর সন্ন্যাসী কবি বন্ধু [illegible] তিনিও পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে বরাক উপত্যকায় কৈশোর কাটিয়েছেন। অহমিয়া ও বাংলা ভাষাভাষীদের উপরে আসাম সরকারের চাপও তিনি দেখেছেন। কৈশোরে বাস্তুভিটাচ্যুত হয়ে যে দেশে বসবাস করতে এসেছিলেন সেখানে মৌলবাদী চাপ সহ্য করেও ভাষা-বৈষম্যের চাপের তলায় পড়েন। তাঁর ও তাঁর অগণন সহযোগীর বাঙালিত্বের অভিমান তাঁকে অস্থির করে রেখেছিল। স্বদেশ, স্বভাষা এবং তৃতীয় জগতের চেতনায় তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে অনীহা থাকায় যন্ত্রণাই তিনি 'হাজারদুয়ারি ঘরে' দেখিয়েছেন। যেমন,

তোমার দুয়ার তুমি খোলা রাখো কিংবা বন্ধ করো
বিকল্প ইচ্ছায় তাতে তৃতীয়জগতের চেতনায়
আর কতটুকু ক্ষতি শুধু একা মৃতকল্প ধরো
শব্দের বাহিরে ভুল অন্য এক অন্ধ বিস্তৃতায়
হৃৎপিণ্ডে স্বপ্নভ কান্না তুমি যার নিরালম্ব স্রোতা

কেউ নেই সমস্তপথী ভয়ংকর অস্তিত্ব সোজানে

কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছা যায়?

অবশেষে তিনি বলেন,

হৃদয়ে চলেছে যদি কোড়ামাটি বিন্দু বিলাপে

নিসর্গ তখনো স্নিগ্ধ অভিজ্ঞার আনন্দ আবর্তে

করুণাসিন্ধু বাঙালি লৌকিক বহু আইকন কবিতায় ব্যবহার করেছেন এবং এ ভাবেই শিকড় থেকে স্বাদ নিয়েছেন।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে। দৈনন্দিনে বসবাস করেছেন ভাটিপাড়ায়। তিনি পাকিস্তানে বাংলা ভাষায় পূর্ত বৈচিত্র্য দেখেছেন, দেখেছেন ধর্মের মৌলবাদ এবং এপারে বাংলায় এসে দেখেছেন গণতন্ত্রের নামে বিকলাঙ্গ পুঁজিবাদের বিকাশ, ছলনা ও নীচতাময়তা। চট্টগ্রামের নদী-সমুদ্র পাহাড়ের প্রকৃতির এক অক্ষয়ক্ষত মিলনস্থল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন পাটকলে। ঝোঁসো জড়ানো মাথার চুল দেখার ও অভিজ্ঞতায়। এই বিপুল বিস্তৃতিই তাঁর কবিতার বিষয়। তিনি স্বাধীন ভারতে পাকিস্তানের আইকনকে উল্লেখ করে ধর্মান্ধতার গণ ও মানবিক মহিমাকে চূর্ণ করার জন্য রাজনীতিকদের বর্বরতার দেখেছেন। এবং এক্ষেত্রে তরুণদের হয়ে এই পুরনো উপনিবেশকে নতুন উপনিবেশের কবলমুক্ত করার জন্য, বহু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি কবিতায় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি আমাদের দেশে ভোটাধিকারসম্পর্কিত বিষয়ে চমৎকার তাঁর মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ ভাবে তাঁর স্পষ্ট চরিত্র দেখা যায় সকল দলকে তরুণ বিদ্রোহীদের সহযাত্রী হতে।

"নজর রাখতে হয়,

কারা কখন কীভাবে কেন লিখছে এবং কী লিখছে

কারা মুছে দিচ্ছে এবং কারা তাবৎ মোছামুছি ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়ে

আবার লিখছে, সবই আমাকে মুখস্থ করতে হয়।

এই যে ক্ষোভ, তা সেই গান্ধিনগরে এক বর্ণের অনুকরণ যেন —

অধ্যাপক বলেছিলো : 'দাটিস্ ব ড. আইন কেন তুলে নেবে হাতে?'

মাস্টারের কাশি ওঠে 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে।'

উকিল সতর্ক হয় : 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'

চটকলের হুকুমিরা 'এবার পাঁদারো শালা হারামি ও সিংকে।'

মণিভূষণ পুরোপুরি গদ্য চলতি শব্দ নিয়ে কবিতা লিখেছেন এবং কার্যত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন যেন। কবিতাকে বিপরীতে রেখে তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন

উনুন জ্বলেনি আর কতদিন ধরেই সেই ভয়ঙ্কর শ্রেণী বজ্রধারা

গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।

দুর্গত বালক শ্রমিক নিয়েও তাঁর লেখা মনীন্দ্র ভীষণ একটি ইঙ্গিতময় কবিতা

কিন্তু পাঁউরুটি কেটে দুটুকরো করে দুজনকে দিয়ে দিলেও তার হাতে আর একটা জিনিস

থাকে — ভাবতবর্ষের অন্ধকার আকাশে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বিদ্যুতের মতো

আট ইঞ্চি লম্বা ঝকঝকে একখানা ছুরি।

এই সময়ের শ্রমিক কবিতায় ছাপ ফেলেছিলেন দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অজিত দত্ত প্রমুখ। দীপেন এক দুঃখী বালক শ্রমিককে স্মরণে রেখে সুন্দরবন থেকে শুরু করে কলকাতায় বস্তি ও অন্যান্য জীবনকে সমাজ পরিবেশের ও উপরে তুলে ধরেছেন। তিনি যেমন কখনো বালকের সঙ্গে হেঁটেছিলেন, তেমনি হিমালয়ের কাঞ্চন ও হরিণের পায়ে পায়ে হেঁটে প্রকৃতির প্রজাপতি মানুষের রূপ দেখেছেন। তাঁর রচনায় মেলে দুঃখী ও ক্ষুধিত মানুষের ধৈর্যবান সাধারণ অভিযাত্রা। তিনি অনায়াসে বলেন

মানুষের যে চেতনা মৃত্যুসীমা ছুঁয়ে

গাছের ডালের ওপর নির্ভরতায়

শুয়ে থাকে শিশু মা-র বুকের ওপর

কলকাতা কি তাকে ছুঁতে পারে।

বানডামি অভিজ্ঞতা।

শিশির সামন্ত অনেক বেশী বুদ্ধিবাদী। তাঁর রচনায় আছে আমাদের ক্লিষ্ট মুহূর্তগুলিকে শব্দের সংযোজনে আর্দ্র করে নির্জন ব্যবহার করে জাতীয় অভিব্যক্তি তুলে ধরাতে

বাড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী কবিতার। তবে তা কবিতার শর্ত মেনেই সহজ উচ্চারণ তাঁর—

কে বলে ভয় নেই পতাকা লাল রক্ত গোলাপে কাঁটা আছে

তবু সে সুন্দর

তবুও ঝড় আসে, তবুও ছায়াগাছ, তবুও রোদ্দুরে

একলা পড়ে আছে

তবুও প্রতিবাদ তবুও ধুলো ওড়ে, সোনার মেঘে মেঘে

ব্যাকুল ছায়াগাছ।

পার্থ বাহা সমাজমনস্ক। দার্শনিকতার উজ্জ্বল মন্দদীপিত তবে আঙ্গিক সচেতন। তাঁর উচ্চারণে মাত্রা পায়—

তোমার হৃদয়

হয়তো আমার জন্য কোন ঘর

স্থির করা নেই

হয়তো আমার জন্য তোমার চোখের নিরেখ

জ্যামিতিক রেখায়

কোন স্বর্গ নেই

হয়তো আমার জন্য

মৃণাল বসুচৌধুরী পরেশ পুষ্কর সকলের মতো বিশুদ্ধ কবিতার পক্ষপাতি এবং আঙ্গিকেই দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনার মধ্য দিয়ে কবিতায় আনেন বিকল্প ব্যঞ্জনা তিনিও সমাজমনস্ক।

কালীকৃষ্ণ গুহ রোমান্টিক বিষয় বিশুদ্ধ কবিতায়, আঙ্গিকের বাঁধ সচেতন এই কবির মধ্যে বিষয়ের চেয়ে আঙ্গিকেরই প্রাধান্য লক্ষিত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সামসুল সমাজমনস্ক প্রতীক ও চিত্রকল্পের অভিনবত্বে তিনি স্বাতন্ত্রের দাবি রাখেন।

সান্ত্বনা দাশ সপ্রতিভ, ঝকঝকে। তাঁর মধ্যে অগ্নিপুষ্প জ্বালা ঠাঁর। তাঁর রচিত 'ভাটায়' কবিতাটি আজো অনেক পাঠকের চেতনাকে চাবুক মারে।

তুলসী মুখোপাধ্যায় ক্রোধী, অভিমানী সমাজ সচেতন এই কবি বাক্যবিন্যাসে অসামান্য। মানুষের প্রতি সীমাহীন মমতায় তিনি ফালা ফালা করে দেখেন সুবিধাবাদের, ভণ্ডামি, রাজনৈতিক নেতাদের চালচলন তিনি তীক্ষ্ণ তীব্র ঝকঝকে খোলা তরোয়াল।

তুষার রায় ছিলেন প্রবাদের মতো স্পষ্ট। দীপ্ত অনুভব ছিল বেশি ক্ষিপ্ত 'ব্যাড মাস্টার'। গ্রন্থে ধরা পড়েছে এমন উদ্দাম মুহূর্ত যে মুহূর্তগুলি চলতি জীবনধারণাকে উড়িয়ে দেয়। যেমন —

পেশী ভানাটিনি শিরাতন্তু দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে,
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ
গলগলে আঠের মতো শুয়ে এই শিখার
রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলেই ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিলো কিনা।

ভূমার স্বভাবকবি উচ্চারণকে কবিতা করতে চেয়েছিলেন আর তাঁর এই রুদ্ধ অভিব্যক্তি পদ্যগদ্যের একরূপতার সমীকরণ ঘটায় যা অনেক বেশি তত্ত্বসমূহ হয়ে ব্যক্তিজীবনের প্রতীকের সঙ্গে সমাজ জীবনকে সমান প্রচেষ্টা করেছিলেন স্বপ্নাই আন্দোলনকারীরা, বিশেষ ভাবে মলয় রায়চৌধুরীর। যাইহোক ষাটের দশকে তো কম কবি কবিতা লেখেন নি। তবু বলব উত্তর উপনিবেশিক কবিদের সেই প্রকরণের দিক যা লক্ষ্যত সুভাষ সমর মনীন্দ্র সুকান্ত বাস তরুণ যুগাচরণ প্রভৃতিরই সৃষ্টিশীল ধারার দিক সমন্বিত আপন মহিমায় বিশ্লেষণ।

বাংলা কবিতার ধারা ঐতিহ্যসিদ্ধ প্রতিবাদী। সেই চর্যাপদের সময় থেকেই তা পরিলক্ষিত। তবে বিশ শতকের তিরিশের যুগের আধুনিকতা যেখানে যুবোপকে মনে করেছিলেন কলকাতা পরম ঐশ্বর্যের কবিতা তা থেকে হন মুক্ত। ষাটের কবিদের প্রধান প্রবাহই স্বদেশে গেয়েছিলেন আন্তর্জাতিকতার স্বাদ মুক্ত মানবিকতার মুখাবয়ব।

বাংলাদেশের কবিতা ঃ প্রতিবাদে, প্রেমে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

কবিতার কোনো দেশ-কাল ভেদ নেই। কবিতা স্বয়ম্প্রভা, কবিতা সর্বত্রগামিনী। তবু রাজনৈতিক, কূটনৈতিক কারণে জাতি বিদ্বেষের দরুণ কবিতারও জাত বিচার, শ্রেণী বিভাজন ঘটে। বাংলাদেশের কবিতা এমনই শ্রেণীভেদের ফসল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হয়ে। বঙ্গদেশও হলো দুটুকরো—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। দুই দেশের মানচিত্র আলাদা হলো বটে, ভাষা একই। বাংলা ভাষা। আর সেই ভাষার জন্য তখন বাংলার দামাল ছেলেরা প্রাণ দিলো। যা আজ ইতিহাস। রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটা তারিখ মাত্র নয়, ঐতিহাসিক তথ্য নয়। তা ভাষার প্রেমে আত্মোৎসর্গকারী বাঙালির গর্বের গৌরবের দিন। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের নতুন জন্ম ১৯৫২ তে। বাংলা ভাষার নতুন শক্তি ও দীপ্তির এইসময়। আবার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা কবিতা লিখছেন ঠিকই। কিন্তু তা যতখানি প্রজ্ঞাযুক্ত, ততখানি প্রাণবন্ত নয়। ইসলামী দর্শন, ধর্মপ্রাণতা বা গোঁড়ামি এঁদের বিচারমুক্ত করে রেখেছিল। তাই পূর্বপাকিস্তানের নিজস্ব বহুতর কবিতা" দীর্ঘ প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান মন্তব্য করেছিলেন "আমাদের কবিদের আন্তরিকতা ছিল কিন্তু যে বস্তুর অভাব ছিল, যে তৃষ্ণা পড়া, (দ্র আমাদের সাহিত্য সমস্যা ফজলুল করিম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি ঢাকা ১৯৬৯) এই পড়া ও প্রেমের যুগল মিলন ছাড়া ভালো কবি হওয়া সম্ভব নয়। ভালো কবিতারও জন্ম হয় না। অন্যদিকে আমিনা এবং জানি "অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে" যা জীবনানন্দ দাশ ঈষৎ অন্য স্বরে বলেছেন "কোথাও আঘাত ছাড়া তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে আন্দোলিত হতে হবে" আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে—"১৯৫২, ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের কবিতাকে এক সম্পূর্ণ নতুন বাঁক দিয়েছে" যাকে আমি অশান্তি বা আঘাত বলেছি, তা এই ই। বাংলাদেশ নিজেকে চিনেছে ও প্রতিষ্ঠিত করেছে এই দুটি ঘটনায়। কবিরাও সেই কালের দংশনে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠেছে বিষাদময় অনুভূতি। যার কেন্দ্রে আছে বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ। অথবা দুইয়ে মিলে একটি সত্তা। কবি শামসুর রহমানের ভাষায়

তোমাকে উপড়ে নিলে
বল তবে
কি থাকে আমার?
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

বাংলাদেশের কবিরা পরম যত্নে ও মমতায় এই দুঃখিনী বর্ণমালা গেঁথেছেন সেই মণিহার পরিয়ে, দিয়েছেন তাঁদের সোনার বাংলার গলায়।

তবু একথা ঐতিহাসিক সত্য, এপার বাংলার কবিরা ওপার বাংলার কবিদের প্রভাবিত করেছেন। বিশেষ ভাবে তিরিশ ও পঞ্চাশের কবিরা ভাষা ভঙ্গিতে বাংলাদেশের কবিদের উজ্জীবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল এবং জীবনানন্দকে বাদ দিলে কল্লোল গোষ্ঠী থেকে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিকুল নামভাবে বাংলাদেশের কবিতায় ছায়া ফেলেছেন বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাই কবি শামসুর রাহমানকে বলতে হয় — শব্দই আমরা রচি এবং শব্দের মুখোমুখি

আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে

অবকাশ।

যদিও "আমাদের সাহিত্য" গ্রন্থে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এই অভিমত জানিয়েছেন, পঞ্চাশের বা পাঁচের দশকের কবিরা আধুনিক আন্দোলনের কবি এবং ষাট বা ষাটদশকের কবিরা ভাষা আন্দোলনের কবি এই একই সাক্ষ্যে বারংবার তাঁর মন্তব্য করেছেন আবুল হোসেনের কথাই তিনি অধিক চক্রবর্তী অনুসারে মোহাম্মদ হাবীবের সমাজ সচেতন কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিধ্বনি দেখেছেন আর মাঝের মোহাম্মদের ঐতিহ্য চেতনা যে এপার বাংলার তিরিশ বা তিন দশকের কবিদের থেকে এসেছে, তাও তাঁরা লক্ষ্য করেছেন সুতরাং দু'পার বাংলার কবিতা সংকলন 'কালের কবিতা' তুলনা করতে গিয়ে কবি শান্তনু দাস ভূমিকায় যথার্থ বলেন, "আজকে তরুণতর পূর্বাঞ্চলের অধুনা বাংলাদেশের কবিদের তথাকথিত আধুনিকতার শুরুই হয় আমাদের পঞ্চাশের কবিদের সমসময়ে শামসুর রাহমান আলমাহমুদ শহীদ কাদরী প্রমুখ কবিদের সময় থেকেই পাশ্চাত্য মূল সূত্র রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিতা মূল বাংলাদেশের কবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে প্রায়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে একই সঙ্গে যা অভিমানের সুর রচনা করেছে।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় ১৯৫২ র ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে। "উর্দু মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা যে এই ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলিবে সে কাফের" এমন ফতোয়ার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বাংলাদেশের বাংলাভাষা প্রেমিকেরা। দাবী শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। আমরা শক্তি আমরা বল / আমরা ছাত্রদল এই বিশ্বাসে ভাষার মান বাঁচাতে প্রাণ দেয় আবদুল বরকত, নিহত হন আরো অন্যান্য বৃত্তির মানুষও মুস্তাফা সারওয়ারের ভাষায় "মাতৃভাষার ডাকে আজ বাংলাদেশ জাগে" হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় লেখা হয় —

বরকতের রক্তাক্ত শার্টের ঝুল ছুঁয়ে রচ

অবিনাশী সূর্য

আর শামসুর রাহমানের কলমে পাই 'আমাদের মাটি আজ আমাদের প্রাণের পতাকা' কিংবা তিনি লেখেন 'সালামের মুখ আজ তখন শামসুল পূর্ববাংলা' এই ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিতে দশ ফুট উঁচু ইটের শহীদ মিনার তৈরী হয় 'একটি রক্তপদ্ম বাঙালীর আত্মোৎসর্গের প্রথম শহীদ মিনার'। শাসকশক্তি একে ভেঙে দিলে আলাউদ্দিন আলআজাদ লেখেন—

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমরা? ভয় কি বন্ধু,

আমরা এখনো চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো।

আবদুল গফফার চৌধুরীর গান সর্বত্র হলো সর্বত্র—

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি?

এই ভাষাপ্রেমই দেশপ্রেম হয়ে উঠেছে সত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। ফলতঃ মতিয়ারের চোখে মাতৃভূমি মা ও প্রিয়া। তাঁর লেখা মাতৃভাষা। মাতৃভূমি কবিতায় আত্মা ও প্রিয়াকে তিনি এই আশ্বাস দেন – তোমার পবিত্র ভূমি এবার আবাদ করবো ফলবে সোনা।

১৯৭১ এর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান বাসীদের সঙ্গে খান সেনাদের প্রবল যুদ্ধ হয়। নিজের দেশ স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্নে এই লড়াই। স্বাধীনতার এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতবর্ষও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওপার বাংলার বহু বুদ্ধিজীবী কবি, শিল্পী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। সে আজ ইতিহাস। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এই যুদ্ধ ও স্বাধীনতা কবিদের কাব্যে গভীর ছায়াপাত করেছে। যেজন্য কবীর চৌধুরী বলেছেন, "বাংলাদেশের কবিতা আলোচনা সম্পূর্ণই হতে পারে না মুক্তি যুদ্ধের কবিতাবলী বাদ দিয়ে।" কিছু মুক্তিযুদ্ধের কবিতা উদ্ধৃত করে দেখা যেতে পারে কবিরা সমকালস্পৃষ্ট কতখানি।

১ আলাউদ্দীন আল আজাদ :

আকাশপাতাল

জুড়ে নরকপী দানবের গুঞ্জার

শুনছি এবার। (আবহমান)

২ শামসুর রাহমান :

অস্ত্রাগারে নেবে না আয়ুধ

ক আবার অভিজ্ঞ হাতে? তুলবে না ধনুকে টঙ্কার। (টেলেমেকাস)

ST21 B

খ স্বাধীনতা তুমি

উত্তালে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ীর আঁচল (স্বাধীনতা তুমি)

৩ শহীদ কাদরী :

বেরিয়েছি ২৭শে মার্চের সকালে

কান্নাকে কেন্দ্রীভূত করে

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলায় (নিরিহ জনাকে বেড়ে)

৪ নির্মলেন্দু গুণ :

আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

আইয়ুবখান এখন কোথায়?

শেখমুজিব কি ভুল করছেন?

আমার নামে কবিতা আর একরকম ভাবিয়া বুলাবে ? (গুলিয়া)

৫ মহাদেব সাহা :

দূতাবাসে উড়ছে পতাকা

অর্থাৎ স্বাধীন আমরা একথা মানতেই

হয়, রাষ্ট্রীয় সনদ আছে দেশে

দেশে আমরা স্বাধীন (বিদেশ নাও বাঙালদেশ)

৬ আল মাহমুদ :

আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে

দাঁড়িয়েছে পাশে (পালক ভাইয়ের প্রতিবাদে)

৭ আবুবাকর এবায়দুল্লাহ :

আমি প্রার্থনা করেছি

আমি প্রদোষকাল থেকে বক্তিম প্রত্যুষ অবধি

প্রার্থনা করেছি।

আমি সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা করেছি।

(বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা)

ভাষা আন্দোলন আর মুক্তি যুদ্ধ কবিদের যে দুঃসময়ের মুখোমুখি করেছিল, তাতে তাঁরা

ভেঙে পড়েন নি। "আগ্নেয়াস্ত্র" কবিতায় নিঃশেষ্দুগুণ জানিয়েছিলেন পুলিশ লেলিয়ে সব অস্ত্র জমা দিলেও তিনি 'হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র' জমা দেন নি। রফিক আজাদ স্পষ্টই বলেছেন, "সমস্ত ধ্বংসের পরেও জেগে থাকে শুধু প্রেম। এখানেই লুই আরাগর সঙ্গে তুলনা করেছেন ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর "বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়" গ্রন্থে বলেছেন, 'প্রতিরোধের সংকল্প থেকে জন্ম নিয়েছিল অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতা রফিক আজাদ এইজন্য স্বীকার করেন—

তোমার ওষ্ঠের স্পর্শে জেগে উঠি ঘনিষ্ঠ জীবনে
শাদা দেয়ালের গায়ে ফুটে ওঠে অবিশ্বাস্য
রঙের বাহার (তোমাকে কাছে পেয়ে)

কিংবা সালাউদ্দিন হক লেখেন—

সন্ধ্যায় তুমি আসবে বলে
একটি সম্পূর্ণ বিকেলকে আমি
কাঠের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। (অষ্ট প্রহরিকা)

চমৎকার চিত্রকল্পে প্রেমের ব্যাকুলতা, ইচ্ছা বাসনাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন আবু কায়সার

তোমাকে দেখব বলে জানালায় একখণ্ড শশব্যস্ত মেঘ
হঠাৎ বাড়ালো গ্রীবা, যেন এক দলছুট ক্ষুধার্ত জিরাফ
পেয়েছে গুল্মের ঘ্রাণ (আশ্বিনের ক্ষুধার্ত জিরাফ)

কিংবা হুমায়ুন কবিরের সংবেদনশীল অনুনয়—

তুমি কি একটু এসে মৃদু হেসে তাকাবে সহজে
বলনি তো কাল রাতে চাঁদ ছিল দোতলার টবে
নিরিবিলি কটা ফুলে তুমি ছিলে একা
(পার্শ্ববর্তিনী সহপাঠিনীকে)

আবদুল মান্নান সৈয়দের মরমী অনুভব—

সহসা তোমাকে দেখে ভেসে যায় দিন অনুদিন,
ইস্পাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছো প্রজাপতি
বস্তুর ভিতরে থেকে উড়ে চলো ভিতরে আমার

উড়ছো পাখায় তুমি, উড়েছো অগ্নিতে

(একটি জাগরণ)

মেটাফিজিক্যাল কবি ডানের মতো কল্পনার অভিনবত্ব দেখিয়েছেন সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল। তাঁর ঈর্ষা কবিতায় মধুমুখের অনুসঙ্গে প্রেমিকার সান্নিধ্য খুঁজেছেন। বাক্যের সঙ্গে নারীর সংযোগ নেই অথচ জড় পদার্থ তাকে পাচ্ছে এমন আশ্চর্য কল্পনায় কবি লিখছেন ঈর্ষাতুর। তাঁর প্রেমিকাকে টেলিফোন করে কাছে ডেকে নেয় টিভি দখল করে রাখে। তারপর

কবিতার বই মুগ্ধতার ধরে রাখে তোমার দুচোখ

চায়ের পেয়ালা সকাল বিকাল প্রায়ই তোমাকে চুমু খায়

আমার খুবই হিংসে হয়

আমার খুবই হিংসে হয়।

"মহিলা কবি শব্দটি নিয়ে উদানীং আপত্তি উঠেছে নারীবাদী কবিরা ক্ষোভ জানিয়েছেন তবু যেসব মহিলারা কবিতা লেখেন তাঁদের কিভাবে চিহ্নিত করা যায়, জানি না। বাংলাদেশে মুসলমান মেয়েরা প্রথা বা সংস্কার ছেড়ে কলম তুলে নিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার কথা তো সবার জানা। একালের বাঙালি মুসলমান মহিলা কবিদের মধ্যে তসলিমা নাসরিন প্রচুর খ্যাতি অখ্যাতির মালামাল। প্রেমের বদলে তিনি দেখেছেন মেয়েরা অনুশাসনে ও নিয়মে বন্দিনী—

বোধোদয় হবার পর সে যখন পৃথিবীর

রূপরসগন্ধ ও বর্ণ দেখবে বলে

চৌকাঠ ডিঙোতে চাইল,

তাকে বলা হল না এই দেয়াল দিগন্ত রেখা

এই ছাদ তোমার আকাশ। (সীমানা)

অন্যদিকে জরিনা আখতার লিখেছেন বেদনায়, প্রেমে—

এতো পদ্ম হয়ে কবে ধরা দিলে।

মুঠো আলগা করতে ছড়িয়ে পড়ল সব

যেন অবুঝ শিশুর কলহাসিতে ভরে উঠলো ঘর। (পঙ্কজ)

আর সুরাইয়া খানম এর অনুভূতি দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ভরা—

তুমি আমার বিশুদ্ধ জল তুমি আমার পাপ

তোমায় ফেলে কলসী ভরে রাখবো মনস্তাপ?

তুমি আমার সোনার খনি তুমি বিশ্বের ঘড়া,

তোমায় পেলে দুয়ার খুলে আনবো মৃত্যু জয়া?

(অমর পূর্ণিমা)

সব দেশের প্রেমের কবিতায় বিষাদ, যন্ত্রণা যেমন মিশে থাকে, তেমনি প্রকৃতি, নারী ও প্রেম একাকার হয়ে যায়। বাংলাদেশের কবি ও কবিতা তার ব্যতিক্রম নয়।

১ তোমার বুকে আমি পাহাড়ি ঝর্ণার

এক অজ্ঞাত শব্দ শুনেছিলাম,

তোমার চোখে দেখেছিলাম বন্য হরিণীর চঞ্চলতা। (অসীম সাহা)

২ আমার ঠোঁট তুমিও উটরেখার মতো ডাকছ

—তুমি এসো। (শেলসুর রাহমান)

৩ তুমি জানো, পাড়া প্রতিবেশী জানে

পাই নি তোমাকে,

অথচ বয়েছে তুমি এই কবি সন্ন্যাসীর ভোগে আর ত্যাগে। (হেলাল হাফিজ)

৪ এই তো সবজমিন তপিত প্রান্তর, খরদাহ

অরণ্যায়ন করো হে নারী,

দ্রাবিড় মাটির কণা পালনিক জলবায়ু দাও

অনন্য উঠোন ঘরবাড়ি। (আল মুজাহিদী)

৫ মধ্যরাতে অপাঠিত পুস্তকের পাতার মতন

রহস্যময় তোমার অবাণীবদ্ধ অবয়ব (ফারুক আলমগীর)

৬ সুলতা জানে, সুলতা জানে ভালো,

আকাশে মেঘ—দীঘিতে কেন হাঁস,

সুলতা জানে, সুলতা জানে ভালো

কবিরা কেন নারীর ক্রীতদাস। (সিকদার আমিনুল হক)

৭ তোমার জন্যে লোকালয়

হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি,

তোমার জন্যে করি জয়

অভাবের ক্ষিপ্ত তরবারি। (আলমাহমুদ)

৮. নিবিড় শরীর গভীর করে দাঁতে কাটি

বুকে পিঠে ঘাসের শরীর — উঁসাটে গন্ধ

নরীর দিয়েই শরীর থেকে শব্দ এবং আগুন। (বেলাল চৌধুরী)

এভাবেই এপার বাংলার কবিরা রচনা করেন তাঁদের ভাষার মুদ্রা। অনুভবের অভিজ্ঞানে এপার বাংলায় এসে লাগে সেইসব শব্দের তাপ, হৃদয়ের উষ্ণতা। অসাধারণ কোনো ভাঙচুর ভাষায় প্রকরণে হয়ত নেই। কিন্তু আছে মমতামেদুর নির্মাণ। বাংলাদেশের জল মাটি ঘাস হাওয়া এসে কবিতাগুলিকে লালন করেছে। তুর সেখানে ও পাই সেই একই ক্রোধ, আনন্দ, শোক, সুখ শিহরণ। ভাষার জন্য প্রিয় মানুষের জন্য তাদের একই দাবি। বোধে দৈপ্যমান একালের সব কবিই দেখা যায়, উপমা ও চিত্রকল্পে ঈর্ষণীয় দক্ষতা। অবশ্য বাংলাদেশের কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন। 'লাল পাগড়ীপরা পুলিশের মতো কুমড়ো', 'সেলিলেস ব্লেডের মতো বাবলার দৃষ্টি', 'ঘোড়ার ঘাসের মতো চাঁদ' ইত্যাদি পাঠকের নজরে চোখে পড়ে। যা আমরা বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আমরা শুধু বাংলাদেশের কবিতায় খুঁজেছি কবিদের বিখ্যাত হৃদয়, যা প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল। আর প্রেম করুণা দয়ায় তার স্পন্দমান। সেই হৃদয়ের নাড়ীতে হাত রাখার জন্যই এই কবিতা পড়া।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ পুনর্পঠন

দীপেন্দু চক্রবর্তী

সুকান্ত কিশোর কবি, সুকান্ত যুগের কবি, সুকান্ত একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কবি, সুকান্ত খাঁটি কবি নন, শুধুই পদাতিক, অথবা সুকান্ত কালোত্তীর্ণ এক মহান কবি, তাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের সঙ্গে তাঁরও জন্ম জয়ন্তী পালন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই রকম কয়েকটি পরিচিত ছকে সুকান্ত এখনও বন্দি হয়ে আছেন, পুনর্পঠনে তাঁর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরি বলে মনে হয়। যেহেতু কদিন আগেই সুকান্তের পঞ্চাশতম জন্মদিন পালিত হল, তাঁর শতবর্ষ পালনের আগেই কাজ করা। তাঁর স্থান নির্ণয়ের একটি নিরপেক্ষ, নির্বাসক্ত ও নির্বিষ্ট প্রস্তুতি প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিপথ সেদিকে।

প্রথমেই ধরা যাক 'কিশোর কবি' কথাটা। কিশোর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকায় বোধহয় সুকান্তের পিঠে এই 'কিশোর' ছাপটি লেগে গেছে। কিশোর কবি বলতে কোন বয়সের কবি বোঝায়? সুকান্ত মারা গেছেন একুশ বছর বয়সে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' ও প্রকাশিত হয় একই সময়ে। ১৯৪৭ সালে। একুশ বছরকে কী করে কিশোর বয়ঃসন্ধিকাল, বাল্যকাল ও যৌবনের মাঝামাঝি, অভিধান অনুসারে বারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত। শাস্ত্রে আছে ষোল বছর হলেই পুত্রের সঙ্গে পিতা বন্ধুবৎ আচরণ করবেন। ইংরেজিতে 'টিন এজার' কথাটা ধরলেও সুকান্তকে কিশোর কবি বলা যাবে না আজকের হিসেবে, যদিও শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন বয়সের এই পর্ব সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা কখনই সহজ নয়। এবং সর্বজনস্বীকৃত কোনো মাপকাঠি পৃথিবীর সর্বত্র প্রয়োগ করা হয় না। আমাদের দেশে এখন ১৮ বছর বয়সে ভোটদানের অধিকার থাকায় 'কিশোর' কথাটার সাবেকি ধরণটা বাতিল হয়ে গেছে। আসলে 'কিশোর' কথাটা যতটা না বয়সের ব্যাপার তার চাইতেও বেশি একটি বিশেষ সংস্কৃতির ধারক, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় culture-specific।

বাংলা সাহিত্য সমালোচনা মূলত পাশ্চাত্যধারার অনুবর্তী হলেও আমাদের সংস্কৃতির নিজস্ব কিছু প্রবণতা যে তার গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে অনেকটাই, সেটা এই উত্তর উপনিবেশিক যুগে আমাদের ভরসা জাগায়।

তবে স্বদেশী সংস্কৃতির সব অভ্যাস আচরণই যে-নিরাপদ এমন বিশ্বাসেরও কোনো ভিত্তি নেই। যেমন সাহিত্য বিচারে বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক বৃত্তে অতীতের বাঙালি সাহিত্যিকেরা ধরাবাঁধা বিশেষ বিশেষ উপাধিতে এমন চিহ্নিত হয়ে গেছেন যে তাঁদের মূল্যায়নের সীমানা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ 'কবিগুরু', শরৎচন্দ্র 'অমর কথা শিল্পী' বঙ্কিম তো

একেবারেই কবি [illegible] সমাজকেই 'ধ্বংসই' করি [illegible] সুকান্ত যে কিশোর কবি হবেন তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। [illegible] কোনো উপাধি যখন তার উপযুক্ত নয়, তখন একমাত্র তাঁর অকালমৃত্যু দুই আকস্মিক সমালোচকদের ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অজুহাত, যাঁরা এই বয়সে দিয়ে কবির জাত নির্ণয় করার [illegible] কেই সুকান্তর যোগ্য স্বীকৃতি বলে মানা করে, এমনকি তাঁরা ভেবে দেখেন নি যে এই [illegible] কিশোর কবির মতো মৃত কবি, এমন কী বৃদ্ধ কবিও তো বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে তাহলে বিশ্বকবির সঙ্গে বৃদ্ধকবিই বা বলা হবে না কেন?

ইংরেজ কবি চ্যাটার্টন ১৮ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কিশোর কবি বলে কখনই আলাদা করা হয় নি। [illegible] মধ্যে তুলনীয় ও সিদ্ধান্তের গ্রুপ বলে যে পৃথকীকরণ করা হয় সাহিত্য বিচারে কি তা সম্ভব? তা হলে তা কীটসের সঙ্গে ইকটসের তুলনাই চলে না। সাহিত্যের ইতিহাসে স্বল্পায়ু কবি ও দীর্ঘায়ু কবির পৃথক মূল্যায়ন হলে অবশ্য মন্দ হত না। তাতে হয়ত অন্য অর্থে একটা সুবিধার হত সুকান্তর প্রতি। আবার এমনও যদি হত যে সুকান্ত একুশ বছরের কবি হিসেবে যে ভাব [illegible] বিস্ময়ের বাতাবরণ রচনা করেন একই বয়সে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সুকান্ত [illegible] হারাবেন। যেমন হারিয়ে যাবেন কীটস সমকেন্দ্র সেই শুধু ঠিক এই পদ্ধতিরই [illegible] করেছেন সেইসব সমালোচকদের যাঁরা একুশ বছরের এক কবিকে [illegible] (নতুন সুকান্ত, গণশক্তি ১২.৮.০১)। তিনি দেখিয়ে [illegible] জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ এমন কী বুদ্ধদেবও এই বয়সে যা লিখেছেন তা সুকান্তর তুলনায় অনেক বেশি [illegible]। সুকান্ত মূলত কবি — এ আর একটি সাংস্কৃতিক যুগের কবি বলেই [illegible] তাঁর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা শুধু তাঁর সমকালের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, তাঁর মূল্যায়ন হবার যোগ্যতাও নেই। মহৎ কবি সমকালের সন্তান হয়েও কালোত্তীর্ণ হন — এই ধারণাটি আমাদের সাহিত্য বিচারের একটি অন্যতম [illegible]। যদি কেউ বলেন, এখনও সুকান্তসমগ্র বিক্রি হয়, এখনও তাঁর স্মরণে নানান অনুষ্ঠান হয়, তবে তার উত্তরে আমাদের জানা সুকান্ত একটি প্রভাবশালী বামপন্থী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় এখনও বেঁচে আছেন, তা যদি না হত দয়ে তাঁর খ্যাতিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মতই স্বল্পায়ু হত। এ যুক্তি অনেকাংশে ঠিক, তবে তা শুধু সুকান্তের ক্ষেত্রেই এমন ভাবটা অযৌক্তিক। শাশ্বত, চিরন্তন সার্বজনীন ইত্যাদি ধারণাগুলো কখনই স্বতঃসিদ্ধ নয়। এদের পেছনে প্রায়শই দেখা যায় এক ধরনের সাংস্কৃতিক রাজনীতি (politics of culture)। খোদ ইংলন্ডেই শেকসপীয়রের চিরন্তনতায় যা দিয়েছেন আজকের তাত্ত্বিকেরা। অ্যাকাডেমিয়া বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রকাশনা সংস্থা বেতার-দূরদর্শন এবং সর্বোপরি একটি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসবের প্রভাব ও মধ্যস্থতায় কিছু কিছু লেখক অবশ্য পাঠ্য হয়ে ওঠেন। এই কানুনের প্রাধিপত্যই আজ নানান প্রতিরোধে বিপন্ন। শুধু তো post-

structuralist, post-modernist, post-colonialist — এই সব সমস্যা মার্কসবাদের চিন্তা ও বিশ্বজনীন বলে কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় দেয় নি। আধুনিক মার্কসীয় তত্ত্ব তো আরো বেশি আরো বেশি আক্রমণাত্মক এই ক্ষেত্রে।

সুকান্তকে বাঁচিয়ে রাখবে যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বা সাহিত্যের ইতিহাসে কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা হয়। এমন কে অর্থবহ ব্যক্তিক বিমূর্ততা কবি জীবনানন্দ তিনিও নবজীবন লাভ করেছেন বাংলাদেশে প্রসারিত রাজনৈতিক তৎপরতাই। সেটা দেখা দরকার তা হল এই সব পারিপার্শ্বিক ও রাজনৈতিক মহাস্থানের বাইরে পাঠক হিসেবে আমরা সুকান্তকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন বা করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার অনেক অনেক আগেই সেই পঞ্চাশের দশকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যার নাম এইচ এম ভি কেন ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতায় এমন কিছু আছে যা মানুষের চেতনাকে খুব আধুনিকভাবে ছুঁয়ে যায়। আই পি টি এ সাংস্কৃতিক চেতনা বিস্তারে যেটুকু সাফল্য পেয়েছিল তার সম্ভাবনাময় বিপণনে এইচ এম ভি সুকান্ত সলিল চৌধুরী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সমন্বয়কে অপরিহার্য মনে করেছিল। ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল গান — 'অবাক পৃথিবী', 'বিদ্রোহ চারিদিকে'। শুধু সলিলের অনন্য সুর ও হেমন্তর স্বর্ণকণ্ঠ একটা সফল হত না যদি তার সঙ্গে সুকান্তর মর্মস্পর্শী ভাষা যুক্ত না হত।

সুকান্তর ভাষা বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেই সাধারণের ভাষা হয়ে উঠেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কবির সংজ্ঞা দিয়েছেন (man speaking to men) তার যথার্থ রূপায়ণ শুরু হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসীয় মতবাদের প্রেরণায়। বাংলায় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের অভিঘাতে তারই অনুকূল ছড়িয়ে পড়ে চল্লিশের দশকে। এ এমন সময় যখন সমাজগত শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম বাঙালি লেখকদের সাহিত্যিক রোমান্টিকতা ও রবীন্দ্রবিরোধী মডার্নিস্টদের অবক্ষয়ী বাতুলতা এই দুটি ধারার বিপরীতে জনমুখী সাহিত্যের তৃতীয় একটি পথ খুলে দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দাঙ্গা এমন একটা টালমাটাল সময়েই বলা উচিত। 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, অথবা 'কমরেড আজ-কর্তব্য অন্যের না ?' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই উচ্চারণ ইতিহাসের মত শোনালেও সময়ই তাতে সমর্থনের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দেয়। রোমান্টিক কবিতায় সুভাষ 'কাব্যের প্রতিপক্ষে' থাকার অঙ্গীকার করে ঘোষণা করেছিলেন, 'সেই কথাটা বাধে না নিজেকে বলতে শুনবে যে কথা হাজার জনকে বলতে।'

সুকান্তও সেই কথাটা বলতে চেয়েছেন, এবং হাজার জনকেই তাই তাঁর ভাষায় এসেছে গদ্যের সরলতা। কবিতাকে তিনি ছুটি দিয়েছেন গদ্যের কাছে এনে। তাই কবিতা দিয়েই কবিতার বিসর্জন দিতে চেয়েছেন। এটি একটি পারাডক্স বটে। কিন্তু কবিতা এখানে দুটি ভিন্ন ঐতিহ্য ও

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিন্দনীয় অর্থ বহন করে। কবিতার রিক্ততা নয়, প্রয়োজন সদোষ কড়া হাতুড়ি কারণ এ তো ক্ষুধার রাজ্য স্বপ্নের বা কল্পনার রাজ্য নয়, পূর্ণিমার চাঁদ হাই ঝলসানো রুটি। চাঁদ নিয়ে কবিদের মত না কল্পনা বিলাস। সুকান্তর ভুবনে চাঁদ যদি উঁকি দেয় তবে তা হয়ে যায় ঝলসানো রুটি। উপজীব্য হিসেবে প্রথমপাঠে তা খুবই সরলমনে হয়। আকারে ও রঙে পূর্ণিমার চাঁদ তেমনই দেখতে লাগে। তাই বলে ক্ষুধার্ত লোক চাঁদকে রুটি হিসেবে দেখবে ? অনেক সমালোচকই নিশ্চিত কুঠিত তা দেখেছেন এ ক্ষেত্রে এবং তাঁরাই চার্লিনের গোল্ডরাকে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে আর একজন মানুষকে ঠিক জাতীয় প্রাণীর চেহারা ধারণ করতে দেখে বলেন। এসেই বলে মহৎ আর্ট। টি এস এলিয়ট সন্ধ্যার বর্ণনা দেন অপারেশন টেবিলে অজ্ঞান করা এক রোগীর সঙ্গে। এটা কৃত্রিমতা নয়। মায়াকভস্কি লেখেন—ট্রাউজার্স পরা মেঘ, বেশ লাগে ভাবতে। একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়, যখন সুকান্ত (১লা মে-র কবিতা ৪৬) কুকুরের শেকল চিঁড়ে ঘাড়ে সিংহের কেশর দেখতে চান

সুকান্তর সরলতা অনেকের কাছেই কিঞ্চিৎ শিশুসুলভ লাগে। তা যদি প্রবেল নার্যেভটি হত তবে নিন্দনীয় হত না। কিন্তু এ যে রাজনীতির কথা সরলভাবে বলা

ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া

রুশ ও চীনের কাছে

আমার ঠিকানা কতকাল ধরে

জেনো গচ্ছিত আছে।

কবির মিস্টিসিজমের সরলতা, ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় প্রকৃতি প্রেমের সরলতা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষার সরলতা এ সব সহনীয়, সহনীয় নয় শ্রেণীসংগ্রামের সরলতা 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন' এমন অহংকারের সরলতা কি সমর্থনযোগ্য ? শুধু রাজনীতি বিরোধী বিশুদ্ধ কাব্যের মুখমাত্রই নয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনেক বামপন্থী কবিও এই সরলতা, এই গলা-ফাটানো চিৎকার এসব কাব্যের অপরিপক্কতার লক্ষণ হিসেবেই দেখে থাকেন। তাঁরা অবশ্য মায়াকভস্কির সেই কবিতাটির শিরোনামটিই মান রাখেন না 'At the Top of My Voice', যেখানে তিনি বলেন, 'আমি আমার গানের গলা গোড়ালি দিয়ে চেপে রেখেছি' অথবা 'আমি চাই আমার কলমটা রিভলভারের সমান সমান হয়ে উঠুক।'

ইতিহাস দেখায় যখনই পালা বদলের সময় আসে, যখনই ন্যায় অন্যায়ের যুদ্ধ হয়, তখন কবিতা আর স্লোগানের সীমারেখা মুছে যায়। ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন থেকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ বা আটষট্টি দুনিয়া জোড়া ছাত্র ও শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের লড়াই পর্যন্ত কবিতা সেই ভাষাই খুঁজে গেছে যা শোষিত মানুষের যন্ত্রণার কথা যেমন দরদ দিয়ে ফোটাতে পারে। তেমনি সংগ্রামের

ডাক দিতে পারে জোরালো উচ্চারণের স্পষ্টতা যেমন দেখি পল এলুয়ারের 'স্বাধীনতা' কবিতায় তেমনি দেখা যায় 'বিদ্রোহ' আজ উক্তিটির পুনরাবৃত্তিতে সুকান্তর নামান কবিতায়।

তাই বলে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে সুকান্ত 'আগে আমি কবি উচ্চিষ্ট তার পর কবি' এমন বিবৃতি দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কবিতার গতিপথ ছিল সরলরৈখিক। বৈচিত্র্যের সন্ধান তাঁর বিভিন্ন কবিতায় চিহ্ন রেখে গেছে 'ছাড়পত্র' ও 'ঘুম নেই' ভাষায় ও ভাবে একরকম নয়, পূর্বাভাসও অনেকটাই ভিন্ন এ দুয়ের থেকে। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর ছড়া যেন সুকুমার রায়ের পরিপূরক, যেহেতু ছোটদের তিনি সমাজ সচেতন করার দায় গ্রহণ করেছিলেন। 'বানর' কবিতাটি পড়লে মনে হয় সত্যেন দত্তর মোড়কে এক আধুনিক সমাজসচেতনতার দলিল। তাঁর নানান কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি নজরকাড়ে পুরোপুরিও পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের মত আভিধানিক শব্দের মিশ্রণও লক্ষণীয় (সর্বগ্রাসী প্রলুব্ধ ইতিহাস অপরাধে, সত্যের সন্ধান করে ইতিহাস দগ্ধপায় মান শ্রেতাত্মার প্রতিবিম্ব বাসনের পকল্পকে লীন অনুভব ঈ বনের সূর্যোদয়, ভাগ্যশেষ চিতা। (পরিশিষ্ট)

তবু আহ্বান নির্বাচিত আর ভবিষ্যৎ বাণীর শুকনো খুঁটির ভাষা নয়, সুকান্ত তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন অন্য অনেক আঙ্গিক ও তার উপযুক্ত শব্দভাণ্ডার। প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট তুচ্ছ বস্তুর আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তিনি শোষিতের আর্তি ও আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তুলেছেন যেমন সিগারেট সিঁড়ি কলম, দেশলাই কাঠি। আক্ষরিক অর্থে যা নিতান্তই তাসাবদ তা ই হয়ে উঠেছে এক একটা বৈপ্লবিক মিথ। ভাব বলয়কে অনুরণন দিয়ে তিনি যেভাবে তাঁর বক্তব্যের প্রতিকৃতি এঁকেছেন তার চেয়েই বেশি আকর্ষণীয় এই সব নতুন নতুন মিথ রচনার দৃষ্টান্ত যার মধ্যে সবচেয়ে 'একটি মোরগের কাহিনী'। সুকান্তর এই মিথ রচনায় যে সরলতা লক্ষণীয় তা যেন আর এক মার্কসবাদী কবি বিষ্ণুদের কাব্যরীতির প্রত্যুত্তর। সুকান্তর পাঠককে আর্টেমিস বা ক্রিমিডাকে চিনতে হয় না, তাঁর পাঠক বড় জোর খবরের কাগজ পড়ে দুনিয়ার হালচাল বোঝেন আর নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির কথা মিলিয়ে নিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুদের রচনাকে 'দুর্ভেদ্য কেল্লা' বলে মনে করেছিলেন, সুকান্ত বিষ্ণুদের অনুগামী না হয়ে তৈরি করেছিলেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথের জন্য। বোধহয় তাঁর আকাঙ্ক্ষাই ছিল নতুন যুগের রবীন্দ্রনাথ হওয়া—'যদিও সে অনাগত তবু যেন শুনি তার ডাক আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ।। (পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে)

তা না হলে কেনই বা সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে বক্তব্যবাহী শ্যামা চণ্ডালিকার উপাদান নিয়ে 'অভিযান' রচনা করবেন। কবিতা গান, গীতিনাট্য গল্প ছড়া ব্যঙ্গ কবিতা সব কিছুতেই হাত দিয়েছিলেন সুকান্ত, যার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু উৎস এক হলেও তাঁর ঠিকানা রবীন্দ্র অনুযায়ী কবিদের মত হয় নি, তাঁর মার্কসীয় দীক্ষা অন্য এক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছে অন্যদিকে রবীন্দ্র বিরোধীদের মত হাবল্ড ব্লুম কথিত 'প্রভাবজনিত দুশ্চিন্তায়' (anxiety of

influence তিনি আক্রান্ত হয়ে পাশ্চাত্যের মডার্নিজমে আশ্রয় নেন নি। সাধারণ মানুষের মাঝখানে বড় হোতেন বলেই তাঁর কাব্যের শরীরে কমিউনিষ্ট পার্টির স্পর্শ থাকলেও তত্ত্বকথার অনুপ্রবেশ ঘটে নি। তিনি মহাত্মা গান্ধীকেও শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। আবার এই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবিতার সেতুবন্ধনে আগ্রহী ছিলেন বলেই তিনি তাঁর কবিতার পিঠে বৈদগ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেন নি।

আজ সমাজতন্ত্রের পক্ষপাত অপসারণের সময়েও সুকান্ত একুশ বছর বয়সে যা বলে গেছেন তা এই একুশ শতকেও বাতিল হয়ে যায় নি — আজকের বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যাঁরা জঞ্জাল সরানোর কাজে নেমেছেন, সেই পরিবেশবাদীরা কমিউনিষ্ট নন কিন্তু তাঁদের হাতেই সুকান্তর 'ছাড়পত্র' সঞ্চিত হয়েছে।

কবিতার উত্তরণ ঃ শিল্পিত পাঠ

অরুণকুমার বসু

পুনশ্চ কাব্যের একটি কবিতায় (পত্র, ১০ ভাদ্র ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ একালের মুদ্রিত কবিতার সঙ্গে পাঠকের নীরব শীতল সম্পর্কের জন্য ক্ষোভ জানিয়েছিলেন এইভাবে :

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সময় পাবে
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা
সেই ঢেউ পড়ে রইল পিছনে।

হয়তো রবীন্দ্রনাথ এই আক্ষেপটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে কবিতার উত্তরণ তার উচ্চারণে, তার শিল্পিত পাঠে উচ্চারিত আবৃত্তিতে। নিঃশব্দ নীরব পাঠে কবিতা তো কফিনের পোরা শবদেহের মতো। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি আরও কিছুটা স্মরণ করি :

বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য এখন
কবিতার সমাধিকাননকে
দেয় নি লেপে কালি মাখিয়ে
হয় যে কানে শোনার কবিতাকে
পড়ানো হল চোখে দেখার শিকলে
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি লোকে
নিত্যকালের আনন্দের ধন
পাঠ্যবিষয়ের হাটে হল নীলাম
উপায় নেই,
জটলা পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল ডাঙার অগ্নিবাণ চড়ে।

মন চলছে নিশ্বাস ফেলে
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম কী হবে বলে ।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে ।
তোমরা আধুনিক মালবিকা
কিনে পড় কবিতা
আরাম - কেদারায় বসে ।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না ;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস ।

একালে সাহিত্যের পঠনপাঠনে হাজার বছরের বাংলা কবিতাই মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েদি হয়ে পাঠকের নীরবতার শুকপাখিতে পরিণত । আমাদের শ্রেণীকক্ষে সে কবিতা উচ্চারিত হয় কোনোমতো তা অভ্যাসবশত পড়া হয় । তবে ধ্বনি শরীরে অনুরণিত হয়ে ওঠে না । তাই তা শেষ পর্যন্ত কবিতাও হয়ে উঠে না । ঋজুপাঠের পদ্য হয় মাত্র । তাই আমাদের অ্যাকাডেমিক কাব্যচর্চায় ও ব্যাকরণচর্চায় ও ব্যাকরণচর্চায় কোনো পার্থক্য থাকে না । তা শেষ পর্যন্ত ঐ হট হট হোতয় হোতয় সঙ্কট সঙ্কট ,ঘোটায় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসন্তনি' এই অচলায়তনিক উপন্যাসে নিঃশেষিত হয়ে যায় । অথচ গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর এই দীর্ঘ সমুদ্রভূমিতায় কত ঘাট কত নদীসংগম কত জনপদ কত লোকবৃত্তির পদাবলি মিশছে । তা যেমন স্থির চিত্রে দেখানো যায় না, তেমনি কুষ্ণকু থেকে জয় গোস্বামী এই হাজার বছরের বাংলা কবিতাকে ও নিছক সময়-সমাজ সমস্যা-সন্ধিসমাস চিত্রে চিত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না, যদি না সে শ্রোতার শ্রবণে মনে জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ নভসে ঘনগৌরবে নবযৌবনা হয়ে আবির্ভূত হয় । প্রাগাধুনিক যুগের কবিরা তো শ্রোতাদের জন্যেই লিখতেন । পাঠকের জন্যে হয় । মৌখিক সাহিত্যের ও মাঝখানে দেয়াল বেড়া ছিল না । মেয়েলি, ব্রতকথা পাঁচালিতে ছিল গলাগলি ভাব । চণ্ডীপাঠই চণ্ডীমঙ্গলে ভাসান গানই মনসা মঙ্গলে শিবের গাজনই শিবায়নে পরিণত হয়েছে তাদের পরিবেশন পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রেখে । সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে নিছক বাংলা কাব্য আমাদের সাহিত্য পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত, তা আমাদের পঠন-পাঠনের বিকৃত ব্যবস্থায় নিছক টেকস্ট হয়ে পড়ে থাকে, তাদের কনটেকস্টুয়াল আবেদন সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায় না । দস্যু বেনারামের পালায় মনসার ভাসান শুনে দস্যু বেনারামের যে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ঐতিহাসিক সত্যতা আমাদের সন্ধানের বিষয় নয় । কিন্তু

সঠিক সুর তালে লয়ে কাব্য পঠিত ও আবৃত্তি হয়ে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে এ কাহিনী তারই রূপক।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রেরণায় বাংলায় নবযুগের যে সাহিত্য ইতিহাস শুরু হল, সেখানে মুদ্রণের বৈপ্লবিক প্রবর্তন লেখক-পাঠকের মধ্যে-দূরত্ব গড়ে দিল। তবুও মধুসূদন অন্তত কবিতাকে ধ্বনিত আবৃত্তির শিল্পে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের পাঠ নিতে বাঙালি তরুণ ছাত্ররা ডিরোজিও র কাছে কিংবা ডিএল রিচার্ডসনের কাছে ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুনে অভিভূত হতেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ও ভাবে আবৃত্তি করা যেত না, রিচার্ডসন উচ্চাঙ্গের আবৃত্তিকার হিসেবে সেকালে সম্মানিত হয়েছিলেন। সেকালে নাকি বলেছিলেন আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলতে পারি কিন্তু আপনার শেক্সপিয়ার আবৃত্তি ভুলতে পারি না। রাজনারায়ণ বসু তার স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, "তাঁহার রিচার্ডসনের এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা-আবৃত্তিবিদ্যা শিক্ষার প্রধান স্থল নাটকের। তিনি নিজে হাবভাব দিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাহার উপদেশগ্রহণ করিত।" মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও আবৃত্তিকার হিসেবে রিচার্ডসনের এই প্রতিষ্ঠার কথা লিখে গেছেন এই ভাষায়:

"যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার সমস্ত অংশসমূহ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন যে, তাহার একবার আবৃত্তিমাত্র ছাত্রদিগের অনেকস্থলে অর্থগ্রহ হইত। সে সময়কার অনেক প্রসিদ্ধ নট্টশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার নিকট শেক্সপিয়র আবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।"

সুতরাং কবিতার অর্থবোধ ও রসগ্রহণের সামর্থ্য যে তার মননশীল স্বাদু পাঠ বা আবৃত্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি কবিরা শেক্সপিয়র-মিলটনের কবিতা থেকে শিক্ষকদের আবৃত্তি শুনেই আবৃত্তি করতে পেরেছিলেন। রিচার্ডসন নিজে তাঁর ছাত্রদের বলতেন।

"কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে তুলে দিতে পারে। জগতের পরিচিত সাধ-আহ্লাদের অতীত এক চিরন্তন অভিনব আনন্দ স্বর্গে উন্নীত করতে পারে। এ যেন এক ধরনের ধর্মই। কবিরাই প্রকৃতির পুরোহিত।"

আবৃত্ত অর্থাৎ কণ্ঠে সুশ্রাব্যতায় উচ্চারিত কবিতাই যথার্থ কবিতা। এই সংজ্ঞা ও মত নিয়েই মধুসূদনের হাতে আধুনিক কবিতায় নবজন্ম হল। এতে কোনো সংশয় নেই যে, কবিতা আবৃত্তি করার উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন মধুসূদন। অমিত্রাক্ষর নিঃশব্দ আত্মমগ্ন পাঠের ছন্দ নয়, বাংলার প্রথম আবৃত্তির ছন্দ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা মদনমোহন কাব্যালঙ্কার পাঠ্য কবিতার পদ্যাকার ছিলেন। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তির আদর্শে

তাঁরা বাংলা কবিতা লিখতে শেখেননি। তাদের কাব্যের যমক পান অনুপ্রাস শ্লেষ শব্দালঙ্কার, কুরুচি-গ্রাম্যতা কুৎসা উত্তেজনা রসিকতা প্রায় সর্বাংশেই ছিল দৃষ্টিসুখের, অশ্রুত শ্রুতিসুখের। দ্বারকানাথ দীনবন্ধু এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা কবিতায় সেই মধ্যযুগীয় পাঠ্য কবিতার স্টাইলই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের কবিতায় কণ্ঠস্বর ছিল না। রঙ্গলাল ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

মধুসূদনই তাই একালের কবিদের মধ্যে প্রথম আবৃত্তিসচেতন কবি। আবৃত্তির আদর্শেই তিনি নাটকে প্রথম আবৃত্তির ছন্দ ব্যবহারের কথা চিন্তা করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ এমন ছন্দ যা অভিনেতারা শ্রোতাদের সম্মুখে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করবেন, যে ছন্দের উচ্চারিত ধ্বনি সম্পদের উচ্চাবচতায় মনোভাবের বিচিত্র তরঙ্গগুলি দোল খাবে। এইভাবেই বিচার্ডসনের আবৃত্তি শেখানোর অভিপ্রায় সার্থক হল। মধুসূদন বুঝে গেলেন কবিতা কাকে বলে :

অন্ধ যে কি কল কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,সম-ভাব তার।
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন ? দয়া করি নরে
কবি-মুখ-রক্ষা-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নব নগরে। (কবিতা চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

এ কবিতা নীরবে পড়ার নয় উচ্চার্য ভাষায় আবৃত্তিযোগ্য বলেই স্বগত কবিকণ্ঠ সহসা ভারতীকে সম্বোধন করেছে শেষ তিনটি চরণে। আর কবির সংজ্ঞা রচনা করলেন মধুসূদন সেই অবিস্মরণীয় ভাষায় :

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে। (কবিতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এই অর্থেই বৈপ্লবিক যে এই ছন্দই বাংলা কবিতাকে পাঠের ভূমি থেকে আবৃত্তির আকাশে মুক্তি দিয়েছিল। মিলগ্রথিত, চরণে সমাপ্ত, বাক্যে বন্দী পদ্য কেবল

পাঠ যোগ্য কবিতা ছিল আবৃত্তি যোগ্য তার সম্ভাবনা তাতে ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দই নিছক একঘেয়ে পাঠের দাসত্ব থেকে কবিতাকে মুক্তি দিল। সে মুক্তি চরণের শৃঙ্খল ভেঙে ক্রীতদাসকে স্বাধীনতা দেওয়ার মতোই ছিল সমাজবিদ্রোহসূচক। এবং বিহারীলাল। ইংরেজি সংস্কার থেকে দূরে তাঁর অবস্থান সংস্কৃত কলেজের ধ্রুপদী শিক্ষায় তাঁর মেধাগঠন। কিন্তু তিনিও কবিতাকে মনে-মনে পড়ার আগল ভেঙে ধ্বনির জগতে মুক্তিদানের দিশারি ছিলেন। তাঁর সারদা মঙ্গলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত এই পত্রাংশ অন্তত তাই প্রমাণ করে :

"সর্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্যন্ত রচনা করিয়া বারে ঐ রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম সময়, শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল। তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সর্বস্ব ঐশ্বর্য রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রীপীড়িত ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ আবৃত্তি অথবা গান, দুই শিল্পরীতির যোগেই কবিতার উত্তরণের তত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠা পায়।

সুতরাং কবিতার ভিত্তিতে অপরিশীলিত অনভ্যস্ত পাঠ যে কবিতার উত্তরণ ঘটায় না কবিতাতে কবিতা হয়তো বাধা দেয়, তা প্রমাণের দাবি রাখে না।

একালের লিরিক কবিতা কোনভাবে পড়তে হবে, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি অরুণ মিত্র। তিনি লিখেছেন :

"এ কবিতায় [অর্থাৎ লিরিক কবিতায়] রূপ নেয় জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবির অব্যবহিত একান্ত প্রতিক্রিয়া। এই কারণে লিরিক কবিতা বিভিন্ন কবির প্রস্তুতিগত বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। ঘটনার বিবরণ নয়, কাহিনী নয়, নাট্যভাষণ নয়, যে কবিতায় কবির ব্যক্তিতা প্রকাশ পায় তার সংবেদনা ও অনুভূতির রূপায়ণ তাকে, তার মানবীয় উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, এ সেই কবিতা। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এখন একেই বুঝি। এই কবিতার জন্যই সমস্যার উদ্ভব। অন্য কোনো কবিতা পাঠের ধরন এর উপর চাপানো চলে না। এ কবিতা কেউ নিজে পড়ার সময় তার যে বক্তব্য তা সে ভাবই হোক আর অনুভবই হোক, বা আর কিছু, তাঁকে নাড়িয়েছে, অন্যের সামনে পড়ার সময় সেটাই শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করবেন, এই হল আসল কথা এ কবিতার ক্ষেত্রে।"

বিশিষ্ট কবি অরুণ মিত্রের এই কথাগুলি মনে রেখে উপস্থাপন করা যাক শঙ্খ ঘোষের "যমুনাবতী" কবিতাটিকে :

নিজস্ব এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।
বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়
ধাব-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়!
যাসনে ও হামলায়, যাসনে।
কান্না [illegible] মায়ের [illegible] আকুল ঢেউ তোলে, ভুলে না
মায়ের কান্না মেয়ের [illegible] উচ্চ হাহাকার মানে না
চলল মেয়ে রণে চলল।
বাজে না ডমরু [illegible] কন কন করে না [illegible] কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।
[illegible] দৃঢ় হাত [illegible] দৃঢ় কথা চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।
লেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু তিনটে গঙ্গা।
দুর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক ধক, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি।
যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার নিয়ে
যমুনা তার বাসর সাজে বাকুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে ।
নিভন্ত এই চুল্লিতে কোন আগুন ফেলেছে ?

একমাত্র পরিশীলিত কবিতাপাঠের কণ্ঠেই এই কবিতার বেদনারস নিংড়ে আনা সম্ভব স্থূল পঠনে কবিতাটির অপমৃত্যুই ঘটবে উত্তরণ তো দূরের কথা এই জন্যই কবি অধ্যাপক নরেশ গুহ বলেছেন :

"আবেগশিষ্ট শিক্ষিত গলায় আধুনিক বাংলা কবিতায় ধ্বনিভাষা শুনে একথা উপলব্ধি করা অনায়াস হবে যে সার্থক কবিতা মাত্রেই তার বিষয়বস্তু শব্দচয়ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ছন্দসৌকর্য পান হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বনিসম্ভব এক আলোক সামান্য রূপের জন্ম দেয় ।"

কবিতার এই "আলোকসামান্য রূপ" শুধু এক আবৃত্তিকারের কণ্ঠেই সম্ভব, এক কথা বলা কবির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ । অন্তত আমি কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের নিজের কণ্ঠে ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ' শুনে যে গভীরতায় তলিয়ে যাই কোনো আবৃত্তিশীলিত কণ্ঠেও তার সমধ্বনি পাই না :

ওর মা মরেছে আটষট্টির বানায়
বাপ এ সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ
ও যে যমের অরুচি ।
চরায়-বড়ায় খই ফুটছে তপ্ত খোলা
পাথর মাটি পাথর,
গোয়ালে গাই বিইয়েছে
তার দুধ বাঁটে নেই একপো
পুকুর-নদীর জল শুকিয়ে বাষ্প,
কোলে কলসি কাঁধে কলসি, কাতার কাতার
স্ত্রী, বৌ, জোয়ানমদ্দ ভাতার
চলছে চলছে—
এমন মুকাভিনয়
তাল খেজুরের মাথার ওপর খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে দ্যাখে
অলক্ষুণে সময় ।
আমি এনেছি টি-আর, জি-আর,

সেচ প্রকল্প সব গেল
আমি ছ'হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু ।
এই আমিন, এদিকে এসো,
ওরা যা বলে সবটা টোকো,
খুব ভালো ক'রে মাপো জোকো
যত দাবি আছে মেটা সব
আমি ছ'হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু

হাড়ের ওপর মাই কামড়ে টিপ্টিপে পাকাটি
ফটো খিচুন প্রেস ।
মজা পুকুরে পেট ফুলে ঢোল শামলী, ধবলী
ফটো খিচুন প্রেস

এমন মাটি মায়ের আঁচল
গাই গোরুর ফাটল
ছাতিফাটার মাঠ
হা হা খিদে দিচ্ছে ঝাঁট
মুখে মুখোশ এঁটে নিস
হিস হিস হিস হিস
জমি জিরেত ছালিয়ে দা দা
কাল কেউটের বিষ

হট যা হট টিয়োটা
এই সিবিসি মেয়েটা

ওর মা মরছে আটসট্টির বানায়
বাপ ও সনের খবায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ
ও যে যমের অরুচি

এ কবিতা যেমন নির্বাক দৃষ্টিতে দেখার নয়, তেমনি এর শব্দে ও শব্দের খোঁজে যে শ্লেষ বিদ্রূপ বেদনার বিচ্ছুরণ তাকে অনুভব করতে গেলে কবিই হন তার শ্রেষ্ঠ পরিবেশক তাই বিশ্বাস করতে হয় যে কবির কণ্ঠেই কবিতার যথার্থ উত্তরণ ঘটে, ঘটা উচিত। নইলে বৃত্তিবাস কেন তাঁর আত্মপরিচয়ে লিখবেন :

রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল
খুশি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান।

আদি-মধ্যযুগীয় কবির কাব্যপাঠ-শ্রবণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার এই বিবরণটিকেই রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত কবিতায় প্রায় পুনরাবৃত্ত হতে দেখি। সোনারতরী কাব্যের পুরস্কার (শ্রাবণ ১৩০০) কবিতায় কাব্যরসমুগ্ধ কোনো নৃপতি অজ্ঞাত এক কবির কণ্ঠে স্বরচিত কাব্যপাঠ শুনে কী পরিমাণে অভিভূত হয়েছিলেন। তার বর্ণনা এই রকম :

এত বলি কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ন,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান
বীণাঝংকার সম।
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিল ভূতল
দুবাহু বাড়ায়ে পরান উতল
কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, ধন্য, কবি গো ধন্য

আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি বাহিব অন্য
চিরদিন থাকো সুখে ।
ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে
করি পরিতোষ কোন উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি ।
প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দজলে
ভরি দুনয়ন কবি তাঁরে বলে,
"কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
এই ফুলমালাখানি ।"

কবিদের [illegible] কবিতা পাঠ [illegible] উক্ত সম্প্রদায়ের মুখ্য তাই [illegible] কবিতার প্রমাণ [illegible] কবিতা এমনি ভাবেই পাঠ করতেন। [illegible] এই [illegible] কবিতাটি [illegible] পারেন ? কারণ [illegible] স্বীকার [illegible] ? ভারতচন্দ্র লিখেছেন ?

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে
অধরে মধুরহাসি বাঁশিটি বাজাও হে ।
নবজলধরতনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিদ্যুতিজড়ায়ে নাচাও হে
নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ-সুধাকরহাসি-সুধায় বাঁচাও হে ।
নিতা তুমি খেল যাহা নিতা ভালো নাহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাউনি চাও সে চাউনি কোথা পাও
ভারত যেমন চাহে সেইমতো চাও হে ।

কবিরাই চিরকাল তাঁদের কবিতা নিজকণ্ঠে পড়ে এসেছেন। সুতরাং ধরে নিতেই হবে যে তাঁদের অনেকেরই পড়ার স্বভাব তাঁদের কবিতার স্বভাবের স্বরলিপি হয়ে ওঠে। শব্দ ঘোষ একবার লিখেছিলেন যে, বিনয় মজুমদার একবার কফি হাউসের এক কোনে তাঁর কবিতা পড়ছিলেন, "তিনি যত্ন সহকারে উচ্চারণ করছিলেন এক-একটি শব্দ একটু জোর দিয়ে আর

হঠাৎ কখনও যে হেসে ফেলেছিলেন অনেকেরা। কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল 'এত পড়াটা আসলে উনি নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা রসিকতা মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। এর [বিনয় মজুমদারের] কবিতাও ঠিক তাই, এর কবিতাও দুটো একেবারে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা।'

তবে সব কবিই নিজের কবিতার পাঠে সুবিচার করতে পারেন না। এমনকী একবার সিদ্ধান্ত হলে জীবনানন্দের নিজের কবিতা পাঠ শুনে আমরা অনেকেই চমকে উঠিনি। মনে আছে, বড়ই সাদামাটা ছিল সেই পাঠ। অথচ পরবর্তীকালে বাসু মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের পাঠের তুলনায়। কিন্তু কিছু কিছু কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাপাঠ শুনে মনে হতেই পারে তাঁরাই তাঁদের কবিতার সমঝদার। কারণ, যাঁদের কাছে আর মানা যেতে পারে। তিনি লিখে জানিয়েছিলেন :

"অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে বিষ্ণুদের কবিতা পড়া যে খুবেরা বা সুরের বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এদিক থেকে হয়তো বলা যায় যেন তাঁর কবিতা পড়বার ধরনটা একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালা। ছন্দের মধ্যে, বলতে কবিতার যে পদ্যরূপ তিনি তৈরি করতে চান, তার অনেকটা অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক ধরনের, সেটা হয়ত পাঠে ভালো। বুদ্ধদেব বসুর সুরেলা কবিতা পাঠের সঙ্গে বিষ্ণুদের এই ধরনের কবিতা পড়ার ধরন তুলনা করে দেখলে মনে হয় যে দুজনেরই কবিতা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত। তাঁদের কবিতা পড়ার ধরন।"

তাহলে সাধারণ একজন কবিতাপাঠক যদি কোনো দিন শুধুই পাঠক, অথবা কবিতার আদিষ্ট শিক্ষক কতবো টীকাকার কিংবা কখনো ভাষ্যকার, পাঠ পাঠকে কবিতায় উন্নীত করতে পারেন কেমন করে? গোরা উপন্যাসে তার একটি ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন :

"কবিতা আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ স্নেহ উৎপন্ন করে। সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে অভিভূত করে। সেটা যেন তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার মুখশ্রী, তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয়। ফুল যেমন গাছের শাখায় তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।"

এই সতর্ক সচেতনার শিক্ষা নিয়ে একটি কবিতাকে শ্রোতার কাছে, এমনকী সবার নিজের কাছেও পেশ করতে গেলে কবির সেই কণ্ঠস্বর, মুখশ্রী ও চরিত্রকে খুঁজে পেতেই হবে। তবেই একটি পবিত্রতাকে চড়িভাতির মাঠে, আবর্জনার মধ্যে খুঁজে বেড়ানো খাবারের টুকরোর জন্য, ওই শীতার্ত হতভাগাদের ঠিকমতো ফোটানো যাবে, যেমন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের এই চড়ুইভাতির গল্পে হয় :

সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে, তখনো
বিকেলের মাঠ মাঠে রোদ তিরতির করে কাঁপছিলো

ঘাসের ডগায়, কাঁপছিলো
গাছের পাতায়, ডোবার জলে , নদীর
বুক নিংড়ে উঠে আসছিলো
বিষাদজড়িত বাতাস, তখনো
একটা বুকনিশুড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘূর্ণি
ধানকাটা মাঠের মধ্যে পাক খাচ্ছিলো
উড়ছিলো শুকনো পাতা, ছেঁড়া ঠোঙা
সোনালী রিবণ, ছাই
সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে ভরানো
শালপাতা মাটির গ্লাস, মুরগীর পালক, রক্ত
শুকনোনো মাটির গ্লাস মদের বোতল সিগারেটের
পোড়া টুকরো, প্যাকেট
ওরা রেখে গেছে মাটির কলসি হাঁড়ির
উগ্র গন্ধ, মাছি
লাখটা কালো ছেলের দল খুঁজছে উচ্ছিষ্ট
পোড়া সিগারেট ঘষিয়ে দিচ্ছে টান ফেলছে
থুথু নৈরাশ্যে
কেউবা হাঁড়ির বাকি কলসি ঢালছে গলায়
ওরা খুঁজছে যদি কিছু পাওয়া থাকে যদি
একটা উত্তুরে হাওয়ার হল্লা এলো ধেয়ে
হাড়কাঁপানো শীতে কেঁপে উঠলো মাঝমাঠের শূন্যতা
কয়েকটা হলদে বাঁশপাতা উড়ে এলো কিছু
ছেঁড়া কাগজ
একটা ক্ষুধা কুকুর চীৎকার করে উঠলো কেঁদে
নির্জনতা লাফিয়ে পড়লো ডালপালার আড়াল থেকে
ঝুপঝুপ মাটিতে
মাটিতে থেকে উঠতে লাগলো ধোঁয়া
ঘনীভূত শ্মশান উঠলো জেগে
হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে

বিশ শতকের একটি সময়ে শিশির কুমার ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ অতিশয় জনপ্রিয় কয়েকজন পূর্ববিধি রবীন্দ্রনাথের কবিতা মঞ্চে দিয়ে আবৃত্তি করতেন। এঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একরকম উজ্জীবন নিশ্চয়ই ঘটত। তখন শ্রোতাদের দ্বারা এরা বিপুলভাবে সংবর্ধিত হতেন। অবশ্য কেউ কেউ এঁদের কবিতাপাঠকে নাট্যদুষ্টতার কারণে অভিযুক্ত করেছেন। তবে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাব্যপাঠ বা আবৃত্তি সম্পর্কে এই অতিনাটকীয়তার অপবাদ খণ্ডন করেছিলেন সৌম্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিমত ছিল :

"মঞ্চের উপর মঞ্চের উপযোগী আলো যখন তিনি [শিশির কুমার] বসিয়েছেন, মাইকেল বৈষ্ণব কাব্য সংস্কৃত কাব্য কি শেক্সপিয়র আবৃত্তি করতেন। তখন শ্রোতার কাছে সেটা অবিশ্বরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াবে। শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে তার অসামান্য কণ্ঠ ও সুন্দর উচ্চারণ তো কাজ করতই, তার ওপর যে ব্যাপারটা শ্রোতাকে উদ্বেল করত সেটা হল তাঁর আবৃত্তির মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা। কোয়ার্টিসিজমকে যে অর্থে বিদগ্ধোল্লাসের নরকুণ্ডায়ণ বলা হয়েছে, খানিকটা সেই রকম বিস্ময় বোধ। তাঁর আবৃত্তিকে ক্ষণে ক্ষণে ভাবনাময়ের অপ্রত্যাশিতের চমক উজ্জ্বল করে তুলত। তাঁর প্রখর মনঃশীলতা ও সুগভীর সাহিত্যবোধ আবৃত্তির সময় কবিতাটির যেন নতুন সব অর্থ, অভিনব কিছু কিছু ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করতে থাকত। এর মধ্যে নাটকীয়তার যে উচ্ছ্বাস ছিল তা কিন্তু কখনই খালো শস্তানাট্যে বেসামাল চাতুরি নয়।

এই প্রচ্ছন্ন নাটকের দিকে এলিয়টও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শব্দ ঘষে এলিয়টের প্রগাঢ় কবিতাপাঠ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছিলেন :

"কবিতা যেমন বাচনমাত্র নয়, বাচন আর শুধু তার সুরের বুনুনিতেই যেমন কবিতা, তেমনি পড়ার মধ্যেও চাই প্রচ্ছন্ন এক সুর এবং নাটক। কিন্তু সেই থাকতে হবে যেন কোথাও এই সুর বা নাটক আলগা হয়ে মাথা না তোলে, শ্রোতাদের মন যেন এমনি মনে হতে থাকে যে, গোটা ব্যাপারটাই প্রতিদিনের কথাবার্তার সন্নিহিত। যেমন কবিতায় তেমনি কবিতা পড়ায়, এ দুটিকে মিশিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত কথা। কিন্তু এই মিশিয়ে নেওয়াই হল সত্যিকারের পথ।"

পড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই সুর ও নাটক নিয়ে বাচনকে কবিতায় উত্তীর্ণ করার শেষ উদাহরণটি এখানে নিবেদন করি। কবিতার নাম বাঞ্ছনা কবি অজিত রাইবি :

দলিলে সব লিখা আছে, দেখে দেন গো বাবু
বাঞ্ছনা মুকুব হবে কিনা।
কোঁচড়ে কি এনেছিস ? ঘুস নিই না,

তা ব'লে তো এমনি এমনিও হয় না ।

বড় গরীব গো বাবু নুন আনতো পান্তা ফুরোয়

তেমিরা বাবু লোক বড় লোক, দেখে দেন গো বাবু,

দেখে দে

খাজনা মুকুব হবে কিনা ? তবে নামি গো বাবু

কলসি তুলি, গায়ে হেলে দুলে ওঠে সাপ —

কোমরে জড়ায় চামনা ।

ঘুস নিই না কিন্তু দিবি কিছু ভেট তো দিবি

ঘরেতে আছে একখানি ঘড়া, ভোঁতা কাঁথা, আধ ফালি

কাপড়খা আছে শয়নে ।

কিছু দিবার নাই গো বাবু ।

—তুই, তুই ই তো আছিস

মহাজনের মত তোর ওই দেহের চামড়া

তাও দিবি না ?

কবিতার উত্তরণ পরিমার্জিত পরিকল্প অনুশীলন ছন্দপাঠ ও আবৃত্তির ভূমিকার পাশে আর এক পদ্ধতি হল কবিতায় সুরারোপ কবিতাকে গানে পরিণত করা ।

কিন্তু সে অন্য এক বিস্তার স্বতন্ত্র তার ইতিহাস ভূগোল

১৬ আগস্ট ২০০১

বর্তমান প্রবন্ধে কবিদের কবিতার সবটুকু উদ্ধৃত করা সম্ভব হলো না পৃষ্ঠা সংক্ষেপের কারণে এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী । — সম্পাদকদ্বয়

তিন দশকের রাজনৈতিক চেতনা ঃ বাংলা কবিতা

(ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

।। এক ।।

[illegible]

কবিতা পত্রিকার যে সংখ্যায় জীবন-বন্দনার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩৪৫) তার প্রথম রচনাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের স্বরূপ'। সেখানে রবীন্দ্রনাথ

[illegible]

[illegible] বন্যাপ্রসূতি।*

[illegible]

আগস্ট-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপুলতা আন্দোলন ১৯৪২ এই গ্রন্থ শেষ হয়ে যায়। সত্যি কথা স্বীকার করাই ভালো। গান্ধীজির মুক্তিআন্দোলন, অনশন বা অসহযোগ, গান্ধী সুভাষ বিরোধ, বন্দীশালায় নিরস্ত্র বন্দীদের ওপর গুলিচালনা ও সমস্ত বিষয়ের দিকে রবীন্দ্রনাথের যতটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের তেমন ছিল না। কেননা, আমাদের আলোচ্য নন আমরা ত্রিশের দশকের অন্যান্য কবিদের দিকে তাকাবো। পরে ১৯১৮ সালে ফজলুল হক গ্রন্থাবদ্ধ আইনের যে সংশোধনী পেশ করেছিলেন তাতে চরমপন্থীদের বাধা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হল। এর ফলে গ্রামীণ ব্যাপারে গুরুতর ভূমিব্যবস্থা ও অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এরপরে ১৯১৮ ও গ্রন্থাবদ্ধ আইনের আরো সংশোধন গ্রামে গ্রামে জনসালিশী বোর্ড গঠন। এই সালেই Bengal Money lenders Act পাশ করা।

গ্রামজীবনে এর প্রতিক্রিয়া তারাশঙ্করের উপন্যাসে পাওয়া গেছে। বিপ্লবীদের আগস্ট আন্দোলন নিয়েও সেরা কবিতা লেখা যায়নি। অবশ্য ভালো বা খারাপ কবিতাসমূহের মাত্রা উপন্যাস এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের প্রসঙ্গে কবিতা হয়ে ওঠে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রবল মন্দার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের কৃষিজাত পণ্য প্রচণ্ড মার খেল। এর ফলে বাংলার কৃষিজীবীরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। ভূমিহীন শ্রেণী তো সংকটে পড়বেই কিন্তু ছোট ছোট জমির মালিকরা চাষের খরচ উঠে না পড়ায় সংকটে পড়ল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকরির সংকট আগেই ছিল, এখন আরো তীব্র সংকট। ১৯২৯-এ বেকার জীবনানন্দের বেকার কবিতায় অসহায়ভাবে এই সংকটের চেহারা। চাকরিজীবীর বাড়তি বিক্রি বা সাময়িক আয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার পর তাদের কি সঙ্কট। লাগে অর্থিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন এই আত্মানুসন্ধানও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা।
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা
আমার পথেই শুধু বাধা? (বোধ)

জীবনানন্দ নিজেই একদা জানিয়েছিলেন যে, আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয় যেমন ইতিহাসবোধে একটা আধুনিক কবিতা। সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়। কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের কল্পে যে ভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূসত্তা। আধুনিক কবিতা পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা মনে রাখেন না। (আলোচনা, পূর্বাশা, আষাঢ় ১৩৫৩) * এই যুক্তিতেও শাস্ত চারপাশের জনসমুদ্রের কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন একক মানুষের আর্তনাদ, সুবিধাবাদী রাজনীতিক ও বাস্তবকে অস্বীকার করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের (নিজেকে সহ) প্রতি তীব্র শ্লেষ — 'তাও অসহ্য লাগে ও আত্মরতি / অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? আমাকে এড়িয়ে বাঁচাও নিজেরই ক্ষতি। / ভূমিবিলাস সহেনা দুর্বিপাকে।' সমর সেনের সিংহসঙ্কটের যন্ত্রণার কথা তো সকলেরই জানা —

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,

আমার অন্ধকারে আমি

[illegible] (মুক্ত)

পদধ্বনি [illegible] এই অন্ধকারের নিঃস্ব বিলাপ

পার্থ যে তোমার

[illegible]

আজ দেখি অসাধ্য যে তার।

প্রবাহমানতার সমস্যা [illegible]

কিন্তু [illegible] দশকের প্রধান কবিদের আশ্রয়, [illegible] সমাধান [illegible] এই নিয়ম [illegible]

[illegible] সমাজতন্ত্রের সঙ্গে [illegible] শ্রেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দ্বন্দ্ব [illegible] উপলব্ধি [illegible] প্রথমা [illegible] [illegible] প্রেমেন্দ্র মিত্র রোমান্টিকতার সঙ্গে [illegible] সাম্রাজ্য [illegible]

এখনো ফেরারী কেন?

ফেরারী সব পলাতক সেনা

সাত সাগরের তীরে

চৌকিদার হেঁকে যায় শোনো,

আলো সব সূর্য-কণা

রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।

[illegible] (ফেরারী)

তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র [illegible] কার্ল মার্ক্স [illegible] মানবতাবাদই [illegible]

তিনজন প্রধান কবি [illegible] বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং সুভাষ চন্দ্রবর্তীদের সমসময় [illegible] এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ত্রিশ এবং চল্লিশের সন্ধিক্ষণের কবি। [illegible] বুদ্ধদেব ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত বামপন্থীদের কাছের লোক। ১৯৩৭ এ প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশিত Towards Progressive Literature এবং প্রগতি নামক সংকলনের অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি। ১৯৩৮ এর ডিসেম্বর মাসে প্রগতি লেখক সংঘের কলকাতা অধিবেশনে বুদ্ধদেব Bengali Literature Today Position of Modern Writers শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। কবিতা পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৬) সম্পাদকীয় শিল্প রচনায় বিষয় এবং সময় সেখানে অপূর্ব সাফল্যের কথা বলেছিলেন তিনি। অভিভাষণে বুদ্ধদেব সাহিত্যের সমাজ নিরপেক্ষতার কথা বলেছিলেন এবং 'শোষণমুক্ত

নবীন সমাজের স্বপ্নও দেখেছিলেন। ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেপ্টেম্বর চল্লিশের দিকে তাঁরা তাঁকে বিচলিত করেছিল। দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশন সোসাইটির স্মৃতিতে যা হাউস পত্রিকা বের করেছিলেন তাতে 'প্রতিবাদ' নামক কবিতা লিখেছিলেন তিনি।

উদ্দীপ্ত তরুণ প্রাণে
ঘাতকের অস্ত্র যারা হানে,
মানুষের যে মূল্য পরম
তারে করে পদাঘাত যাদের বিক্রম
তাদের দুঃসহ পাপে
তীব্র অভিশাপে
যদি না দহিতে পারি আত্মের ঘৃণায়,
যদি না ঝঙ্কারি ওঠে দিক দিক আত্মার ঘৃণায়
তবে কেন কবিতায় মনুষ্যত্ব ভাষা তার বৃথা,
পশুত্বের প্রতিবাদে নিখাদে বেখাদে
আজ হোক উদ্দীপিতা
আমার কবিতা।

বোঝাই যায় তাৎক্ষণিক আবেগ এবং প্রবল ক্ষোভ কবিতাটির জন্ম দিয়েছে, এটি বুদ্ধদেবের নিজস্ব কবিকলার প্রকাশ নয়। সমর তাঁকে দিয়ে এই কবিতা লিখিয়েছে। যেমন লিখিয়েছিল একই সময়ে গান্ধীবাদী, বামপন্থিক এবং সমাজতান্ত্রিক কবি বলে পরিচিত অমিয় চক্রবর্তীকে দিয়ে —

গড়ি প্রাচীর।
ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির
গান ধর গো প্রাণ খড়গ।
ঐ কালো পন্থী কেউ টিকবে না, না, না।

কিন্তু বুদ্ধদেব বা অমিয় চক্রবর্তী কবিতাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা মতবাদের প্রচারের হাতিয়ার করতে রাজি ছিলেন না। বুদ্ধদেব যত দ্রুত প্রগতি লেখক সংঘ বা ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন প্রায় ততটা দ্রুততার সঙ্গেই তাদের থেকে দূরে সরে যান। ১৩৫৩ আশ্বিনের কবিতা পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি সরাসরি সাহিত্যের রাজনীতিকরণের বিরোধিতা করেন, 'দেশে আজ সাহিত্যিক দল বলে কিছু নেই, সেখানে আবহাওয়া তাই চলে গেছে। তার বদলে আছে পলিটিকাল পার্টি, দল কথাটা শুনে শিউরে উঠতেন, এমন লোকও আত্মনিয়োগ করেছেন পার্টির পরিচর্যায়। সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক দল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দল, রাজনীতির চর্চার জন্য সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্যের আলোচনার জন্য রাজনৈতিক বৈঠক। এই সব নিদারুণ

অপরেশবাবুর সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। কবিদের সম্পর্কে তিনি একটা বলেছেন তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও তিনি এদের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর মতে রাজনীতি নিয়ে এই কবিতাগুলির ফলে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা প্রবীণ আমাদের আধুনিক সাহিত্য অবগত তাঁদেরই অনেকে সংক্রামিত উদভ্রান্ত ধর্মচ্যুত। এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন ঈশ্বরানন্দের। তাঁর মতো কবিও নাকি উজ্জ্বলের হুংকারে আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। আরও তাঁদের কিছির। বেলা অবেলা কালবেলার অন্তর্গত কবিতাগুলি বুদ্ধদেবের ভালো লাগেনি। তাঁদের সময় সচেতনতার জন্য। তিনি রামপন্থীদের যে গোঁড়ামির নিন্দা করলেন এখানে তিনি নিজেই কবে নিজের।

রাজনীতির ভাবনা ছেড়ে বুদ্ধদেব কেন কবিতা নিয়ে নিজের নিজস্ব ভাবে ভাবতে চলে যান, আর অমিয় চক্রবর্তী ঈশ্বর চেতনা বা রবীন্দ্রনাথের সান্ত্বনা খোঁজেন। তাঁর নিজস্ব অন্তরের অসাধারণ আকুতি ঝরে পড়ে এইভাবে কবিতায়,

তোমার মন্দিরে, প্রভু, সারা সূর্যবেলা
সিঁড়িতে ঘুরেছি ধান, নীচের আঙিনা
নিকিয়েছি, কুয়ো থেকে জল
[illegible]
(বাঙলার দেব মন্দিরের পুরধানী)

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান [illegible] হতে [illegible] নিয়ে [illegible]

শান্তিনিকেতনে
[illegible]
সুগন্ধি বেলায়
নীলাম্বর দিকে দিকে খুলে যায়।
শাল বীথিকায় বৈতালিক
চলন্ত সূর্যের মন্ত্র ঘরে ঘরে দেয় প্রাথমিক
রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দের ভাষা
তাই দিয়ে সুরু হয় সমস্ত দিনের [illegible] আশা (উদয়ন দূরধানী)

॥ দুই ॥

জাতীয় সংকট বা রাজনীতি যাঁদের তেমন বিচলিত করে নি তাঁরাই কিন্তু আন্তর্জাতিক সংকটে বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। ত্রিশের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিরা সবাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে লালিত। ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেই বিপন্ন করতে বসেছিল। তাই আমাদের কবিদেরও অনেকেরই মনে হয়েছিল যে তাঁদের উৎসাহ যেন বিপন্ন হতে বসেছে। কেউ কেউ একে কলোনিয়াল মানসিকতা বলতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস এগুলোকেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ১৯২৫ এ ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টির প্রতিষ্ঠা

সাম্যবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে বাঙালি লেখকদের সচেতন করতে থাকে। তারও আগে রুশ বিপ্লব বিশেষ করে মাক্সিম গোর্কির রচনা বাঙালি কবিদেরও উদ্বেলিত করে। ১৯২৫ এর ২৫ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক লাঙল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতেই নজরুলের 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হওয়া শুরু হল নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত গোর্কির 'মা'। ১৯২৭ এর মে দিবস সংখ্যায় বলশেভিক নেতা নজরুলের ইন্টারন্যাশনাল এর বাংলা প্রকাশিত হল। তাই আন্তর্জাতিকতাবাদের যে সুর সর্বহারার অধিকার আন্দোলনে আছড়ে পড়েছিল ত্রিশের দশকেরও একটু আগে থেকে। এর পুরোধা অবশ্যই নজরুল। কিন্তু নজরুল জাতীয়তাবাদের শক্ত ভিত-এর উপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিকতার কথা ভাবেন। দেশের মানুষ দেশের রাজনীতি এবং দেশের আন্দোলনের ভিত্তি কেবল ভূমি নয় অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণকারী। বহু আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ফলটি তার চোখে ধরা পড়ে যায়। 'দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে'। অনেকটা ক্ষুব্ধতা থেকেই তাঁর এই রচনা।

বাকিরা ১৯২৬ সালে 'প্রগতি' লেখক সংঘ, যুদ্ধোত্তর আগে পর্যন্ত শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে সরাসরি রাজনীতিকে নিয়ে আসার কথা ভাবেন নি। রাজনীতি মানে মার্কসবাদ দলীয় কোনো মতবাদ নয়। অবশ্য ১৯৩১ এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকা কে কেন্দ্র করে মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিছু এলিটিস্ট বুদ্ধিজীবীর কথা আসে। হিরণকুমার সান্যাল তাঁর 'পরিচয়ের কুড়ি বছর' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, সুধীন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম পরিচয় এর পাতায় শিল্পসাহিত্যে মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রয়োগকরে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুশোভন সরকার ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিচয় এর লেখক গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার ফলে পরিচয়ের পাতায় লাঙলের আভা আর একটু বাড়ল। তবুও বলবো এলিটিস্ট ছিলেন ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের এলিটিস্ট কবিরা তাদের পরিচয়ের পাতাতেই মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হয়ত ঘোলাটে হয়ে না উঠলে তাঁরা এ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাতেন বলা শক্ত। ১৯৩৩ সাল থেকেই জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। এই বছরেরই ১০ মে বার্লিনের রাজপথে নাৎসী বাহিনী বিশ্বখ্যাত লেখকদের বই পোড়ানো শুরু করে। ইতালিতে মুসোলিনীর সাম্রাজ্য লালসা ও যুদ্ধপ্রস্তুতিও মানব সভ্যতার আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩৫ এর ২১ জুন প্যারিসে শিল্প-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও বিশ্বশান্তির বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ১৯৩৫ এর সপ্তম অধিবেশনে এক নতুন রণনীতি ও রণকৌশল গৃহীত হয়। এখানেই ডিমিট্রোভের সেই বিখ্যাত 'যুক্তফ্রন্ট থিসিস' পেশ করা হয়। অপরদিকে ১৯৩৬ এর ১৮ জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৩৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মুখোবন্ধ হতে থাকে, স্প্যানিশ রিপাবলিক আক্রান্ত হয়। আর যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড বিপন্ন স্পেনের পাশে এসে দাঁড়ায়, হাতে বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নামে তার মধ্যে ছিলেন দেশ বিদেশের অনেক

খ্যাতিমান শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী

বাল্যক ফরাস ফাঁকওয়াল বা কনস্ফাদের মতো সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দান করেন। তাঁরা ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সঙ্গেই ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিস্ট কবলিত ফ্রান্স ও অন্য বহুদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। এক্ষেত্রেও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। স্পেন বা ফ্রান্সে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আমাদের কবিদের অনেককেই উদ্বুদ্ধ করে। [illegible] সেখানে দেশ বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা নেই। ফ্যাসিবাদের আসল চেহারা সাতাশ বছর এদের দেখতে হয় নি। ঘটনাও অনেক দূরের। একমাত্র সাদেন চন্দের [illegible] কিন্তু উপলব্ধির কথা তুলনাই চলে না। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ এই উপলক্ষে গড়ে উঠল বিশেষ শিল্প হয়ে আগেই আসল ঘটনাটি ঘটে গেছে। ১৯৪১ এর ২২ জুন হিটলারের নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করে। এতকাল যা ছিল কমিউনিস্টদের কাছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ [illegible] ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে মিত্রশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার কথাও বলা হয়। এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। প্রথম লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন ১৯৩২-১৯৩৪ সালের লাল। প্রকাশ্যে কিছু প্রতিবাদের ভবিষ্যৎ ছবি। এরা ফ্যাসিবাদের সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ। ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে মৃত্যুপ্রবণ হয়েছিলেন বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের দেশে। তাই এই সংগ্রামটিও আন্তর্জাতিকতার পরিচয়েই [illegible] তাই জীবনের সঙ্গে তা একাত্ম হয়ে ওঠে না।

একটি উদাহরণ দিলেই পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে। ১৯৪১ এর ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিস্ট জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু সে সময়ের এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানান এইভাবে—

শোনো শোনো হাক হোকনুরি সন্ত্রাসবাদ [illegible] কথা
দেশে দেশে কুয়াশা মন্ত্রের যত ঢেলে দেয় [illegible] বিষ
স্বার্থের বলিষ্ঠ চিত্রে বেনেদার বলিয়েদে মুমূর্ষু অতিথি
জলে স্থলে যুদ্ধ চলে ভাবতেরও চিত্ত টলে প্রাণের নির্দেশ
কলকাতায় পুঁথিমাও ফুটপাতে লাগা ঝাড়ে দুরদেশের দেশ

(২২শে জুন ১৯৪১। সাতভাই চম্পা)

স্তালিনগ্রাদ রক্ষার অমর সংগ্রামকে কবি বীর দেখেন এই ভাবে —

একাকার দেশ বিদেশের গান হারায় বাধা
তিস্তার স্রোত সাহারায় দুর স্তালিনগ্রাদে
বাংলাদেশের শান্ত মিনার (সাতভাই চম্পা)

আন্তর্জাতিক সংকটের সঙ্গে জাতীয় সংকটকে মেলানোর প্রচেষ্টা কবিরা এখন থেকেই সুরু

করলেন স্তালিনগ্রাদের লড়াই সমন্ধে সেলের কবিতায় আসে। তার মধ্যে তাঁর

এক অজানিত বনা জানোয়ার

পাশবিক ঘুম থেকে ধীরে ধীরে উঠে

[illegible] সাজানো [illegible] ক্রেমলিনের [illegible]

[illegible] মুখে [illegible] ক্রমশই আচ্ছন্ন হয়ে [illegible] (স্টালিনগ্রাড)

বোঝাই যায় এটি [illegible] উপস্থাপনা [illegible] স্টালিনগ্রাদের [illegible] ঐতিহাসিক সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন—

প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী

দাঁড়ায় নগরদুর্গে (স্টালিনগ্রাড)।

সুভাষ জনযুদ্ধের [illegible] কবিতায় তুলে ধরেছেন। জনযুদ্ধ ও [illegible] যুদ্ধ শুরু করেন পঁচিশের জনযুদ্ধ। জাপানী [illegible] চট্টগ্রামের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তাঁরা এলেন স্তালিনগ্রাডের কথা মনে পড়ে—

এতগুলি উদাহরণ আলোচনাটিকে [illegible] কিন্তু এমন [illegible] এমন বিপরীতে কয়েকটি উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরার জন্য [illegible] এবং পাঠককে আকৃষ্ট করা। এই দুইয়ের মধ্যে অনুভূতির অনেক পার্থক্য থাকে। ফ্রেঞ্চে রাইমঁতে [illegible] বলে আরগঁ যা মন্তব্য করেন যে যন্ত্রণার গান রচনা করেন আরাগঁর কাছে [illegible] তা সম্ভব ছিল না।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবস্থানও এক্ষেত্রে কিছুটা বিচিত্র। পরিচয় পত্রিকায় তিনি মার্কসবাদীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, [illegible] পর্যন্ত কমিউনিস্ট বন্ধুদের হাতেই পরিচয় এবং মানিকদাকে ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৩৮ এ প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলনের সভাপতিত্ব তাঁর সমস্ত, [illegible] তিনি সম্মত হয়েছিলেন। [illegible] উর্দু কবি সমরকন্দ এবং তরুণ উর্দু কবি আলি সরদার জাফরিকে [illegible] আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অপরদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে [illegible] জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ফিনল্যান্ড আক্রমণ তিনি পছন্দ করেন নি। (এটা অবশ্য নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যে এই আচরণ পছন্দ করেন নি তার নিদর্শন [illegible] সেই কালে ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে) শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠেছিলেন এম.এন. রায়ের অনুগামী। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে তখন তিনিও প্রবল আলোড়িত। কিন্তু জার্মান ফ্যাসিবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসবাদকে তিনি সমদৃষ্টিতে বিচার করেন, ট্রটস্কির প্রতি আচরণকে ধিক্কার জানান, বস্তুত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে তার মত মোহমুক্ত দৃষ্টিতে আর কোন বাঙালি কবি তুলে ধরেন নি।

ত্রিশের দশকের কবিরা চল্লিশের দশকে এসে অনেকেই যেন নতুন করে ভাবতে থাকেন। রাজনীতির চেহারাটা এই সময় থেকেই পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। একদিকে প্রাক স্বাধীনতা পর্ব ১৯৪৪-৪৭ এই পর্বটি আজাদহিন্দ বাহিনীর মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, শ্রমিক শ্রেণীর দরকষাকষি দাবী আদায়ের সংগ্রাম এবং বন্দী কৃষক আন্দোলনের সাক্ষী। ১৯৪৬

এর ২১ থেকে ২৪ মে খুলনা জেলার সৌভোগে প্রাদেশিক কৃষক সভার নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিষ্ণু দের 'সৌভোগ' কবিতা রচিত। এই সম্মেলনেই তেভাগার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চল্লিশের যুগ নিশ্চয় মসৃণ স্বতন্ত্র নয়, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে। তবে এই যুগের অন্যতম প্রতিনিধি রামবসু জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা এই ধারাবাহিকতায় নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিলেন। এরা বিশুদ্ধতাবাদ এবং এলিটিস্ট মার্কসবাদ থেকে কবিতার মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাই বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন এবং লর্ডনারের ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে এঁরা সমদূরত্বের অধিবাসী। এই কবিরা তেভাগা, ধর্মঘট ও দাঙ্গা তো দেখেইছেন তার সঙ্গে দেখেছেন দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়-এর রাজনীতি, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া, কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানার বিপ্লব, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংঘাত, লাঠি ও গুলি। এসব কিছুই চল্লিশের দশকের কবিতাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। তাই এঁদের কবিতায় সব কিছুরই প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাম বসুর বিখ্যাত 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে' অথবা 'একটি হত্যা'র মতো কবিতা, 'তোমাকে' এবং যখন যন্ত্রণা'র অনেক কবিতা এই সময়ের প্রতিনিধি। জোরালো ভাষায় সাম্যবাদী আদর্শের ঘোষণা আর তার সঙ্গে রোমান্টিক চেতনাকে মিশিয়ে দেওয়া -এই পর্বের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। মনীন্দ্ররায়, মঙ্গলাচরণ, রামবসু বা সিদ্ধেশ্বর সেনেরা এই সহৃদয়বানটিকে কবিতায় ধরে রাখতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্যের কথা স্মরণ করি — ইতিহাস যদি আমাদের স্বপক্ষে না থাকতো, যদি আমরা চট্টগ্রামে সোরগোল তুলতে না পারতাম, তবে স্পর্দ্ধার হলেও আমার স্থির বিশ্বাস, আমরা পেতাম না সাতটি তারার তিমিরের জীবনানন্দকে যা সত্যিকারের জীবনানন্দ। পেতাম না বিষ্ণু দের সাতভাই চম্পা, সন্দীপের চর বা সৌভোগের মত কবিতা। (চল্লিশের প্রেক্ষিত রাম বসু)। চল্লিশের কবিদের এই ঐতিহাসিক অবদানের কথা মেনে নিতে আপত্তি নেই। বিশেষ করে জীবনানন্দের 'ক্ষেতে প্রান্তরে', 'তিমির হননের গান', '১৯৪৬-৪৭', 'ইতিহাসযান' বা 'হে হৃদয়ের' মতো কবি তার চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের রাজনীতির অবদান অস্বীকার করা যাবে না।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের সময় ও মেজাজ আলাদা হয়ে গেছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং তা থেকে প্রত্যাহার, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কবির অংশগ্রহন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। সহ-অবস্থানের তত্ত্ব রাজনীতির চেহারা পর্যায়ের কবিতাও পাল্টায়। কবিতা সমষ্টিকে ছেড়ে ব্যক্তিগত হয়ে পড়তে থাকে।

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাজ্ঞ বিটগেনস্টেইন নির্ভুল মন্তব্য করেছিলেন — /যা কিছু ভাবি আমরা, তা অবশ্যই ভাবতে পারি স্পষ্ট করে। যা কিছু বলতে পারি তাও বলতে পারি স্পষ্ট করে। কিন্তু যা কিছু ভাবি তাই বলতে পারি না।" মানুষের বাসনার সবটুকু বাঙ্ময় হয় না বলেই মানুষের কবিতা লেখার প্রয়াস অন্তহীন এবং সেই কারণেই কবিতা অনাদি ও অনন্ত। অর্থবদ্ধ ভাষার কবিতা সীমাহীন ব্যঞ্জনা নিয়ে যাত্রা করেছে এক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এবং তার যাত্রার সীমান্ত এক অনৈতিহাসিক আগামী দিনে। এই যাত্রাপথে কবিতা বাঁক ফিরেছে বারে বারে কিন্তু তিনটি ক্রিয়া তার নিত্যপ্রিয় — arousing, manipulating and eventually fulfilling emotional expectations. কিন্তু মানুষের emotional expectations-এর সম্পূরণ সম্ভব কি? লেখিকা ও চিত্রপরিচালিকা সুসান সনতাগ বললেন সুন্দর করে : 'the art of our time is noisy with appeals for silence. কবির কাজই হল ভাষার উপর আক্রমণ যদিও শব্দ তাঁর প্রধান সহায়। শুদ্ধতম শিল্প হতে চায় বলেই কবিতা 'the most impure, the most contaminated, the most exhausted of all the materials out of which art is made' ভাষাকে চেষ্টা করে ভাষাতীতে নিয়ে যেতে। সনতাগ তাই বলেন যে, নৈঃশব্দ্যেই শব্দের চরম পরীক্ষা। সুবিপুল নৈঃশব্দ্য আছে বলেই কবিতার অথরের সঙ্গে কাব্যতত্ত্বের মৃত্যুও ধ্রুব।

অথরের মৃত্যু যারা ঘোষণা করেছেন তাঁরা কিন্তু ভাষার বহুমাত্রিকতা এবং সুদূরে উড্ডীন হওয়ার সামর্থ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, কবিতার পাঠক আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কবিতাকে পরিণত করতে পারে সমুদ্রবিহঙ্গ অ্যালবাট্রসে; কবির কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই কবিতার ওপর। অথচ প্যারাডক্স এইখানে যে, শব্দ নইলে কবির ব্যবসা চলে না। শব্দই চিনিয়ে দেয় কবির শিক্ষা, পরিবেশ, মেজাজ, শ্রেণীপরিচয়, মুক্ত অথবা বন্ধনহীন আনন্দের বিশেষ মুহূর্ত। ১৯৬১ তে ফ্রানৎস ফ্যানন (Frantz Fanon) তাঁর 'The Wretched of the Earth'-এ লিখছিলেন, ভাষার মধ্যেই ধরা পড়ে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের বক্তব্যের ভিন্নতা। তাঁর মতে, কবিতার ভাষাতেই ধরা পড়ে 'Controller'-এর সঙ্গে 'Controlled'-এর পার্থক্য, 'wealth'-এর সঙ্গে 'poverty'র পার্থক্য এবং 'Self-denial'-এর সঙ্গে 'self fulfilment'এর পার্থক্য। কবিরা তো চিরকালই মানুষের কথা বলেন। সব দেশের কবিরাই মানুষের কথা লেখেন মানুষের দিকে তাকিয়ে। সেই কারণে একই সুতোয় বেঁধে দেওয়া যায় ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অথবা শঙ্খ ঘোষ এবং জয়গোস্বামীকে। সাদামাঠা ভাষায় যে-রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,/কে বাঁচিতে চায়' তাঁর

সঙ্গে 'অমর একুশে' কবিতার কবি হাসান হাফিজুর রহমানের কালগত ব্যবধান কতটুকু? ব্যবধান ততটুকুই যাকে চিহ্নিত করা যায় ঔপনিবেশিক এবং নব্য-ঔপনিবেশিক শব্দ দুটো দিয়ে। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র এই পরিচায়ক শব্দ দুটির মধ্যে প্রথমটির দ্বারা চিহ্নিত হবেন এবং দ্বিতীয় শব্দটি এখনও সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে চলেছে সাতচল্লিশের পরেকার সব বাঙালি কবিকেই। এই দ্বিতীয় শব্দটি ত্রিপুরার অনিল সরকারের অসাধারণ কবিতা 'হীরাসিং হরিজন'কে চিনিয়ে দেয় যেমন, তেমনি বাংলাদেশের কবি আবু হাসান শাহরিয়ার-এর এমন একটি কবিতাকে ('একলব্যের পুনরুত্থান') যার দুটি পঙ্‌ক্তি এই রকম 'ফিরেছি একাকী আমি একলব্য। ফিরে আসি সহস্র ধিক্কারে।/আমি নিম্নবর্ণ। আমি হরিজন। জাতিগোষ্ঠী যত সর্বহারা'। এখনও যাকে তৃতীয়বিশ্ব বলি দুই কবি সেই একই বিশ্বের এবং তাঁদের ভাষা-মাধ্যমও একই। বিস্ময় এখানেই শেষ নয় বোধ হয়। যাঁরা Don Lee, Nikki Giovanni, Roderick Panell-এর লেখার সঙ্গে পরিচিত তারা দেখবেন দুই পৃথক ভাষার কবিদেরও মূল কথা একই : 'directness', এবং ঔপনিবেশিকতার নানা মূর্তিতে আক্রমণ এঁদের কবিতাকে করেছে 'more direct, more angry, more lyrical, more vernacular and even more political.' যে-নব্য ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের তিক্ততা বর্তমান কালের দ্বিতীয় বিশ্বের অধিনায়ক কিউবা-র ফিদেল কাস্ত্রোকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে অনেক কথা, সেই নব্য ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা আমাদেরই কাককে চিনিয়ে দেয় নারীবাদী বলে অথবা সন্ত্রাসবাদী বলে। ঔপনিবেশ-বাঙলার সেরা ফল অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ যাঁর কবিতার ভাষায় ছিল রাজনীতি-সংস্পর্শহীন যথার্থ মুক্তির সংকেত। পৃথিবীর অন্য কোনো উপনিবেশ কোনোদিন মাঝারি মাপের কবির জন্ম দিলেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিতে পারে নি। অদ্ভুত সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি তথাকথিত উত্তর-আধুনিক তো নন্ই। এমন কি পশ্চিমের আধুনিকদের মত তাঁর কবিতায় urbanism ছিল না; ছিল না Eroticism ছিল Dehumanization-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ছিল জাতির প্রাচীন 'মিথ'কে রোমান্টিক পদ্ধতিতে আত্মীকৃত করে তাকে সর্বজনীন করে তোলা এবং যাবতীয় ইজম্-নিরপেক্ষভাবে নির্বাক অতীতকে বাঙ্ময় রূপে দেখার আকুতি।

জীবনের অন্তিম লগ্নে মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন যে-বিচারককে রবীন্দ্রনাথ গভীর কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং নিজেকেই করে তুলতে পেরেছিলেন সেই বিচারকের সমতুল আজও মানবপ্রেমিকের কণ্ঠে সেই বিচারকের উদ্দেশে আহ্বান ঘোষিত; তবে সেই বিচারক collective man. 'আমি' আজকের কবিতায় প্রায়শ 'আমরা'ই ; আর 'আমরা'? আমরা হলাম Ortega Y Gasset-এর ভাষায় "Crowd phenomenon"-এর শিকার। চতুর্দিকে আজ অজস্র খণ্ড মানুষের ভিড়, অখণ্ড মানুষ হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিস্রোতে। অজস্র ভোগ্যপণ্য, আকণ্ঠ ভোগেচ্ছা, গভীর বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ মুহূর্তের কাতর আর্তনাদের রূপকার জীবনানন্দ। তাঁর বিস্ময় ছিল, প্রশ্ন ছিল; একাকীত্বের বোধকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই

একাকী হয়ে যাওয়াটা অবশ্যই আপন মুক্তাদোষে নয়। আমরা আজ বহুর মধ্যে থেকেও একার যাতনা ভোগ করছি, অথচ খুঁজে দেখলে বেদনাটা উন্নত প্রযুক্তির যুগে আর একার নেই। উইলিয়ম গোল্ডিং-এর 'Lord of the Flies'-উপন্যাসের এক ঝাঁক স্কুলবালক যারা বিনা পরিত্যক্ত দ্বীপে আশ্রয় পেয়েছিল ভেঙে যাওয়া উড়ো জাহাজের বেঁচে যাওয়া যাত্রী হিসেবে তারা প্রথমে প্রথাবদ্ধতার তাড়না থেকে রেহাই পেয়েও শেষ পর্যন্ত violence-এ জড়িয়ে পড়ে। গোল্ডিং হয়ত বিশ্বাস করতেন যে আমাদের রক্তে রয়েছে violence এবং তার আকস্মিক বিস্ফোরণ অরোধ্য; কিন্তু এভাবে না দেখেও নানাভাবে দেখা যায় একালের বিচ্ছিন্নতাকে। Compunication-এর যুগে যখন Intellectual technology'রই গভীর বিস্তার, বিত্তবান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রমত্ত কলরোল চতুর্দিকে, তখন একটা মানুষ অখণ্ড না থেকে অজস্র ভগ্নাংশের সমবায়ে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এদেশের মানুষ আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম সকলের জন্যে, সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম সকলের জন্যে; কিন্তু নেই মৈত্রী, নেই সাম্য এবং নেই স্বাধীনতা। আসলে আজ যখন 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে তখন মিছিলের মুখও হয়ে যেতে পারে মুখোশ, তখন যদিও বারবার নিজের প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে পারে নিজের কাছেই 'যেতে পারি.... কিন্তু কেন যাবো? তখন জয়গোস্বামীর চরিত্র বলে (স্বর) 'আমি মৃত্যুর পরের অংশ লিখতে চাই; অথচ জয় আপন কথা বিভিন্ন চরিত্রের স্বরে নাটকীয় ভঙ্গীতে ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে যে-কমিটমেন্ট ঘোষণা করেন তা সম্ভব হতে পারে নব্য উপনিবেশের সচেতন কবিদের সম্মিলিত অঙ্গীকারে : ...'তোরা সব বাছা আমার সোনা আমার কয়লা আমার/লোহা আমার উদ্ভিদ আমার প্রাণী আমার প্রাণ / সেই প্রথম দিন থেকে একসাথে লড়াই করছি একসাথে খাবার খুঁজছি/পাহাড়ে জঙ্গলে, আর/আকাশে বনবন ঘুরছে ঘড়ি চক্র ঘড়ি মন্ত্র ঘড়ি অগ্নি ঘড়ি দিগ্বিদিক/যতবার মেরে ফেলবে, জয় জয় সব উত্থান, ততবার বেঁচে, উঠব ঠিক' (ভুতুম ভগবান)। 'যেতে পারি, ...কিন্তু, কেন যাবো? এই প্রশ্ন এবং 'এসেছি যখন, খালি হাতে ফিরব না' এই প্রতিশ্রুতি আজকের কবিকে একাহে এবং আগামীকালে বাঁচিয়ে রাখবে। তাই ব্যক্তি-কবি ঐতিহাসিক নিয়মে মরে যান, কিন্তু বারবার পঠিত হওয়া কবিতা কবিকে যতবার পাঠকের দ্বারা নিহত করে ততবারই কবি পুনঃপাঠের দ্বারা অনন্তের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেন। প্রতিটি মৃত্যুর পরই কবি মৃত্যুঞ্জয় এবং প্রতিটি নতুন পাঠের পর কবিতা অমরত্বের দাবিদার। কালের বদল হয়, বদল হয় রুচির ও ভালো লাগার। কবির কবি হিসাবে সার্থকতা জয়-এর ভাষাতেই বলি 'কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দ জলে।' কবি—বাঙালি কবি—চর্যাপদের যুগ থেকে আজ নব্য ঔপনিবেশিকতার কাল পর্যন্ত ব্যক্তি নাম বদল করলেও একটি বহমান স্রোতধারার নিয়ামক—আমাদের বাঙলা কাব্যপাঠ এই মন নিয়েই সার্থক হতে পারে।